সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শিল্প-প্রকরণ

মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার

Dhaka University Library
429912

429912

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদার কর্তৃক উপস্থাপিত 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শিল্প-প্রকরণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেন নি।

২৭.১২.২০০৭

(বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. কোর্সে আমি নাম নিবন্ধন করি। আমার গবেষণার শিরোনাম 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শিল্প-প্রকরণ'। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রতি আমার আগ্রহ ও মানস-প্রবণতা অনুধাবন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন উক্ত শিরোনাম নির্ধারণ করে দেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর প্রেরণা ও নির্দেশনায় আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গবেষণা-কর্মে নিমগ্ন থাকতে পেরেছি। আমার ব্যক্তিগত অসুবিধা ও পঠন-চিন্তনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের শক্তি যুগিয়েছেন তিনি। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসা আমার গবেষণায় গতি সঞ্চার করেছে। আমি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও ব্যবহার করেছি।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সচল রাখতে সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডক্টর পৃথিলা নাজনীন নীলিমা। তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

4239

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বই ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, অধ্যাপক আহমদ কবির, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সহযোগী অধ্যাপক ও কবি বায়তুল্লাহ কাদেরী, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন (গিয়াস শামীম), প্রভাষক মোঃ আব্দুস সোবহান তালুকদার (উপল তালুকদার), প্রভাষক তারিক মনজুর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও কবি ড. খালেদ হোসাইন, সহযোগী অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি, সহকারী অধ্যাপক ও কবি আবু দায়েন, সহকারী অধ্যাপক ও কবি মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম (সুমন সাজ্জাদ), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ (AIUB)-এর অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শওকত আলী, সদরপুর সরকারি কলেজ, ফরিদপুর-এর অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ গিয়াস উদ্দীন, উপাধ্যক্ষ এ এস এম ইসহাক মিয়া, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সেক আবদুল মালেক, ভূগোল বিভাগের প্রভাষক মাসউদুল হাসান, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মর্জিনা বেগম, প্রভাষক মোঃ রেজাউল করিম,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মোঃ তারিকুল ইসলাম খান এবং ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক দীনবন্ধু বর্মন অন্যতম। এঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁদের সান্নিধ্য আমাকে আলোকিত মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করে, তাদের মধ্যে আমার অগ্রজ আব্দুস সালাম তালুকদার, মজিবর রহমান তালুকদার, সরকারি ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ, মানিকগঞ্জ-এর বাংলা বিভাগের প্রভাষক এবং সাহিত্যপত্র *ক্রান্তিক*-এর সম্পাদক কবি সোহেল হাসান গালিব, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা-র বাংলা বিভাগের প্রভাষক খাদিজা পারভীন পপি, বন্ধু প্রবীর দত্ত, আনোয়ারুল আজিম, আসাদুজ্জামান রানা ফরাজী, মুর্শিদ জাহান মিলি, ফিরোজ আলম এবং আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রকৌশলী মোঃ শাম্‌স আরাফাত অন্যতম। এঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক, প্রাবন্ধিক-গবেষক মোহাম্মদ আজম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক, কবি-প্রাবন্ধিক-গবেষক হিমেল বরকত-কে, যাঁরা কেবল গ্রন্থ ও পরামর্শ দিয়েই নয়, সময় এবং শ্রম দিয়েও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঋণ স্বীকারের নয়।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, মানিকগঞ্জের গঙ্গারামপুর জনকল্যাণ সমিতি গ্রন্থাগার, ফরিদপুরের সদরপুর সরকারি কলেজ গ্রন্থাগার এবং কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আরো একজনের নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস, যিনি সংসারের কঠিন দায়িত্ব এবং নিজের পেশাগত কর্তব্য পালন করেও এই গবেষণাকর্ম সচল রাখতে আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি নাশিদ রেজা, আমার অহঙ্কার, আনন্দ এবং অভিমানের অন্যতম অংশীদার।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

অবতরণিকা ৬

প্রথম অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন কাব্যরূপের পরিপ্রেক্ষিত ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ ৩১

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প-প্রকরণ ৪৯-২১২

- প্রথম পরিচ্ছেদ : শব্দ ৫০
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাক্-রীতি ৬৩
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অলঙ্কার ৭৮
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চিত্রকল্প ১০২
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রতীক ১৩৬
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুরাণ ১৬৯
- সপ্তম পরিচ্ছেদ : ছন্দ ১৯৮

উপসংহার ২১৩

গ্রন্থপঞ্জি ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা প্রগতি-কবিতার উদ্ভব-বিকাশ-বিবর্তনে সক্রিয় ও গতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯–২০০৩)। বাংলা সাম্যবাদী কাব্যধারায় তিনি যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যবলয় থেকে মুক্তির জন্য সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের মূল্যায়ন করে যে নতুন কাব্যাদর্শের সন্ধান করেছেন, তাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মূল্যবোধ-বিপর্যস্ত মানুষের নৈরাশ্যের প্রতিফলনই তীব্র হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভাও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পরবর্তী আধুনিক জটিল বিশ্বব্যবস্থায় বিপন্ন মানুষের গতিশীল জীবন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁর জীবন কেটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। সমকালীন ঘটনাবলি, ব্যক্তিক সংকট ও জৈবনিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা দুর্যোগ-দুর্দিন-নৈরাশ্যেও পাঠকের মনে আশার সঞ্চার করে, নতুন করে স্বপ্ন দেখার প্রেরণা জোগায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসীয় জীবনদৃষ্টি ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে পরিচালিত প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। কবিতা ও জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে তিনি নিজেকে অপরিশুদ্ধ ভাবাবেগ থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি নিমজ্জিত হন নি শ্লোগানধর্মিতায়, কিংবা কেবল মননঋদ্ধ উচ্চারণেও আচ্ছন্ন নয় তাঁর সৃজনভুবন। বরং এই দুই ধারার সফল সমন্বয় করে তিনি নির্মাণ করেছেন এমন এক কাব্যভাষা যা তাকে জনবিচ্ছিন্নতার বৈরাগ্য থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সাম্যচেতনার মূল সুরকে তিনি প্রতিদিনের পরিচিত আবহে এমন এক অবয়ব দিয়েছেন, যা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে মাটি ও মানুষের কাছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সফলতার পেছনে সক্রিয় থেকেছে যে শিল্পদৃষ্টি ও প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য, বর্তমান অভিসন্দর্ভে তা-ই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

শিল্পসাহিত্যে ঐতিহ্য-পরম্পরার অনুসৃতি যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি প্রচল কাঠামোকে স্বীকরণ করে অভিনবত্বের অনুসন্ধানও যে কোন সৃজনশীল প্রতিভার সহজাত প্রবণতা। সমকালীন প্রেক্ষাপট কবিমানসকে প্রভাবিত করে বলেই কবিতার স্বরূপ-সন্ধানে কবির স্বকালও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান অভিসন্দর্ভের 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন কাব্যরূপের পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পভাবনা নির্মাণে সামসময়িক শিল্পসাহিত্য এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।

'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবির মানস-সংগঠনের মৌলসূত্র অন্বেষণের প্রয়োজনে তাঁর সমগ্র জীবনকেই বিবেচনায় আনা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর বেড়ে ওঠা,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবনের নানা পটপরিবর্তন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রগতিশীল রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা কবির শিল্পবিশ্বাসকে কীভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

'শিল্প-প্রকরণ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়কে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টির আলোকে তাঁর প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ 'শব্দ'-এ কবির শব্দভাবনার বিশিষ্টতা অনুসন্ধানের পাশাপাশি শব্দ-শরীরে নতুন প্রাণ ও গতিসঞ্চারের কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'বাক্-রীতি' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বরভঙ্গির প্রধান প্রবণতাসমূহ আলোচনা করে তাঁর কাব্যভাষার বিশেষত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'অলঙ্কার'। এই পরিচ্ছেদে সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত বিবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার যেমন অনুপ্রাস, যমক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত ইত্যাদি নির্দেশ করে কবির ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত শিল্পদৃষ্টির নানা প্রান্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'চিত্রকল্প'-র লক্ষ্য শব্দপ্রতিমা নির্মাণে কবির সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য শনাক্ত করা। রাজনৈতিক ভাবাদর্শের বাকপ্রতিমা সৃজনে সুভাষের কৃতিত্বও এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে কবির জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার স্বরূপ এবং প্রতীকের দূরসঞ্চারী আলোক প্রক্ষেপে তাঁর সৃজনভুবন কীভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়েছে তা-ই আলোচনা করা হয়েছে 'প্রতীক' শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমৃদ্ধ-উজ্জ্বল আগামীর প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রচুর পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের শরণ নিয়েছেন। ভারতীয় পুরাণের পাশাপাশি লোকপুরাণ বা লোককাহিনীর নানা অনুষঙ্গে তিনি মূলত সমকালীন জীবনবাস্তবতাকেই চিত্রিত করেছেন। এই চিত্রায়ণের নানা দিক, সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশিত হয়েছে 'পুরাণ' শীর্ষক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। সপ্তম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'ছন্দ', যেখানে কবির ছন্দভাবনার বিভিন্ন কৌশল, প্রসঙ্গ ও প্রবণতা আলোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে, 'উপসংহার' পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ, প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত বিষয়ের মৌল সূত্রগুচ্ছ উপস্থাপিত হয়েছে ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের নিবিড় চর্যা ও চর্চায় এক সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তিনি, যার অস্থিমজ্জায় স্বকালের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা চারুকৃত। সময়ের প্রয়োজনে তিনি গদ্যের দ্বারস্থ হয়েছেন, অনুবাদ করেছেন বিশ্বসাহিত্যের প্রগতিপন্থী নানা কবির উল্লেখযোগ্য রচনা। বর্তমান অভিসন্দর্ভে কেবল তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় আলোচিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহ হলো – *পদাতিক* (১৯৪০), *চিরকুট* (১৩৫৭), *অগ্নিকোণ* (১৯৪৮), *ফুল ফুটুক* (১৯৫৭, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা* সংকলন-এ আলাদা গুচ্ছাকারে প্রকাশিত), *যত দূরেই যাই* (১৯৬২), *কাল মধুমাস* (১৯৬৬), *এই ভাই* (১৯৭১), *ছেলে গেছে বনে* (১৯৭২), *একটু পা চালিয়ে, ভাই* (১৯৭৯), *মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো* (১৯৮০), *জল সইতে* (১৯৮২), *চইচই-চইচই* (১৯৮৩), *বাঘ ডেকেছিল* (১৯৮৫), *যা রে কাগজের নৌকো* (১৯৮৯) এবং *ধর্মের কল* (১৯৯১)।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার শিল্পরূপ কখনোই বিষয়-নিরপেক্ষ নয়। ভাব ও ভাষার বন্ধন বিবেচনা করেই একজন কবির শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব। আধার ও আধেয়ের যোগ এমন নিবিড় যে এর কোন একটির স্বতন্ত্র আলোচনায়ও অন্যটির উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই এই গবেষণাপত্রে কাব্য-প্রকৌশল বিশ্লেষণের পাশাপাশি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যও প্রসঙ্গত আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে কাব্যগ্রন্থের মূলপাঠসমূহ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *কবিতাসংগ্রহ* থেকেই গৃহীত হয়েছে। কবিতাসংগ্রহের কোন সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে সংযুক্ত 'মূলগ্রন্থ' উপশিরোনামে। গবেষণাপত্রে উদ্ধৃত মূলপাঠের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার নাম, কাব্যগ্রন্থের নাম এবং *কবিতাসংগ্রহ*-এর খণ্ডসংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *কবিতাসংগ্রহ* পঞ্চম খণ্ডের দুশো একচল্লিশ পৃষ্ঠায় *ধর্মের কল* কাব্যগ্রন্থের 'সখা হে' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হলে লেখা হয়েছে 'সখা হে/*ধর্মের কল*, ৫/২৪১'।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন কাব্যরূপের পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন কাব্যরূপের পরিপ্রেক্ষিত

শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে তার স্রষ্টার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অর্জনের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। যে সময় ও সমাজের তিনি প্রতিভূ, তার প্রতিটি সমস্যা ও সম্ভাবনা যেমন তাঁকে তাড়িত করে, তেমনি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও দুর্ঘটনার অভিঘাত তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণই একজন শিল্পীর চৈতন্যে বিচিত্র ভাব ও ভাবনার জন্ম দেয়, তাঁর মধ্যে উপলব্ধ হয় শৈল্পিক দায়বদ্ধতা। এই দায়িত্ব যতটা সামাজিক ও সাংগঠনিক, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিক এবং বৈশ্বিক। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিল্পীর ব্যক্তিগত ভূগোল ব্যাপক ও বিস্তৃত বলেই তাঁর মধ্যে আশ্রয় পাওয়ার জন্য তাঁর ভোক্তার আগ্রহ অপরিসীম। অনুভূতির যে সূক্ষ্মতা তিনি তার সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সঞ্চার করেন, নৈর্ব্যক্তিকভাবেই তা অন্যের আশা, আনন্দ কিংবা আক্ষেপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বলে শিল্পীর অভিজ্ঞতার উপভোগে কোনো অস্বস্তি টের পাওয়া যায় না।

কোনো কবির মনোজগতের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাঁর সমকালের বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা জরুরি। যে কালখণ্ডের জল-হাওয়ায় কবি বেড়ে ওঠেন, তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন তাঁর চিন্তাকে চালিত করে, তেমনি বিভিন্ন সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক অর্জনে কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। কবিতার আলোচনায় উপরিউক্ত প্রতিটি বিষয়ই স্বতন্ত্র বিবেচনার দাবি রাখলেও সমকালীন কবিতার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মরণ নিলেই এসব বিষয়ে মোটামুটি ধারণা লাভ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, কবিতা ও জীবন কত গভীর ও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। চর্যাপদের ভেতর দিয়ে আমরা সেই সময় ও সমাজকে নিরীক্ষণ করি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত জীবন ও জনপদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪–১৮৭৩) হাতে বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর স্পষ্ট। পরাধীন ভারতবর্ষের লজ্জা ও অপমান তাঁর কবিচৈতন্যকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। বাঙালির ভাব ও চিন্তা জগতে তিনি বিপ্লব এনেছেন। জীবনের সকল অনুভব ও অনুভূতির এমন বিস্ময়কর ভাণ্ডার রবীন্দ্রসাহিত্য যে, তাঁর কাছে ফিরে না গেলে যেন নিজের সঙ্গেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সকল সঙ্গ ও নৈঃসঙ্গ্যে তিনি আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার, আমাদের মৌনতা-ব্যস্ততা-অবসর-বাসর সবকিছুর মধ্যে আমরা একজন রবীন্দ্রনাথ নয়, নানা রবীন্দ্রনাথের আনাগোনায় মুগ্ধ হই, বিস্ময়বোধ করি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা কবিতা আবার নতুন বাঁক নেয়। জীবন-জগৎ-মনুষ্যত্ব-বিশ্বাস সব কিছুই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ফলে প্রচলিত মহৎ মানবিক ভাবনায় আসে ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রধান প্রভাবক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৭)।

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৭৭৬) ইত্যাদি ঘটনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের বোধ ও বিশ্বাসকে বিচলিত করেছিল, নড়ে উঠেছিল প্রচলিত মানবিক মূল্যবোধের শেকড়। প্রথম মহাসমরে সেই আত্মউন্মোচন লাভ করে নতুন মাত্রা। মানুষ উপলব্ধি করে, তার অসহায়ত্ব কত ভয়ঙ্কর। আপন আবাস থেকে তার এই বিচ্ছিন্নতা, আজন্ম লালিত ইতিবাচক জীবনদৃষ্টির অর্থহীনতা, তাকে আহত করে। মানুষের প্রতি মানুষের এই আস্থাহীনতা, রাজনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা, অর্থনীতির নগ্ন নেতিবাচক দম্ভ তার আত্মিক ঐশ্বর্যের প্রাচীরে ফাটল ধরায়। ফলে ধর্মের আশ্রয়ে মানুষ যে স্বস্তি ও শান্তির আশ্বাস লালন করতো, তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে –

> ব্যক্তিমানুষ অনুভব করল এই সমাজের ভেতর সে অসহায় বন্দী, লক্ষ্য করল তিলে তিলে তার আত্মিক অপসরণ। এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়জনিত প্রবল অভিজ্ঞতায় অস্তিত্ব ও এতাবৎ অর্জিত মূল্যবোধগুলি যা ছিল জীবনযাত্রা সহায়ক ও বিশ্বাস উৎপাদক তারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। জীবন হয়ে উঠল খণ্ড খণ্ড, অসংলগ্ন ও হতাশাপূর্ণ। আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যে ভাবগত ও আঙ্গিকগত ক্ষেত্রে দেখা গেল এই বিচূর্ণিত মানুষের প্রতিবিম্বন (মঞ্জুভাষ মিত্র ১৯৮৬ : ১০)।

ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তর্ভূমিতে বিচরণরত এই বর্বরতা যখন প্রকাশিত হলো, তখন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ ছিন্নমূল হয়ে পড়ল। এই কালপর্বেই বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ফ্রয়েডের বৈপ্লবিকতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।[১] ফলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো কবিতায়ও মানুষের হাহাকার ও হতাশার প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সংজ্ঞা, সীমা ও প্রকৃতি নির্ণয়ের যে প্রবল প্রয়াস, তা লক্ষ করার মতো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে নীরব ছিলেন না। তিনি অবশ্য সময় কিংবা পাঁজি মিলিয়ে আধুনিকতার সীমানা নির্দেশ না করে ভাবের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর মতে, নদীর বাঁক নেয়ার মতোই সাহিত্যের দিক বদলের প্রয়াস আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২] তিনি বলেছেন, 'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৮ : ১০১)। বিশ্বকে দেখার ও প্রকাশের তন্ময়তা আধুনিক কবির কুললক্ষণ বলে রবীন্দ্রনাথ মত দিলেও –

> এই ধারণাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা মুশকিল। কারণ, আধুনিক কবি হিসেবে চিহ্নিত ও পরিচিত হয়েছেন যাঁরা, তাঁরা বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশের তন্ময় কবি নন, আত্মলীন মন্ময় ভাবের কবি। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা অনুসরণ করলে এঁরা আধুনিক কবির মর্যাদা পান না (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ১১)।

বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন যা এ বিষয়ক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর মতে, কবিতায় বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি ও সন্ধানের যে সম্মোহন পাঠকের জিজ্ঞাসার জগৎকে আলোড়িত ও আলোকিত করে তা আধুনিক শিল্পদৃষ্টির অন্যতম স্মারক। এতে বিস্ময়বোধ ও আনন্দ আস্বাদনের আগ্রহ যেমন প্রতীয়মান, তেমনি বিশ্ববিধানের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়।[৩] তাঁর মতে আধুনিক কবিতায় –

> আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায় (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮৩: আট)।

Dhaka University Institutional Repository

স্বকালের সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে কবি মনে যে ক্ষত ও ক্ষতির সৃষ্টি হয়, তার-ই চিহ্ন যদি আধুনিক কবির কাছে প্রত্যাশিত হয়,তাহলে বুদ্ধদেবের এই বক্তব্যে সম্পন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈপরীত্বের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা কোন স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয় না।

আধুনিক কবিতার আলোচনায় আবু সয়ীদ আইয়ুবের মূল্যায়নকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি একটা সময়সীমা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক কবিতার ভাবগত স্বাতন্ত্র্য তাঁর বিবেচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেছেন –

> কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি (আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৪০ : দুই)।

তাঁর এই আধুনিকতার ধারণায় তিরিশের প্রধান কবিদের তথাকথিত রবীন্দ্র-বিরোধিতার পরিষ্কার প্রভাব লক্ষ করার মতো।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যচিন্তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তাঁর উদার ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এ সম্পর্কিত বিতর্কের অনেক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছে বলে আমরা মনে করি। তিনি বলেছেন –

> বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে – অন্যত্র নয় – একথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের পুরোনো কবিদের একটা বড় কাব্যাংশ, শেক্সপীয়রের নাটক ও সনেটে, ডানের ও রবীন্দ্রনাথের ঢের কবিতায় আধুনিকত্ব ক্ষুণ্ন হবার কোনো কারণ ঘটবে বলে আজকের দৃষ্টি নিয়ে অন্তত আমি বুঝতে পারছি না (জীবনানন্দ দাশ ২০০২ : ৮৯)।

কালের বিচারে জীবনানন্দের এই ধারণাই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমায় আধুনিকতাকে আবদ্ধ করেন নি। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যেই সেই বিশেষ সময়ের অগ্রসর চিন্তার চিহ্নসমূহ সেই যুগের রচনাকে ঋদ্ধ করে যাতে আধুনিকতার স্বাক্ষর চোখে পড়ার মতো। আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ নির্ধারণের পরিবর্তে গবেষক দীপ্তি ত্রিপাঠী[৪] তার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের তালিকা করেছেন যা পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা কবিতার আলোচকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছেন, 'বলা বাহুল্য, লক্ষণগুলি কোনো-একটি বিশেষ কবির মধ্যে প্রকাশ পায়নি' (দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৮২ : ৪)। তাছাড়া কবিতার জন্ম কখনো সংজ্ঞার্থ কিংবা তালিকা-নির্দিষ্ট লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে হয় না। কিংবা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে কবিতা লিখলেই সেই কবিকে আধুনিক ভেবে নেয়া ঠিক নয়।[৫] বাংলা কবিতার ধারায় এই আধুনিকতা একটি বিশেষ যুগের প্রবণতা হিসেবেই গৃহীত হয়েছে –

> কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালখুশি মাফিক তা সৃষ্টি হয় নি বা হঠাৎ পাওয়া আরোপ্য মতবাদের আলোকেও তার ভাষ্য নির্মাণের কৌশল হিসেবেও আধুনিকতার আবির্ভাব ঘটে নি। বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক নানা ভাবাদর্শের সারাৎসার অধিগ্রহণ করে সব কিছুর সামগ্রিক ও সম্মিলিত ফলদ পরিণাম হিসেবে দেখা দেয় যে বিশেষ যুগলক্ষণ, তার প্রভাব ও প্রেরণাজাত প্রতিফলনই আধুনিকতা (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ১৩)।

বাংলা কবিতার আলোচনায় অবতীর্ণ হলে লক্ষ করা যাবে, উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রভাব ও প্রবণতাই তার মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট নয়। জগৎ ও জীবনের জটিলতাই কবিতার ভাবে ও প্রকরণে নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ফলে কাব্যসমালোচনায় কোনো ছক বাঁধা বৈশিষ্ট্যের আলোকে অগ্রসর হলে তার স্রষ্টার প্রতি যেমন অবিচার করার আশঙ্কা থাকে, তেমনি তাঁর সৃষ্টিরও হতে পারে অবমূল্যায়ন।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিকতার উপরিউক্ত ধারণাসমূহের ব্যাপক প্রসার ঘটে। *কল্লোল* (১৯২৩), *কালিকলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *পরিচয়* (১৯৩১), *কবিতা* (১৯৩৫) ইত্যাদি সাহিত্যপত্রিকা এই প্রচার-প্রসারে পালন করে যুগান্তকারী ভূমিকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত মানুষকে যে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যিকদের এই নিমজ্জন যতটা যুদ্ধপ্রভাবিত, তার চেয়ে অনেক বেশি ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবজাত বলে আমরা মনে করি। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের যুগযন্ত্রণাকে তাঁরা পাঠ করেছেন এবং সেই সঙ্গে পরিস্থিতি ও পরিবেশগত অবক্ষয়-তাড়িত ইউরোপীয় জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতায়। আমাদের দেশের জনজীবনে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব প্রবল ছিল না। অবিভক্ত বাংলায় তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের যে হাওয়া বইছিল, তিরিশের কবিতায় তার প্রকাশ তেমন তীব্র হয়ে ওঠে নি। নিজেদের জীবন-পরিবেশ ও পরিস্থিতিজারিত যে যুগগত নৈরাশ্যকে অনুভব করেছিলেন এলিয়ট, এবং বাস্তব অনুভূতিজাত যে বিতৃষ্ণার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন ফরাসিদের পুরোধা বোদলেয়ার, তিরিশের আধুনিক বাঙালি কবিরা বাংলা কবিতায় তা এনেছিলেন ধার করে, পুঁথিগত বিদ্যার সূত্রে (বারীন্দ্র বসু ১৯৯২ : ৩৪৪-৩৪৫)। রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূত্রেই এই পর-নির্ভরতার আবির্ভাব। বোদলেয়ার, মালার্মে, র‍্যাবো প্রমুখ কবিকে আদর্শ হিসেবে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন যতটা অভিজ্ঞতার আলোকে, তার চেয়ে অনেক বেশি অধীত বিদ্যার প্রভাবে।[৬] ফলে কবিতার সঙ্গে কবির বিশ্বাস ও উপলব্ধির একটা দূরত্ব খুব সহজেই চোখে পড়ে যা পাঠককে তাঁর অনুভবের অন্তর্মহলে প্রবেশের পূর্বে প্রশ্নবিদ্ধ করে, একেবারে আপনজনের মতো অনায়াস গতির অভাব অন্তর্হিত হয় না কিছুতেই। তিরিশের প্রধান কবিদের কাব্যপ্রবণতা আলোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁদের অনেকের কাছেই জন্মভূমি আর যথেষ্ট উর্বর বোধ হয় নি। ফলে বিশ্ব পরিভ্রমণে বের হয়ে কেউ বিপন্ন বোধ করেছেন, কেউ বিধ্বস্ত হয়েছেন। কেউ-বা আপন শেকড় থেকে ছিটকে পড়েছেন অনেক দূরে। এভাবে পুরো পৃথিবীর সঙ্গেই তাঁদের তৈরি হয়েছে বিচ্ছিন্নতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তো বেশ জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন–

> ...কাব্য সেই অর্থে স্বয়ম্ভু, যে-অর্থে স্বয়ম্ভু গাছ। একদিন হয়তো সে বাড়ার আনন্দেই আকাশে হাত বাড়াত। কিন্তু বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৯৫ : ৩০)।

ব্রহ্মাণ্ডের সংগ্রহশালা থেকে এই অবাধ গ্রহণ কবিতায় বৈচিত্র্য এনেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তা সুদৃঢ় সঙ্গতি স্থাপনে কতটা সমর্থ হয়েছে, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪) আধুনিক বাংলা কবিতার এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। কবিতা ও জীবনকে তিনি একই নিষ্ঠা ও নিবিড়তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। কবির কল্পনা-প্রতিভার সঙ্গে পাঠকের চিন্তন-প্রক্রিয়ার সফল সমন্বয়ের মাধ্যমে কবি লাভ করেন অপরিমেয় সান্ত্বনা ও প্রশান্তি।[৭] জীবনানন্দের এই কাব্যচিন্তার প্রতিফলনেই বাংলা কবিতায় তিনি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। অবিভক্ত বাংলার মাটি ও মানুষের এত

Dhaka University Institutional Repository

কাছাকাছি তিনি পৌঁছে গেছেন যে, তিনি খ্যাত হয়েছেন 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে। তিনি প্রকৃতি ও প্রেমকে স্থাপন করেছেন একই সমতলে। ফলে তাঁর কবিতা পাঠ করতে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লীন হতে হতে সামান্য মানুষ কখনো কখনো অসহায় বোধ করে। কিন্তু এই অসহায়ত্ব বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে তাঁর সহজ, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত শব্দের সম্মোহনে –

> জীবনানন্দের প্রেমিকারা সব সময়ই প্রকৃতির পটভূমিকায় উপস্থাপিত। শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দের প্রেমিকা তাঁর বিশ্বচেতনার প্রতিভূ হ'য়ে উঠেছে, নদী নেমে এসেছে মানবমন থেকে, তাঁর প্রকৃতিপ্রেম বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়ে গেছে (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৮ : ৭৩৮)।

জীবনানন্দের কবিতায় তাঁর পূর্বসূরিদের সুর খুব অল্প সময়েই অন্তর্হিত হয়ে তা প্রাতিস্বিক প্রভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর স্বাতন্ত্র্য অননুকরণীয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। তাঁর কবিভাষার সম্মোহনে পাঠক বিহ্বল, বিচলিত ও বিপন্ন বোধ করে, এক তীব্র আকর্ষণে সে ক্রমাগত আবর্তিত হয়। যুগের ক্ষয় ও ক্ষতের চিহ্নকে ধারণ করেই তিনি আগামীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কবিতা পাঠে পাঠক যে বেদনাবোধ করেন, তার কারণ, বিশ্বজুড়ে যে ভাঙনের কথা তিরিশের কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, জীবনানন্দ তাকে স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন –

> জীবনানন্দের অন্ত র্লোকে যে-সমুদ্রমন্থন চলেছে তার উগরানো বিষ তাঁকেই পান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'তে হয়েছে। এজন্য তাঁর কাব্যের ট্র্যাজিক মহিমা এত মর্মভেদী। ...সংশয় সংকুল আধুনিক যুগের কবি ব'লেই জীবনানন্দের পথ ভিন্ন এবং তাঁর দ্বন্দ্ব বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে (দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৯২ : ১১৭)।

জীবনানন্দ ইতিহাস ও সময়সচেতন কবি। মহাবিশ্বের অন্ত র্লোকে সময় যে স্বাক্ষর রেখে যায়, কবিতা লিখতে শুরু করেই তিনি তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' (জীবনানন্দ দাশ ১৩৬২ : ৩২)। বিশেষ করে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা ও বীভৎসতার প্রত্যক্ষদর্শী কবি, অতিতুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে মানুষের হানাহানির দ্রষ্টা কবি জীবনানন্দের মনে জেগে উঠেছে সংশয়, সংশয় জীবনসত্য সম্পর্কে। অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই সংশয়, সন্দেহকে অতিক্রম করে তিনি সত্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন' (অশোককুমার মিশ্র ২০০২ : ১১০)। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সত্যের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় নি। ফলে তাঁর কবিতায় গাঢ় অন্ধকারের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। আলোর সন্ধানে তিনি ছুটে গেছেন কখনো প্রকৃতির কাছে, কখনো ইতিহাসের কাছে, আবার কখনো রূপকথার উচ্ছল উজ্জ্বল জগতে। আমাদের লোকঐতিহ্য, লোককথা, লোককাহিনী, লোকপ্রবাদ, লোকবিশ্বাস তাঁর কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়েছে। তিনি ভারতীয় মিথের ব্যবহার করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁর চেতনায় যোগ করেছে ভিন্নতর তাৎপর্য।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১–১৯৬০) যুগযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত একজন বিদগ্ধ কবি। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রবল প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র শিল্পভুবন সৃষ্টির দৃঢ়তা নিয়ে তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। বিশ্বকবির সত্য-সুন্দর-কল্যাণের কোমল মন্ত্রে তিনি খুঁজে পান নি তাঁর স্বকালের দুঃসহ দিনযাপনের চিহ্ন। অপ্রাপ্তি, অতৃপ্তি ও অচরিতার্থতার হাহাকার শোনা গেল তাঁর কবিতায়। তিনি তাঁর কবিতায় এমন মানুষের ছবি এঁকেছেন, যারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কিন্তু মর্তের কোন শান্তিময় নির্মল নীড় তাদের ভাগ্যে নেই। যৌক্তিক শৃঙ্খলে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর ভাবনাকে সজ্জিত করেন, কিন্তু মুক্তির কোন আশ্বাস নেই তাঁর কবিতায়। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন, এমনকি আধুনিক কাব্যের অনেকগুলি লক্ষণ যদিচ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠকালে মনে হয়, কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূন্যতা নৈরাশ্যভারাতুর নয়নে অবলোকন করছেন (দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৯২ : ১৭৪)।

বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্করতা তাকে প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। সাম্যবাদী চেতনার প্রতিও তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি। ফলে ছিন্নমূল মানুষের আর্তনাদের মতো তাঁর কবিতা পাঠকের মর্মে আঘাত করে। সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত পরিশ্রমী কবি। কোন দৈবী প্রেরণায় তাঁর আস্থা না থাকায় তাঁর কবিতায় মেধা ও পাণ্ডিত্যের ভার কখনো কখনো কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধ সেঁধেছে ঠিকই, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি সেতুবন্ধ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। 'সুধীন্দ্রনাথের বাহুল্যবর্জিত শব্দব্যবহার গদ্য ও পদ্যের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে বদ্ধপরিকর। গদ্য ধরাছোঁয়ার বাইরে যায় না, তা একান্ত ভাবে যুক্তির উপর নির্ভরশীল। বাহুল্যকে যতই সে এড়িয়ে চলে, ততই তার দেহে গতি ও দীপ্তি দেখা দেয়' (বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮১ : ২৭৪)। কবি যতই যুক্তির আশ্রয়ে নীড় নির্মাণ করতে চেয়েছেন, তাঁর মধ্যে ততই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দোলাচলতা লক্ষ করা গেছে। মনন ও আবেগের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে, প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই বেঁধেছে বুদ্ধির। প্রচলিত আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত তাঁর কবিতার একটি প্রধান প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। চিরন্তনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তিনি পরিচিত হয়েছেন 'ক্ষণবাদী কবি' হিসেবে। তাঁর দার্শনিকসত্তা এবং কবিসত্তার দ্বন্দ্বই মূলত এইসব দ্বিধাবিভক্তির জন্য দায়ি (বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮১ : ২৯৯)। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা পাঠকের মেধার কাছে আবেদন সৃষ্টি করে, বোধের দরোজায় তা খুব সহজে আরামদায়ক অনুভূতি সঞ্চার করে না। ফলে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অধিকাংশ পাঠক তাকে এড়িয়ে গেছে। তিনি প্রচুর অপ্রচলিত ধ্বনি ও ব্যঞ্জনানির্ভর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁকে বোঝার জন্য বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অবশ্য এই বাহ্যিক বাধা অতিক্রম করলে দেখা যায়, তাঁর কবিতার মূল সুরে কোন জটিলতা নেই।

সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা তাঁর কবিসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যেখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির রসে জারিত করে কাব্যরূপ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর তথাকথিত কাঠিন্যের দেয়াল অনুপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে যেমন সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি সাহিত্যসমালোচক এবং সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসারেও ব্যাপক অবদান রেখেছেন।[৮]

অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১–১৯৮৬) কবিতায় আত্মার অনুরণন এত বেশি হার্দিক গুণে ঋদ্ধ যে খুব সহজেই তাকে আধ্যাত্মিক কবি বলে অভিহিত করা সম্ভব। তাঁকে আধ্যাত্মিকতার পর্দায় আড়াল করে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রচার করার চেষ্টাও কম হয় নি।[৯] কবিভাষার বিশেষ আন্তরিক উচ্চারণ এবং বিশ্বাস ও বোধের পরিচ্ছন্নতা দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করেও অমিয় চক্রবর্তী তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেন নি।[১০] একজন নিবেদিতপ্রাণ কবি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে শব্দের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিলেন অমিয়। তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য যেমন উল্লেখ করার মতো, তেমনি বক্তব্যের মধ্যেও এক ধরনের যৌক্তিক শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর কবিতাকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সমালোচকের মন্তব্য –

> আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর বিজ্ঞানচেতনা সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল। বিজ্ঞানের ভাবনা দ্বারা আর-কোনো আধুনিক কবি এমনভাবে প্রভাবিত হননি, বিজ্ঞানের পরিভাষা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারেও আর-কোনো আধুনিক কবি এমন প্রবণতা দেখাননি (দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৯২: ২৯৯)।

এই বিজ্ঞানমনস্কতার কারণেই কবিতায় তিনি বার বার যন্ত্রের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেন, আর দেখান যান্ত্রিক সভ্যতার মর্মঘাতী পীড়ায় আমাদের অন্তর্লোকের পরিবর্তন। কালসচেতন কবি হিসেবে অমিয় চক্রবর্তী যে কোন রাজনৈতিক সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুর্বিষহ জীবনের ছবি এঁকেছেন। ফলে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪) আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি নিয়ে নিবিড় নিরীক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশ্বসাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন বাংলা কবিতাকে। তাঁর মতে, কোন সৃষ্টিকে সাহিত্যপদবাচ্য হতে হলে তাকে অবশ্যই বিশ্বসাহিত্য হতে হবে। নানা নামকরণের বা বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করলেও মানুষ যে মৌলিকভাবে এক, তারই পরিচয় তিনি সাহিত্যে অন্বেষণ করেছেন। তাঁর মতে –

> সাহিত্য বিশ্বমানবের এক আবহমান মিলনস্থল; 'মানুষ' নামক সার্বভৌম ধারণাটির অনাক্রমণীয় দলিলপত্র যেখানে গচ্ছিত আছে, তা নিখিলজাতি সম্মেলনের দপ্তর নয়, তা বিশ্বসাহিত্য (বুদ্ধদেব বসু ১৯৬০ : ৯১)।

বুদ্ধদেব সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়ই স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। কবিতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন আত্মনিবেদনের এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। আধুনিক কবিতার যে বিশাল, বিস্তৃত, বিচিত্র ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী আমরা, তার জন্য বুদ্ধদেবের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> সাহিত্যের, বিশেষভাবে কবিতার জন্যে পরম আত্মোৎসর্গের যে-কটি উদাহরণ জানা আছে মহাকালের, বুদ্ধদেব তাঁদের মাঝে উজ্জ্বলতমদের একজন।...তিনি বিচরণ করেছেন সাহিত্যের সকল সড়কে, কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় রবীন্দ্রনাথের মতোই, কবি। আধুনিক বাংলা কবিতার তিনিই ছিলেন প্রধান পুরুষ; কেবল কবিতা সৃষ্টিতে নয়, কবিতার ভাষ্যরচনাতেও (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯২ : ৪০)।

কবিতাবিষয়ক তাঁর উজ্জ্বল প্রবন্ধাবলি বিশেষ করে *সাহিত্যচর্চা, কালের পুতুল, স্বদেশ ও সংস্কৃতি* প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহিত্যচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবিতার স্রষ্টা হিসেবে তিনি বিদেশের ভাণ্ডার থেকে তিনি যেমন অবাধে গ্রহণ করেছেন, তেমনি ভারতীয় মিথ ও পুরাণের নবনির্মিতি তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'প্রত্নপ্রজ্ঞায় ভারতীয় বোধের ধারক হলেও চৈতন্যের দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু আন্তর্জাতিক বোধের পরিচায়ক' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৪৫৬)। প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ ও সময়ধারণা, বিচ্ছিন্নতা, মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধদেবের উপলব্ধির নির্যাস কবিতায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। কবিতার প্রকরণেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বেশ স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮২) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। দুর্বোধ্যতার কারণে তাঁর কবিতা সাধারণ পাঠকের বোধের সীমায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে বিষ্ণু দে তেমন চর্চিত হন নি। কিন্তু রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে তিনি খুব দ্রুত বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একজন নিবিড় পাঠক ছিলেন বিষ্ণু দে। কিন্তু তাঁর কাব্যাদর্শ তাঁকে নিজের পথে নিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> বিষ্ণু দে-র কবিচেতনায় রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল বিদ্রোহ, আধুনিক মন ও আত্মসত্তার সচেতন অন্বেষণ– সব মিলিয়ে এক অনিবার্য দায়বোধ জন্মেছিল, যা শুধুই বাস্তব পৃথিবীর বদলে যাওয়া মানবস্বভাবের প্রতিকৃতি অঙ্কনের দায়বোধ নয়। এটা অনেকটা নিজেরই কবিসত্তার ও ব্যক্তিসত্তার সংকট-সংক্রান্তির জিজ্ঞাসায় জটিল এক দায়বোধ (বেগম আকতার কামাল ১৯৯২ : ৩৪)।

কবিতায় অবলীলায় রবীন্দ্র-পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে নিজের বক্তব্যের পক্ষেই অবস্থান নেন বিষ্ণু দে। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর ভগ্নবিশ্বাসের সমান্তরালে তিনি উচ্চারণ করেন আশাবাদের বাণী। তাঁর কবিচৈতন্যের গভীর থেকে উৎসারিত যে শিল্পবোধ, তা সমাজ ও দিনবদলের বার্তাবহ হয়ে উঠেছে। বাংলা সাম্যবাদী কবিতার ধারায় বিষ্ণু দে-র অবদান স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রবল উত্তাপকে পাশ কাটিয়ে অথবা স্বীকরণের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির সাহসী দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন তিরিশের কবিরা। কাজটি তাঁদের জন্য অনায়াস-আয়ত্ত ছিল না। বিশ্বের তাবৎ মাটি, মানুষ, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাঁরা। কেবল স্বস্তিদায়ক সৌন্দর্য ও কল্যাণের মন্ত্রই নয়, কষ্টদায়ক কুৎসিত ও অকল্যাণের আঘাতসহ জীবনের সামগ্রিকতাকে চারুকৃত করতে তাঁদের কলম অনেকাংশে সর্বগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সহজ কবিত্বের সরল স্বভাবোক্তির অনায়াস উচ্চারণের বিপরীতে তাঁরা নির্মাণ করেছেন এমন এক কবিভাষা যাতে মেধা ও পাণ্ডিত্যের পরিশ্রমী প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতি অবিভক্ত বাংলার কবিদের ব্যক্তিগত ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতাকে বিপর্যস্ত করেছে। সেই বিশীর্ণ ভূমির বুকে মেধাবী লাঙল চালনায় জন্মেছে যে ফসল, তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের মতো অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে আলোর কণা কুড়িয়ে আনতে। কিন্তু শেকড়ের সঙ্গে সংযোগহীন এই বুদ্ধিদীপ্ত আহ্বানে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সাধারণ বাঙালির জাগরণ যে সম্ভব নয়, বাংলা কবিতার ইতিহাসে তারও উজ্জ্বল উদাহরণ তাঁরা।[১১]

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা যাঁদের প্রসঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই সচেতনভাবে তিরিশের কাব্যান্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন, কবিতার ভাব ও ভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে তাঁদের কাব্যফসলকে ব্যক্তিত্বচিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের সঙ্গে আরো কয়েকজন কবির উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাঁরা আপন অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের প্রভাবেই নিজের মতো করে চলতে শিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩–১৯১৩), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯০৭–১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) প্রমুখ কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রচুর ঋণ নিয়েছেন, যথাসময়ে তা শোধ

Dhaka University Institutional Repository

করেও যা অবশিষ্ট থেকেছে, তা-ই নিয়েই আমরা গর্ব করতে পারি, কারণ তাঁদের কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালে রায়ের শিল্পচিন্তায় আমাদের স্বদেশ ও সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। 'কাব্যপ্রত্যয় এবং শিল্পরীতির অভিনবত্ব এবং দেশ-কালের সংকটকে হাস্যরসের অমল আনন্দে উপস্থাপন করে রবীন্দ্রযুগে দ্বিজেন্দ্রলাল এক ধরনের প্রথাবিরোধী ধারা নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০২ : ১৩২)। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রখরতার পাশেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রদীপটি আপন অনুভবের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে নিজের অস্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করেছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিতাকে মানুষের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজ ও পরিবেশের প্রভাবজাত মানুষের প্রতিদিনের কর্মকোলাহলের মধ্যে কবিতা খুঁজেছেন তিনি। তাঁর কবিতায় হতাশা ও আক্ষেপ প্রকাশিত হলেও তাকে 'দুঃখবাদী কবি' হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্বের জন্য তাকে মানবতাবাদী বলাই সঙ্গত মনে হয় (মাহবুবা সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ৭৬)।

মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় দেহাত্মবাদের প্রকাশ ঘটলেও তাঁর কাব্যসচেতনতা চোখে পড়ার মতো। 'বাঙালির অস্থিমজ্জাগত যে দেহবাদের যে সুর আধুনিককালে প্রথম ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের (১৮৫৪–১৯১৮) রচনায় অনুরণিত হতে দেখি, মোহিতলালের কাব্যে তাই বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদী জীবনদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠা পেল' (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৪ : ৩)। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি শঙ্কিত কিংবা বিচলিত না হয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অনুগামী হয়েছেন। ফলে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

রবিরাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নজরুলের লজ্জা ও অপমানই তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। *অগ্নিবীণা*-র কবি নিজের মধ্যে যে আগুন লালন করেছেন, সেই আগুনই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র। বিদ্রোহের এই উত্তাপই তাঁকে খুব দ্রুত কবিখ্যাতি এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও তেমন সময় ব্যয় হয় নি তাঁর। আধুনিক কবিতার অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসু নজরুলের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগের সমালোচনা করলেও তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন, রবীন্দ্র-প্রভাব বলয় থেকে মুক্তির প্রবল ঘোষণা নজরুলের কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর মতে –

> নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি (বুদ্ধদেব বসু ২০০১ : ৭২)।

'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি, 'সর্বহারা'র কবি হিসেবে মহাকাল নজরুলকে মনে রাখবে কিনা– এই নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সংশয় থাকলেও কালের বিচারে প্রমাণিত হয়েছে নজরুলের প্রয়োজনীয়তা বাংলা কবিতার ইতিহাসে কোন দিন শেষ হবে না, বরং সকল অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনে তাঁর কবিতা প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ঝলসে উঠবে। ড. সুকুমার সেন নজরুলের কবিতাকে সাময়িক কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করলেও তিনি স্বীকার করেছেন –

Dhaka University Institutional Repository

> অসহযোগ আন্দোলন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটুকু আলো, যতটুকু ভালো, যতটুকু মুক্তি আনিয়াছিল তাহা নজরুলের কবিতা-গানের দ্বারা অনেক অংশে সম্ভাবিত হইয়াছিল (সুকুমার সেন ২০০২ : ৩০১)।

কাজী নজরুল ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। শোষণ, নিষ্পেষণে জর্জরিত শ্রমজীবী মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য প্রখর শ্রেণীচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতায়। অহিংস মানবতাবাদী প্রচলিত সাম্যচিন্তার পরিবর্তে সহিংস মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। ফলে অঙ্গীকারবদ্ধ মার্কসবাদী সাহিত্যিক হিসেবে তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে না পারলেও তার সাহিত্যে মার্কসীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে (অনীক মাহমুদ ১৯৯৫ : ৮০)। মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দানবীয় আচরণের বিরুদ্ধে তাঁকে সোচ্চার করে তুলেছিল। নজরুল তাঁর কবিতায় কখনোই অনুপস্থিত নন, ফলে ব্যক্তি নজরুলের বিদ্রোহের উত্তাপ পাঠককে আলোড়িত করে, অসীম সাহসে বুক বেঁধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগায় তাঁর কবিতা। প্রগতি চেতনায় ঋদ্ধ বাংলা কবিতার যে-কোন আলোচনায় তাই নজরুলের কবিতা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।

বাংলা কবিতায় জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩–১৯৭৬) অবদান স্বতন্ত্র বিবেচনার দাবি রাখে। রবীন্দ্রবলয়ের ভেতর থেকে বাইরে এসে তিনি নির্মাণ করলেন এমন এক কাব্যভুবন যেখানে গ্রাম-বাংলার লোকজীবন নবমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি গীতিকাব্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিক জীবনদৃষ্টি দিয়ে নির্মাণ করলেন পল্লী-মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার বাকপ্রতিমা। গ্রামজীবনের অভিজ্ঞায় এক বিস্ময়কর কবিভাষা গড়ে তুললেন তিনি, যেখানে হাজার বছরের বাংলার পল্লী নতুন প্রাণ নিয়ে জেগে উঠল।[১২] সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> জসীমউদ্‌দীনের বিশিষ্টতা এখানে যে তিনি পল্লীকে আপন সমগ্রতায় প্রত্যক্ষ করেছেন; কাল থেকে কালান্তরে বহমান এর ধীরগতি জীবনের বিবর্তন ধারা, এর শক্তি ও সীমা তিনি আবিষ্কার করেছেন।...আর এইজন্যেই জসীমউদদীনের কাব্যের অঙ্গনে পল্লী পথিক হয়েও, অন্যান্য পল্লীনিষ্ঠ কবির থেকে স্বতন্ত্র। শুধু স্বতন্ত্রই নন, শৈল্পিক সার্থকতায় বিশিষ্টতমও বটে (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৪ : ৯)।

আধুনিক কবিতার চিন্তা ও চেতনার জটিলতা থেকে মুক্ত থেকেছে তাঁর কবিতা, আঙ্গিকগত কোন বিপ্লবেরও চেষ্টা করেন নি তিনি, বাঙালি-মানসের শেকড় অনুসন্ধানে তাঁর বিচক্ষণতাই তাঁকে বাংলা কাব্যে দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় ও বিশ্বসাহিত্যের বহুবিধ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার প্রবল স্বাক্ষর। যুদ্ধ,সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতি অনাস্থা ও ব্যক্তিগত শুভচিন্তার মর্মান্তিক মৃত্যু এর জন্য দায়ী। সকল অশুভ ও অকল্যাণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দানবীয় ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে শনাক্ত করা হয়। এই হিংস্রতা ও পশুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষাও তৈরি হতে থাকে, প্রতিরোধের জন্য লাঞ্ছিত ও অবহেলিত মানুষ পরস্পরের হাত ধরে উচ্চারণ করে শ্রেণী শত্রুকে রোধ করার দুর্মর মন্ত্র। বাংলা দেশের মানুষও রাজনৈতিক শোষণ ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার অবসানকল্পে যূথবদ্ধ হয়, ইতিহাস ও কালচেতনায় ঋদ্ধ কবির কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে কবিতা। অধিকার-বঞ্চিত মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বর্ণনায় বাংলা কবিতা লাভ করে ভিন্নতর মাত্রা। বাংলা কবিতার এই ধারাকে প্রগতি-কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধারার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রগতিশীল রাজনীতি-চর্চা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

তিরিশের দশকে রবীন্দ্রবলয়ের বিপরীতে যে আধুনিক কবিতার সূত্রপাত, তারই পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণের বিপক্ষে গণমুখী সাহিত্যচেতনার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। 'এর সঙ্গে যোগ ছিল ঔপনিবেশিকতার অর্গল থেকে মুক্তি আন্দোলনের আর ছিল লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠিত রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্যের প্রভাব। বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় সাহিত্য-শিল্পে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকাকে রূপায়িত করার তাগিদ অনুভূত হতে থাকে। এই ঘটনা মার্কসবাদের দ্রুত বিস্তার ঘটায় এবং শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহ বাড়তে থাকে' (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ২৮)।

মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার একটা বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বৈষয়িক জীবন ও জগতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরিকাঠামোও এতে আলোচিত হয়ে থাকে।[১৩] উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের যাবতীয় উপায় ও উপকরণ যখন সাধারণের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন শ্রেণীহীন সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মার্কসীয় তত্ত্বের মূল ভিত্তি।

কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের ফলস্বরূপ রাশিয়ায় নতুন সমাজ বিনির্মাণে বিদ্রোহী চেতনা ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যচেতনা মার্কসীয় বিবেচনার সমর্থক না হলেও রুশবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব তাঁদের আলোড়িত করেছিল –

> প্রকৃতপক্ষে, ১৯২৯ সালে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার পূর্ব পর্যন্ত, আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২৫) গঠিত হওয়া সত্ত্বেও, মার্কসবাদে দীক্ষিত ও পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক কিংবা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরূপে পরবর্তীকালে প্রখ্যাত প্রায় সকল ব্যক্তিই মার্কসবাদী জীবন-দর্শন গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছেন তিরিশ আর চল্লিশের দশকে (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ৩)।

বাংলাদেশে শিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণ সমাজ বিশ আর তিরিশের দশকের প্রথমদিকে 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি বিপ্লববাদী দলের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের' ব্যর্থতার পর, বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট হওয়ার পরের বছরগুলিতেই বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থিত কারাগারে, বন্দিশিবিরে আর আন্দামানে নির্বাসিত এইসব তরুণের একটা বড় অংশ মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তিরিশের দশকের শেষভাগে তাঁরা মুক্ত হলে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। গোপাল হালদার, রেবতী বর্মণ, ভবানী সেন, সতীশ পাকড়াশী, সরোজ আচার্য প্রমুখ ব্যক্তির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিরিশের দশকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও প্রগতিবাদীদের সচেতন কর্মতৎপরতার প্রেক্ষাপটে রুশ বিপ্লব ও মার্কসবাদ সংক্রান্ত বাংলা পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ ইত্যাদির প্রকাশনা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৩৮)। পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক *চাষী-মজুর* (১৯৩২), আবদুল হালিম সম্পাদিত *মার্কসপন্থী* (১৯৩৩), অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৯১–১৯৭) সম্পাদিত *মার্কসবাদ* (১৯৩৩), সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯১১–১৯৯০) সম্পাদিত দৈনিক *গণশক্তি* (১৯৩৪), মুজাফ্ফর আহমদ সম্পাদিত *আগে চলো* (১৯৩৭) ইত্যাদি। মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লব-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শিবরাম চক্রবর্তীর (১৯০৩–১৯৮০) *আজ ও আগামীকাল* (১৯২৯,

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে *মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী* নামে প্রকাশিত), অমূল্যচন্দ্র অধিকারীর (১৯০১–১৯৫১) *বিদ্রোহী রাশিয়া* (১৯৩০)। মার্কসবাদের ওপর প্রথম বই সোমনাথ লাহিড়ীর (১৯০৯–১৯৮৪) লেখা *সাম্যবাদ*, লেনিনের *State and Revolution* গ্রন্থের অনুবাদ *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* (সোমনাথ লাহিড়ীকৃত), বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮–১৯৭৪) *সাম্যবাদের গোড়ার কথা* (১৯৩৫) ইত্যাদি।[১৪] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি*–র কথাও উল্লেখ করা যায়।

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রবাসজীবনে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৪–২৫ সালে স্বদেশে ফিরে এসে ড. দত্ত এ দেশে মার্কসীয় ধ্যানধারণা প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় *পরিচয়* প্রকাশিত হলে একে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞানে বিশ্বাসী বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি 'রুশ বিপ্লবের পটভূমি' শীর্ষক রচনায় রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত ধারাবাহিকভাবে *পরিচয়*-এ প্রকাশ করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র সঙ্গে তুলনা করে ডিউই, ড্রাইজার ও বারব্যুসের সোভিয়েত-বিষয়ক তিনটি বইয়ের সমালোচনা করেন যাতে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্ভাব্যতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত হয়। তিরিশের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে 'পরিচয়গোষ্ঠী' যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল। সমালোচকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য –

> সুধীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাহেদ সোহরাওয়ার্দি, বিষ্ণু দে প্রমুখ বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকেরা বহু উজ্জ্বল রচনায় সেদিন 'পরিচয়'কে মনোজ্ঞ আর মননশীল সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু এঁদের সকলের জীবন-দর্শন আর চিন্তা-ভাবনা এক ছিল না, বরং বহু বৈপরীত্য আর বৈচিত্র্যে, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং দ্বন্দ্ব-মিলনে তা ছিল মুখর (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ৪)।

১৯৩৬ সালে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন তিরিশের দশকের বাঙালি কবিদের মার্কসবাদী চেতনা সম্পর্কে সচকিত করে তোলে। অবশ্য তার আগে জার্মানিতে নাৎসি একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের (১৮৮৯–১৯৪৫) অভ্যুত্থানে (১৯৩৩) বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদরা ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন অবস্থান নিতে শুরু করেন। ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী থাবা প্রথমে ইউরোপে ও পরে বিশ্বের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ সমর্থন নিয়ে ফ্যাসিবাদী ইটালির শাসক বেনিতো মুসোলিনি আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল (১৯৩৫)। রোমাঁ রোলাঁ, অঁরি বারব্যুস ও ম্যাক্সিম গোর্কির আহবানে ১৯৩৫ সালে ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের অগ্রগণ্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের সম্মেলন– World Congress of Writers for the Defence of Culture. এই সম্মেলনে যোগ দেন অঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফর্স্টার, অঁদ্রে মালরো, অলডস হাকস্‌লি, জুলিয়াঁ বাঁদা, হেনরিখ মান, বের্টল্ট ব্রেখট, আলেক্সি তলস্তয়, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষী। একই বছর নভেম্বরে গঠিত হয় Indian Progress Writers Association (IPWA) বা 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। লন্ডনে অধ্যয়নরত প্রবাসী মুলুকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় লেখক-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বার্ড রিড, মন্টেগু স্ল্যাটার, রজনী পাম দত্ত ও ই. এম. ফর্স্টার প্রমুখ ব্রিটিশ লেখক ও চিন্তাবিদ সমবেত হয়ে একটি ঘোষণাপত্র

Dhaka University Institutional Repository

তৈরি করেন(ধনঞ্জয় দাশ ২০০৫ : ৪০)। ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্ণৌয়ে। এতে সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহেরু। বিপুল সংখ্যক প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এ সম্মেলনে সমবেত হন। ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হলে, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সাজ্জাদ জহীরের উদ্যোগে ১১ জুলাই[১৫] কলকাতার এ্যালবার্ট হলের কমিটি রুমে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয় –

> এই শোকসভার আহ্বায়ক ছিলেন *আনন্দবাজার* পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এডভান্স) ও খগেন্দ্রনাথ সেন। এই সভায় সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-র সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে না পারায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গোর্কির এই শোকসভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩: ৬)।

১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই স্পেনে ফ্যাসিবাদ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। মুসোলিনি ও হিটলারের সমর্থন-সহযোগিতায় সেখানে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ঘটে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান। এই ঘটনা শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই বছর ৩ সেপ্টেম্বর রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ব্রাসেল্‌সে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন (৫–৭ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভারতের প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে পাঠ করা ঘোষণাপত্রে বলা হয় –

> পৃথিবীর সম্মুখে আজ আতঙ্কের মতো আর এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সমুপস্থিত। ফ্যাশিস্ট স্বৈরতন্ত্র মাখনের বদলে কামান তৈরীতে মগ্ন। তারা সংস্কৃতির বিকাশের বদলে বিকশিত করছে সাম্রাজ্য জয়ের উন্মাদ লালসা, প্রকাশ করছে নিজের হিংস্র সামরিক স্বরূপকে। ইতালী যেভাবে আবিসিনিয়াকে পদানত করল, তা সভ্যতা ও মানবতার উপাসক সকল মানুষকেই স্তম্ভিত করেছে।[১৬]

ঐ বাণীতে যুক্তস্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু প্রমুখ।[১৭] ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের বাংলা শাখার প্রথম সাহিত্য সংকলন *প্রগতি*। এর সম্পাদক ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। অত্যাচার, নির্যাতন ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে *প্রগতি* পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কমিউনিজম বা মার্কসবাদের কথা এ সংকলনে স্পষ্টভাবে না বলা হলেও *প্রগতি*-র লেখকদের মধ্যে কয়েকজন মার্কসবাদী লেখক ছিলেন (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৪৪)। এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে 'প্রগতি' শব্দটি মার্কসীয় মতাদর্শের আলোকে রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[১৮] *প্রগতি*-তে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেখার বিশ্লেষণ করে একজন সমালোচক প্রগতি সাহিত্যের লক্ষ্য ও প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকারে উপস্থাপন করেছেন –

১. সাহিত্য হবে দেশকাল ও সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ;
২. সাহিতের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে থাকবে গণমানুষের জীবন;
৩. সাহিত্যের মর্মবস্তুতে থাকবে সমাজের শুভত্বময় রূপান্তরের আদর্শ;
৪. সাহিত্যে জীবন ও জগকে দেখতে হবে প্রগতিশীল বিশ্ববীক্ষার আলোকে।

(মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৪৫-৪৬)।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ে বাংলা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বামপন্থী ভাবধারার প্রকাশ প্রবলতর হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তার ন্যাশনাল ফ্রন্টের তত্ত্ব অনুযায়ী, বেআইনী থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী অভিযানের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। বাঙালির মানস-চৈতন্যে ফ্যাসিবিরোধী প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উত্তাপ সঞ্চার করেন তিনি। বিশ্ব-মানবিকতার পক্ষে কবির অবস্থান এ পর্যায়ে আরো প্রবল হয়ে ওঠে, যা প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোক্তাদের প্রণোদিত করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে –

> আবিসিনিয়া-স্পেন-চীন-অস্ট্রিয়া-চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী অভিযান দেখে কবি যেভাবে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন, তাতে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, League Against Fascism And War, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বিশ্ব-প্রস্তুতি কমিটি, সারা-ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি – এসব আন্দোলন ও সংগঠনের প্রত্যেকটিতেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা তাঁদের প্রতিটি উদ্যোগেই কবির সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করতেন (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৪ : ৪৫-৪৬)।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনের পর ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরাতে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের কংগ্রেসী মহলে কমিউনিস্টরা তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে –

> কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও সোমনাথ লাহিড়ী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রূপে কংগ্রেসকে বামমুখী করার কাজে সে-সময় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। আর, বিশ্বনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন হয়ে ওঠে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী প্রচারের প্রধান প্রবক্তা (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ১০)।

এই সময়-পর্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সদ্য পাশ করা তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সমর সেন প্রমুখ বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। এর আগে, ১৯৩৮ সালে গোপাল হালদার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রস্তুতি পর্বে, ১৯৩৫ সালে, যে ইশতেহার প্রচার করা হয়, তাতে সাহিত্য সম্পর্কে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির[১৯] প্রকাশ ঘটে তার প্রভাব ঢাকার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলকেও প্রভাবিত করে। প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর, ১৯৩৯ সালে, ঢাকায় স্থাপিত হয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা। সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে এর কার্যক্রমে গতিশীলতা সঞ্চারের উদ্যোগ নেয়া হয় –

> এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। উৎসাহ-উদ্দীপনা-আগ্রহ ও সংগঠন পরিচালনার দক্ষতায়, সোমেন চন্দ হয়ে ওঠেন সংগঠনের মধ্যমণি (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯১ : ২৩৬)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও ঢাকা, কুমিল্লা. সিলেট, যশোর, ফরিদপুর অঞ্চলের তরুণ বুদ্ধিজীবী মহলের সংস্কৃতি-চর্চায় প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে মার্কসীয় মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে।[২০] ১৯৪০-এর মাঝামাঝি এই শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় গেণ্ডারিয়া হাইস্কুল মাঠে। এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত এবং সহ-সম্পাদক সোমেন চন্দ (হায়াৎ মামুদ ১৯৮৭ : ৫১)। হিটলারের নাৎসি বাহিনী ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ করলে প্রগতিশীল বিশ্বে ব্যাপক ও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' (২১ জুলাই, ১৯৪১)। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে ঘোষণা করে (১৫ ডিসেম্বর ১৯৪১) এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য মিত্র শক্তিকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২১] ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকার প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৩ মার্চ প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই হত্যার প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেন, তাতে স্বাক্ষর করেন– প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৯ : ২৪৯)। ২৮ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভায় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' নাম পরিবর্তন করে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে' পরিণত হয়। ১৯–২০ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এই সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান করে যামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, হবিবুল্লাহ বাহার এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবকে নিয়ে গঠিত হয় সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী। অমৃত রায়, শচীরাউত রায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবির ভাষণ ও কবিতা পাঠের সঙ্গে গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনে সমবেত জনগণকে উজ্জীবিত করা হয়।[২২] ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে ব্রিটিশ সরকার সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে শুরু করে । বাংলাদেশের মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেরকে এই বিরূপ পরিবেশেই তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি দলগতভাবে আন্দোলনকে সংগঠিত ও সক্রিয় করে একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিট গঠন করে। 'এই ইউনিট গঠিত হল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আগত প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী বিনয় রায়, *জনযুদ্ধ* পত্রিকা থেকে আগত বিশিষ্ট লেখক-সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুধী প্রধান আর কবি-সাহিত্যিক অনিল কাঞ্জিলাল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ' (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ১৮)।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মার্কসবাদী শিল্পসাহিত্যের প্রচার ও প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে এক ধরনের গণজোয়ার সৃষ্টির প্রয়াস চোখে পড়ে। এই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় বিভিন্ন সংগঠন। গণনাট্য সেল, লেখক ও

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক সেল, চিত্রশিল্পী সেল, 'পরিচয়' সেল – এইভাবে বিভিন্ন পেশাজীবী কমিউনিস্ট কর্মীর কার্যক্রমকে সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব সম্পর্কিত ইশতেহার, প্রস্তাব ও বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়, মতাদর্শগত সংগ্রামের চেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের দিকেই কর্মীদের ঝোঁক ছিল বেশি। ১৯৪৪ সালের ১৫–১৭ জানুয়ারি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও সমবেত হন প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্দীপনাময় ভূমিকা রাখতে (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ৫১)। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা যখন চরমে, তখনও বাংলা দেশের প্রগতিশীল চিন্তার ধারক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সক্রিয় থেকে দানবীয় শক্তির পরাজয়ের অপেক্ষায় দিন গুনেছে। এই সময়কালে রচিত বাংলার সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, সময়ের ক্ষতচিহ্ন তাঁদের প্রায় সবার লেখাতেই উপস্থিত। দুঃসময় যত ঘনীভূত হয়েছে, সুদিনের আশায় প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে –

> সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ ও লালফৌজের অসীম ত্যাগ ও বীরত্বের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট দানবেরা যখন পিছু হটতে শুরু করেছে, ইয়োরোপের রণাঙ্গনে নাৎসি বাহিনীর ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে আবার এক সম্মেলনে মিলিত হলেন সারা বাঙলার 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র সকল স্তরের শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ২৩)।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। এর ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ সকল স্তরেই ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতও নড়ে ওঠে। ট্রাম ধর্মঘট, রেল শ্রমিকদের আন্দোলন, অক্টোবরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস পালন, ডিসেম্বরে ব্রেথওয়েট-এর কারখানা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও মিছিল সহ বহুমাত্রিক বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সংঘটিত হয়।

১৯৪৬ সালে আরো প্রবল হয়ে ওঠে দুই বাংলার বিপ্লব ও সংগ্রাম। ধর্মঘট, মিছিল ও অবরোধে জনজীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই এই আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে। এই বছরই ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই ও করাচীর নৌ-সেনা বিদ্রোহের প্রভাব জনগণকে সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। ১৬ আগস্টের মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটায়। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর রক্তের বন্যায় কলকাতার রাজপথ কলঙ্কিত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হয় সারা বাংলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভাগচাষীর মৃত্যুঞ্জয়ী তে-ভাগা আন্দোলন। কৃষক ও শ্রমিকের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার জন্য অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা ও বাংলার কাকদ্বীপ-এর কৃষক বিদ্রোহের প্রবলতা প্রগতিশীল সাহিত্যিকদেরকে প্রভাবিত করেছিল (সুমিতা চক্রবর্তী ১৯৯৬ : ৬১)।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের প্রভাব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজসচেতন কবি-সাহিত্যিকের প্রগতিশীল সাহিত্য-চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। সাম্যবাদী কবিতার এই সমৃদ্ধ অধ্যায় রচিত হয়েছে প্রকৃত অর্থে বিক্ষুব্ধ কাল-খণ্ডেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে জাত হয়ে।

প্রগতিশীল সাহিত্যের মৌল প্রবণতাই হলো জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে সংঘবদ্ধভাবে দিন বদলের জন্য কাজ করার উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করা। মার্কসবাদে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করেন, শিল্প-সাহিত্য জীবনঘনিষ্ঠ না হলে তার কোনো মূল্য নেই। ফলে জীবনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও সম্পর্কিত হয়ে পড়েছেন। প্রগতি-কবিতার মর্মোদ্ধার করতে হলে তাই সমাজ, রাষ্ট্র এমন কি বিশ্ব-ব্যাপী বহুবিধ বিপ্লব ও বিপর্যয়ের পরিচয় জানা প্রয়োজন। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে সংঘটিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ বিবেচনায় রাখলে প্রগতি-কবিতার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা লক্ষ করেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব এবং ব্যক্তিচিহ্নিত সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতার জোয়ারে তিরিশের দশকে 'আধুনিক সাহিত্যে'র একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি হলেও এর পাশাপাশি সক্রিয় থেকেছে প্রগতিশীল চেতনায় ঋদ্ধ কবিগোষ্ঠীর সাহিত্য রচনার প্রয়াস। প্রগতিপন্থীদের সাহিত্য ভাবনায় বিদেশি ঘটনার প্রভাব কাজ করলেও তাঁরা সংঘবদ্ধ শক্তির উত্থানে বিশ্বাসী হওয়ায় কখনোই জনবিচ্ছিন্ন হন নি। অধিকার-বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরা উজ্জ্বল আগামীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন সবাইকে। এই ধারার কবিতায় তাই বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের একটি অনুরণন টের পাওয়া যায়। সমাজের সঙ্গে সঙ্গতির সূত্রেই তাঁরা বাংলার জল-মাটি-মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্টতা অনুভব করেছেন। তিরিশের আধুনিকতা থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কবিতার প্রকরণ সম্পর্কেও তাঁরা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে ঋণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু আবেগের যে আর্দ্রতা কবিতাকে প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, বিশ্বাসের যে ভিত্তি কবিতার পাঠককে আলোকিত দিনের জন্য অপেক্ষা করতে শেখায়, চল্লিশের কবিরা তা লাভ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাবজাত প্রগতিচিন্তার আলোকে আস্থাবান হয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে।

প্রগতি-সাহিত্যের এই ধারায় দীক্ষা নিয়েই বাংলা কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) দীপ্র আবির্ভাব। সাম্যবাদী চেতনায় নিজেকে নির্মাণ করে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে শিল্পসফল কাব্য রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি। রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী হলেও বাংলা কবিতার প্রকরণ-কৌশলে সুভাষ যেমন স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত, তেমনি কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাঁর কবিতার প্রকরণগত অভিনবত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ্য, কবিতার শিল্পরূপ কখনোই বিষয়-নিরপেক্ষ নয়। কাব্য-কৌশল বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যও প্রসঙ্গত আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. মঞ্জুভাষ মিত্র (১৯৮৬ : ১২-১৩) আধুনিক কবিতায় ফ্রয়েডের *The Interpretation of Dreams* (১৯০০) এবং *Three Contribution to the Theory of Sex* (১৯০৫) গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাপক প্রভাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

২. রবীন্দ্রনাথের (১৩৮৮ : ১০১) এই আধুনিকতায় নদীর বাঁকের প্রসঙ্গ থাকলেও তা বরং জলের আপাতঃ সারল্যের অন্তর্দেশে অদৃশ্য আবর্তের সঙ্গেই তুলনীয়। তাতে আধুনিক জীবন ও জগতের জটিলতাকে যথেষ্ট মূল্য দেয় বলে মনে হয় না। ফলে এ বিষয়ক বিতর্কের সন্তোষজনক সমাধান রবীন্দ্রনাথে নেই, তাঁর সফল উত্তরসূরিদের দ্বারস্থ হওয়াই সমীচীন বলে আমাদের বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> কবি স্রোতের শ্যাওলা নন, সুতরাং যুগের স্রোতে নিশ্চয়ই তিনি ভেসে যাবেন না, যুগের অভিজ্ঞতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাগুলিকে আত্মসাৎ করার প্রয়োজন ঘটে। কবির মনোভঙ্গি যুগের পরিবর্তিত মানসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে ঘাত-প্রতিঘাতে, গড়ে উঠছে, কবিতায় তার স্বাক্ষর থাকলেই যথেষ্ট (বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮১ : ৩৮)।

৩. বুদ্ধদেব বসুর (১৯৮৩ : আট) আধুনিকতার ধারণা অনেকটাই স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। তাঁর এই বিবেচনাকে আমলে আনলে যে কোন সৃষ্টিশীল কবিকেই আধুনিক কবি বলতে হয়।

৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৮২ : ২-৩) ভাবের দিক থেকে বারোটি এবং আঙ্গিকের দিক থেকে বারোটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে আধুনিক কবিতার মূল্যায়ন করেছেন যা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পাঠকের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৫. মাহবুবুল হক (২০০৫ : ১২-১৩) আধুনিক কবিতার ভাববস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও আঙ্গিকগত কিছু সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন।

৬. বারীন্দ্র বসুর এই বিশ্লেষণকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করেছেন মাহবুবুল হক (২০০৫ : ২৩)। তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র হিসেবে এই বিবেচনা যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

৭. জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার কথা'(২০০২ : ১৭) প্রবন্ধে বলেছেন –

> কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব বলতে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এ অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তিবোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।

কবির এই উপলব্ধিই তাঁর কবিতায় যোগ করেছে ভিন্নমাত্রা।

৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* (১৯৩১) পত্রিকা আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। *পরিচয়* প্রথমে ত্রৈমাসিক সাময়িকপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রথম পাঁচ বছর পর এটি প্রকাশিত হয় মাসিক হিসেবে ।

৯. বুদ্ধদেব বসু (২০০১ : ১০৭) "অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা-বদল" প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন, 'সমকালীন বাংলা দেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী'। এই বিশেষণ কবিকে বোঝার জন্য খুব উপকারি হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। বরং অমিয় চক্রবর্তীর স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে এটি সুন্দর ও মোলায়েম দেয়াল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০. অমিয় চক্রবর্তী ১৯২১ সালে অনুশীলন-ছাত্র ও শিক্ষকরূপে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন, রবীন্দ্রনাথের সচিব হন ১৯২৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য সফরে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩৩ এর পর তিনি সচিব পদ ত্যাগ করে অক্সফোর্ডে যান।

১১. তারেক রেজা, 'আহসান হাবীবের কবিতা : বিক্ষুব্ধ কালের কণ্ঠস্বর', *ভাষা-সাহিত্যপত্র*, ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৪, সম্পাদক : ড. পৃথ্বিলা নাজনীন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৩৪।

১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০২, 'বিশ শতকের বাংলা কবিতা', *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং*, প্রথম প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ১৩২।

১৩. মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী আর্থনীতিক উপরি-কাঠামো (*Super-Structure)* বলতে রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দতত্ত্ব ইত্যাদি বোঝানো হয়।

১৪. মাহবুবুল হক (২০০৫ : ৩৮) এই পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন। এর উৎস বা সূত্র সম্পর্কে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নি।

১৫. ধনঞ্জয় দাশ (২০০৩ : ৬) বলেছেন, এলবার্ট হলে এই শোকসভা হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই, কিন্তু বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৯ : ২৩৮) উল্লেখ করেছেন, এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫ জুন।

১৬. উদ্ধৃত, ধনঞ্জয় দাশ (২০০৩ : ৬–৭)

১৭. নেপাল মজুমদার ও অশ্রুকুমার শিকদারের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন মাহবুবুল হক (২০০৫ : ৪৪)।

১৮. প্রগতির-র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৯১) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রগতির ইতিকথা'-য় উল্লেখ করেছেন সংকলনে এমন লেখকদের রচনাও সন্নিবেশিত যাঁরা পরবর্তীকালে প্রগতি লেখক সংঘের ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকার বিরোধিতা করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সজনীকান্ত দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯. দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইশতেহারে বলা হয়েছে, 'যা কিছু আমাদের বিচার-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।' (১৯৮৬ : ২৫০-২৫১)।

২০. ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট 'জার্মান-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি' হয়। বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের অগ্রসর অংশের সংযুক্তির ফলে ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রচার-আন্দোলন সীমিত হয়ে পড়ে। এই সময় *প্রতিরোধ, নবযুগ, 'বলাকা', প্রগতি* প্রভৃতি পত্রিকায় মার্কসীয় চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

২১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতি গ্রহণ করে। এই জোট 'মিত্রশক্তি' নামে পরিচিত।

২২. হীরেণ মুখার্জির 'Bengals Writers & Artists', *People's War*, January 10, 1943 অবলম্বনে উদ্ধৃত করেছেন ধনঞ্জয় দাশ (২০০৩ : ২০)।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অনীক মাহমুদ, ১৯৯৫, *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৯৮, *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ দাশ*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা।

৩. আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৪০, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, কবিতা ভবন, কলকাতা।

৪. অশোক কুমার মিশ্র, ২০০২, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা [১৯০১–২০০০]*, প্রথম দে'জ সংস্করণ,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫. জীবনানন্দ দাশ, ২০০২, *কবিতার কথা*, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

৬. দিলীপ মজুমদার (সম্পাদিত), ১৯৮৬, *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা।

৭. দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৮২, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৮. ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), ২০০৩, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৯. বারীন্দ্র বসু, ১৯৯২, *বোদলেয়ার থেকে এলিয়ট ও বাঙলা কবিতা*, কার্ষ্ণি-রাধেয়, কলকাতা।

১০. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮১, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৪, *আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৯, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা।

১৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০২, *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং*, অনন্যা, ঢাকা।

১৪. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬০, *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৫. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮৩, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, পুনর্মুদ্রণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা।

১৬. বুদ্ধদেব বসু, ২০০১, *প্রবন্ধ সংকলন*, পঞ্চম সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৭. বেগম আকতার কামাল, ১৯৯২, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৮. মঞ্জুভাষ মিত্র, ১৯৮৬, *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব*, নবার্ক, কলকাতা।

১৯. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২০. মাহবুবা সিদ্দিকী, ১৯৯৪, *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজচেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২১. মাহবুবুল হক, ২০০৫, *তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৮, *সাহিত্যের পথে*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা।

২৩. সুকুমার সেন, ২০০২, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৯৫, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৫. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০৪, *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৬. সুমিতা চক্রবর্তী, ১৯৯৬, *আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

২৭. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ১৯৯২, *কতিপয় প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৮. হায়াৎ মামুদ, ১৯৮৭, *সোমেন চন্দ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৯. হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯২, *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানসগঠন ও শিল্পবোধের স্বরূপ

প্রথম মহাসমর পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে অবিশ্বাস, অবক্ষয়, অসঙ্গতি, বিপর্যয়, বিচ্যুতি ও বৈনাশিকতার প্রভাব যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি সমাজতান্ত্রিক চেতনাপুষ্ট প্রগতিশীল সাহিত্যের একটি ধারাও এই কালপর্বে আত্মপ্রকাশ করে। অশুভ শক্তির আধিপত্য থেকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি এবং সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে দিন বদলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই বাংলা কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। হতাশার পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়ে আশা ও উজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুগধর্মের দ্বিবিধ স্রোতের মধ্যে প্রতিকূলতার পরিশ্রমকেই বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতা প্রগতির পথে প্রয়োজনীয় আন্দোলন-সংগ্রামে হাতিয়ার হিসেবে ঝলসে উঠেছে। আবার শিল্পের কাঙ্ক্ষিত ঋদ্ধির প্রশ্নেও তিনি ছিলেন আপসহীন। জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ব থেকেই উদ্ভূত তাঁর এই জীবনকে অর্থবহ করার অভিপ্রায়, যা তাকে ক্রমাগত কঠিনের পথে পরিচালিত করেছে। যে-কোনো সৃজনশীল ব্যক্তিসত্তার অন্তর্লোকের বৈশিষ্ট্য ও যুগধর্মের প্রভাব অনুভব ও উপলব্ধির রসে জারিত হয়েই গড়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিচিহ্নিত শিল্পভুবন।[১] তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্রিত প্রগতি-চেতনা ও প্রকরণকাঠামোর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই তাঁর জীবনবোধ, শিল্পদৃষ্টি ও মনোজগতের মৌল প্রবণতাসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পরিবার, শৈশব ও শিক্ষাজীবন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে, তাঁর মামার বাড়িতে।[২] বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার লোকনাথপুরে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। মা শ্রীমতী যামিনী দেবী, বাবা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ক্ষিতীশচন্দ্র ছিলেন আবগারি বিভাগের প্রসিকিউটর। তিনি কলকাতার ৫০ নম্বর নেবুতলা লেনে বাস করতেন। ছেলেবেলার প্রথম দিকটা এই বাড়ির দোতলায় যৌথ পরিবারে কাটিয়েছেন সুভাষ। বাবা, মা, দাদা, দিদি সহ তিন কাকা ও ঠাকুর্দা– এই বিশাল পরিবারের পুরো দায়িত্ব পালন করতে হতো ক্ষিতীশচন্দ্রকে। ফলে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ক্ষিতীশচন্দ্রের পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। বদলির চাকরি, তাই এক জায়গায় স্থিত হওয়ার আগেই আবার তাকে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হতো। কলকাতা থেকে বদলি হয়ে তিনি চলে আসেন বাংলাদেশে, রাজশাহীর নওগাঁয়। ফলে তিন-চার বছর বয়স থেকে প্রায় ১১ বছর, ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সুভাষ নওগাঁতেই কাটিয়েছেন। তাঁর শৈশবের সমস্ত মধুর ও বেদনার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই বাংলাদেশ।

নওগাঁর জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুভাষ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। 'মফস্বল শহরে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে সরকারি কোয়ার্টারে বাস করার ফলে জাতের বালাইটা কখনই আমার মনে তেমন চেপে বসতে পারে নি, তাছাড়া প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারগুলোতে আমাদের ছোটদের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ : ৬৯)। মুসলমানদের যে-কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সুভাষও আনন্দে মেতে উঠতেন। আত্রাই নদী-প্রবাহিত খাল-

Dhaka University Institutional Repository

বিলে পূর্ণ নওগাঁ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মুখর ছিল। গান-বাজনা-থিয়েটার-স্পোর্টস – এইসব নিয়ে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ থাকত নওগাঁ। সুভাষের বাবা এসব আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাবার প্রেরণাতেই আবৃত্তি ও গানে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এছাড়া সেজোকাকা আর দাদারও 'গাইয়ে' হিসেবে নামডাক ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত দিনগুলোতে নওগাঁও ছিল উত্তাল, যার প্রভাব বালক সুভাষের মনে রেখাপাত করেছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবনের শুরু একটু বেশি বয়সে। নওগাঁর সরকারি বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁর অক্ষর পরিচয়। আট বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন নওগাঁর মাইনর স্কুলে। পড়াশোনায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন স্তর থেকে আসা সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে এবং সরকারি কোয়ার্টারের আন্তরিক পরিবেশে নানা চিন্তা ও রুচির মানুষের সান্নিধ্যে বিচিত্র ভাষা ও শব্দভাণ্ডার গড়ে ওঠে তাঁর। সুভাষের বাবা আবার বদলি হয়ে যান কলকাতায়, ১৯৩০ সালে, প্রথমে ওঠেন কাকার বাসায়, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনে। সুভাষকে ভর্তি করা হয় কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে। স্কুলের বউবাজার শাখায় তিনি ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণীতে। বউবাজার স্ট্রিটেই পরে বাসা নেন তাঁরা। কলকাতার যান্ত্রিকতায় প্রথমে তিনি বেশ বিব্রত বোধ করলেও ধীরে ধীরে কলকাতাকে ভালোবেসে ফেলেন তিনি। ঘুরে ঘুরে শহর দেখার অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন, কলকাতার সঙ্গে আপন মনে কথা বলতে বলতে এই শহরই তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে।

স্বদেশী আন্দোলনে কলকাতা তখন উত্তাল। সারা দিন মিছিল, মিটিং। এর তপ্ত ঢেউ বালক সুভাষের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই স্কুলের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে চার আনা পয়সা দিয়ে তিনি খদ্দরের টুপি কিনে আনেন, অন্ধকার ঘরে বসে পাঠ করেন বে-আইনী বুলেটিন। এভাবেই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও ঘৃণা জমা হতে থাকে। এই সময় তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য হারিয়ে ফেলেন, হ্রাস পায় দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিক্ষমতা।

তিরিশের দশকে তাঁদের পরিবার অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়ে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে তাঁর কাকা জুটমিলের চাকরি হারান, বাবার আয়ও কমে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে অক্রূর লেনের বাসা ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতার ছোট একটা বাসায় উঠে আসেন তাঁরা। সুভাষ ভর্তি হন সত্যভামা ইনস্টিটিউটে, সপ্তম শ্রেণীতে। সেখানে বক্সিং আর জিমন্যাস্টিক্স-এর পান্নালাল ঘোষের (১৯১১–১৯৬০) সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। ১৯৩৪ সালে স্কুলে এক শিক্ষক ধর্মঘটে জড়িয়ে গেলে সেই স্কুলও ছাড়তে হয় তাঁকে।

এরপর তিনি ভবানীপুর মিত্র স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে শিক্ষক হিসেবে পান কালিদাস রায়কে (১৮৯৯–১৯৭৫) এবং পরিচিত হন মুরলীধর বসুর (১৮৯৭–১৯৬০) সঙ্গে। সুভাষ তখন জানতেন না এই মুরলীধর বসুই বিখ্যাত *কালিকলম* পত্রিকার সম্পাদক। এখানেই সহপাঠী হিসেবে হিসেবে তিনি পান শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রমানাথ রায়, পরিমল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, খেলোয়াড় নির্মল চক্রবর্তীকে।[৩] সুভাষের খেলাধুলো ও সাহিত্যচর্চা দুটোই তখন বেশ সমান তালে চলছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুভাষের আগ্রহেই বেতারে গান পরিবেশন করেন। মিত্র স্কুল থেকে ইতিহাস ও সংস্কৃতে

Dhaka University Institutional Repository

লেটারসহ ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর তিনি আই. এ.-তে ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। এই সময় কবি সমর সেনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুবাদে তাঁর কাছ থেকে *হ্যান্ডবুক অব মার্কসিজম* নামে একটি বই নিয়ে পাঠ করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যা তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তরকালে সুভাষের বামপন্থী রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে এটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

১৯৩৯ সালে তিনি আই. এ. পাশ করে ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। এই কলেজ থেকেই ১৯৪১ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন। দর্শনে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি অনার্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন নিয়ে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হলেও তাঁর আর এম. এ. পরীক্ষা দেয়া হয় নি।

রাজনীতি ও কর্মজীবন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ছাত্রজীবনেই। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার শৈশবে তাঁর মনে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, সেই প্রভাব কখনোই তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। ছাত্রসমাজ বিভিন্ন সময়ে নানা ইস্যুতে মিছিল, সমাবেশ করত। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ছাত্রসংগঠন সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদের শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল যার নেতৃত্বে থাকত উগ্রপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। এই রকমই একটি সংগঠন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিশোর ছাত্রদল'-এর সঙ্গে ১৯৩২–১৯৩৩ সালের দিকে যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। এ সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে –

> ১৯৩০-এর দিনগুলো এখনও আমার চোখে ভাসে। বৌবাজার স্ট্রীটের ওপর বিপিসিসি আপিশের সামনে রোজ ঠিক ঘড়ি ধরে লোকের জমায়েত, হাতে হাতে ফেরা ইস্তেহার, গলায় গলা মিলিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি। পুলিশের গাড়িতে গ্রেফতার বরণ করে স্বেচ্ছাসেবকেরা যখন জেলে চলে যেত– ভারি পায়ে সব বাড়ি ফিরতাম' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩৭৬ : ১১৪–১১৫)।

সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মার্কসীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। কার্ল মার্কস (১৮১৮–১৯৮৩)-এর তত্ত্ব তাঁর জীবনকে আলোকিত আগামীর পথে আশাবাদী করে তোলে। তিনি নিয়মিত মার্কসবাদের ক্লাশ করতে শুরু করেন। মার্কসীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রবেশ ঘটে। এই সময় লেবার পার্টির নেতা বিশ্বনাথ দুবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি সরাসরি লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।[৪] খিদিরপুর ডক শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির হয়ে কাজও শুরু করে দেন সুভাষ। তখনও পর্যন্ত লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কি তফাৎ, তা জানা ছিল না সুভাষের। কিন্তু কিছু পরে রাজনৈতিক প্রশ্নে তখনকার বহু কমিউনিস্ট লেবার পার্টি ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ায় তাঁর মনে ধাক্কা লাগে। এ অবস্থায় শিল্পীবন্ধু সুনীল জানার বাড়িতে তাঁর যোগাযোগ হয় তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গে। সুনীল জানার সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পরিচয় খুব শীঘ্রই ঘনিষ্টতায় পরিণত হয় এবং এ বছরই লেবার পার্টি ত্যাগ করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন সুভাষ। তিনি পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৪২ সালে। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সোমেন চন্দ নিহত হলে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্তকে সভাপতি করে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র সাংগঠনিক কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত হয়। কবি বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ বছর ১৯-২০ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এ সংগঠনের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে সুভাষ সংঘের কর্মতৎপরতা-বিষয়ক প্রতিবেদন পাঠ করেন। সেই সঙ্গে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর সদস্য হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেন তিনি। ১৯৪২ সালেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'-এ সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। এ কাজে তাঁকে মাসিক পনের টাকা ভাতা দেয়া হতো। এই সময়ে কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর (১৯০৯–১৯৮৪) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সম্পর্ক তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যেমন প্রভাব ফেলেছে তেমনি তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নির্মাণেও পালন করেছে দূরপ্রসারী ভূমিকা। চল্লিশের বছরগুলোতে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয় মানবসৃষ্ট কৃত্রিম সংকট। বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী ঘুরে ঘুরে দেখেন সুভাষ, প্রথমে এসকর্ট এবং পরে পত্রিকার রির্পোটার হিসেবে।

১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অংশগ্রহণ করেন (ধনঞ্জয় দাশ ২০০৩ : ২১)। ১৯৪৬ সালে তিনি সাংবাদিক হিসেবে 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকায় কাজ করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। এ প্রসঙ্গে একজন কমিউনিস্ট কর্মীর স্মৃতিচারণ উল্লেখ করা যেতে পারে –

> Subhas too moved on the staff of *Swadhinata*, which was our party organ. Here too Subhas left his mark. Under the able guidance of its editor, Somnath Lahiri, Subhas as a roving reporter evolved a new form of writing, which we called reportage.[৫]

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ভারতের কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি উগ্র বামপন্থা নীতি গ্রহণ করে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নীতি অবলম্বন করলে ভারত সরকার ২৭ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করতে শুরু করে সরকার। অনেক সদস্য কারাবরণ করেন, আবার অনেকে আত্মগোপন করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বিনা বিচারের বন্দি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও গ্রেফতার হন। দমদম জেলে কমিউনিস্ট বন্দিদের বিখ্যাত হাঙ্গার স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করেন তিনি। পরে তাঁকে ভুটানের বক্সায় স্থানান্তর করা হয়। (মাহবুবুল হক ২০০৫ : ১৭৪; সন্দীপ দত্ত ২০০২ : ২০৪)। এই কারাগারে তিনি আব্দুর রজ্জাক, সতীশ পাকড়াশী, পারভেজ শহীদি, চারু মজুমদার, গিরিজা মুখার্জী, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

কারামুক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তিনি বিব্রত বোধ করেন। এছাড়া এই সময়ে পিতার অবসর গ্রহণ, মায়ের ও দাদার মৃত্যু ইত্যাদি কারণে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে পড়ায় মাসিক মাত্র পঁচাত্তর টাকায় একটি প্রকাশনা সংস্থায় সাব-এডিটরের চাকরি নেন। এ চাকরি অবশ্য তিনি বেশি দিন করতে পারেন নি। দ্রুত চাকরি ছেড়ে তিনি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচেন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ চাকরি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে *পরিচয়* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ঐ বছরই তিনি শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫২ সালে চটকল মজুর সংগঠনের কাজে সুভাষ সস্ত্রীক চলে যান বজবজ। এ প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ –

> গ্রাম ব্যঞ্জনহেড়িয়া। চটকল আর তেলকলের মজুরদের বাস। মাটির ঘর। সামনে এঁদো পুকুর। আঠারো টাকা ভাড়া। দুজনেই সর্বক্ষণের কর্মী। বিনা ভাতায়। লেখালেখি থেকে মাসে সাকুল্যে আয় পঞ্চাশ টাকা। একে অনিশ্চিত তাও পাঁচ দশ টাকার কিস্তি তে (১৯৯৬ : ১৩২)।

পার্টির কাজ, শ্রমিক ইউনিয়নের কাজ, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা, *পরিচয়* সম্পাদনা এবং লেখালেখি ইত্যাদি নিয়ে সুভাষ পার করেছেন তাঁর কর্মমুখর দিনগুলো। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বহু সাহিত্যিক ঢাকায় আসেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এই সম্মেলনেই তিনি পরিচিত হন কবি নাজিম হিকমতের (১৯০২-১৯৬৩) সঙ্গে, যার প্রভাব তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ছিল সুদূরপ্রসারী।

বজবজ থেকে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ শুরু করেন পোর্ট অঞ্চলে। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরের কোন্দল তখন চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পুরোনো পার্টিতেই থেকে যান। ১৯৬৭ সালে বিধানসভা না ডেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিলে তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেফতার বরণ করেন এবং তাঁকে তেরো দিন কারাগারে থাকতে হয় (সন্দীপ দত্ত ২০০২ : ২০৪)। কারামুক্তির পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শগত ব্যবধানে তিনি ব্যথিত হন। নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল না।

১৯৭৫ সালেই ভারতীয় রাজনীতিতে সঞ্জয় গান্ধীর অভ্যুত্থান ঘটে। মে–জুন মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরাবিরোধী আন্দোলন হয়। ২৬ জুন সারা দেশে জরুরি অবস্থা ও সেনসর আইন চালু করা হয়। এই জরুরি অবস্থা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হয়।

১৯৭৭ সালের ১৬–২০ মার্চ লোকসভা নির্বাচন হয়; নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জনতা দল ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হন শ্রী মোরারজী দেশাই। জরুরি অবস্থা তুলে দেয়া হয়। এইসব রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তাঁর চিন্তাজগতে আলোড়ন ঘটে। এ ছাড়া আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজও তিনি আর আগের মতো করতে পারছিলেন না। পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তিনি দলের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি পার্টির সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় না দিয়ে একজন মানবতাবাদী সাহিত্যিক হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছিল– একথা খুব সরলভাবে বলা যায় না। দলত্যাগের মাধ্যমে মার্কসীয় রাজনীতির মৌল প্রবণতার প্রতি তাঁর অনাস্থা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিত তাঁর সহযোদ্ধাদের কট্টর মনোভাব, যা তাঁর কাছে এক ধরনের মৌলবাদ হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে, তাঁকে আহত-বিব্রত-বিক্ষত করেছে। একই সঙ্গে 'ভেতরে বাহিরে মিল না হওয়ার' ব্যাপারটিকে তাঁর মনে হয়েছে চরম শঠতা, ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি দলে থেকেই এর প্রতিবাদের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নীতিনির্ধারকদের তিনি মার্কসবাদের প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত করতে পারেন নি। বরং তাঁকেই দলীয় শৃঙ্খলা এবং মার্কসীয় রাজনীতির পরিপন্থী কাজে অংশগ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে।[৬] ফলে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর যে জীবনদৃষ্টি গড়ে উঠেছে, সেই দৃষ্টিই তাকে অন্য পথে হাঁটতে শিখিয়েছে। আমাদের বিবেচনায়, দল ত্যাগ করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরই আনুগত্য করেছেন। তবে দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, সেই দেখার চোখ তিনি লাভ করেছেন মার্কসীয় রাজনীতির নিবিষ্ট চর্চার মাধ্যমেই।[৭] মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের মন্ত্রই একটু মৃদু হয়ে, আরো নৈর্ব্যক্তিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী সাহিত্যকর্মে। তাঁর শিল্পবোধের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখে তাঁকে পাঠ করলে একথা অনায়াসেই বলা যাবে যে, *পদাতিক*-এর যে কবির আবির্ভাবে বাংলা কবিতার জগতে বিস্ময় জেগেছিল, সেই জগৎ ত্যাগ করে একেবারে ভিন্ন, ব্যতিক্রমী ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যজীবন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবন তাঁর যাপিত-জীবনেরই শিল্পভাষ্য। কবিতার সঙ্গে জীবনের এমন প্রগাঢ় বন্ধনের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। শৈশব-যৌবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন শব্দে-ছন্দে-উপমায়-চিত্রকল্পে এবং সেই সঙ্গে মানুষ হিসেবে সকল দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতার ভুবন। ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও কাব্যাদর্শের সম্মেলনেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। গদ্য রচনায় সুভাষের স্বীকৃতি কবিতার তুলনায় অনুজ্জ্বল হলেও ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি তাঁর সমগ্র রচনাকেই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে।

ছেলেবেলা নওগাঁ থাকাকালে সাহিত্য-চর্চায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতেখড়ি। তাঁর বয়স যখন আট, তখন প্রতিবেশী বিদুষী বৌদির আমন্ত্রণে বিকেলের চা-চক্রে কবিতা পড়তে অনুরুদ্ধ হন তিনি। সেই যে মরিয়া হয়ে কবিতা লেখা, তা-ই তাঁকে কবিতার সঙ্গে আজন্মের গাঁটছড়া বেঁধে দিল। প্রকৃতি-বিষয়ক সেই লেখা শুনে বৌদি মোটেই খুশি হন নি, কারণ তিনি চেয়েছিলেন দেশের সমকালীন অস্থিরতা, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের ছোঁয়া থাকবে সুভাষের কবিতায়। বৌদির এই অতৃপ্তি সুভাষকে আহত করেছিল। তারপর কিছুদিন গদ্য লেখার চেষ্টা। সত্যভামা ইনস্টিটিউটে ক্লাশ সেভেনে পড়ার সময় ফল্গু নামের স্কুল ম্যাগাজিনে

Dhaka University Institutional Repository

'কথিকা' শীর্ষক কাব্যঘেঁষা গদ্য লিখে খুব প্রশংসিত হন। এটিই সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা (সন্দীপ দত্ত ২০০২ : ২০৫)। তারপর বন্ধুদের অনুরোধে আবার কবিতা লেখার চেষ্টা। পাশের বাড়ির ধোপার কাপড়কাচা নিয়ে একটা কবিতার কথা সুভাষ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। জয়রামপুরে দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দিদির বাড়ির আত্মীয় জনৈক স্কুল শিক্ষকের কাছে তিনি ছন্দশিক্ষা লাভ করেন। এভাবেই কবিতার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর, আর এই খেলায় সবচেয়ে বেশি সহায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্কুল ম্যাগাজিনের বাইরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় অসিত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিষাণ' পত্রিকায়। 'রবিবাবুকে' নামক কবিতাটি ১৯৩৬-১৯৩৭ সালের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[৮]
ভবানীপুর মিত্র স্কুলে পড়ার সময় শিক্ষক কালিদাস রায়ের কাছ থেকে তিনি 'সত্যিকার বাংলা ভাষা' শিখেছিলেন। স্যারের স্নেহেই স্কুল ম্যাগাজিন *মৈত্রী* সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন তিনি। এই সময় তিনি লেখালেখির বিষয়ে বেশ মনোযোগী হয়ে ওঠেন। লোকনাথপুরে দিদির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কবি সাবিত্রীপ্রসন্নর বাড়ির লাইব্রেরিতে প্রচুর বইয়ের সন্ধান পান। এখানেই তিনি *আত্মশক্তি, বিজলী, কল্লোল, কালিকলম* ইত্যাদি পত্রিকা পান। বিশেষ করে *কল্লোল*, আর *কালিকলম* তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিল।

স্কুলে পড়ার সময় শাঁখারীপাড়ায় 'কল্যাণ সংঘ'-এর সাহিত্য শাখার সম্পাদক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রমাকৃষ্ণ মৈত্র। এই দুই বন্ধুর আকর্ষণে ঐ সংঘ ও পত্রিকার সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সময় তিনি ডাক মারফত কবিতা পাঠাতে থাকেন এবং নানা পত্রিকায় তা ছাপা হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে *কবিতা* পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি পেয়ে সুভাষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু সুভাষের 'সকালের প্রার্থনা' ও 'রোমান্টিক' কবিতা দুটির প্রশংসা করে আলোচনা করেন। কবিতা দুটি পরে *কবিতা* পত্রিকায় ছাপা হয়। এ সম্পর্কে সুভাষের অনুভূতি লক্ষ করার মতো –

> ...কবিতা-সম্পাদকের কাছ-থেকে-পাওয়া চিঠি আমার প্রথম চমক। একটি পোস্টকার্ডে দু-টি কবিতা মনোনীত হওয়ার খবরের তলায় একটি রোমহর্ষক নামের স্বাক্ষর– বুদ্ধদেব বসু। চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছিল সুবিধেমতো আমি যেন একদিন যাই (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৪ : ৮০)।

এরপর থেকে কবিতাভবনের আড্ডায় সুভাষের নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। একই সময় *যুগান্ত র* পত্রিকার রবিবাসরীয়তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'মে দিনের গান' পাঠাতেই ডেকে আলাপ করেন সম্পাদক প্রবোধকুমার সান্যাল। ১৯৩৭ সালে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, অশোক মিত্র প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৩৮ সালে 'চীন : ১৯৩৮' কবিতাটির সূত্রে পরিচয় হয় *আনন্দবাজার* পত্রিকার বার্তা সম্পাদক কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে। এ সময় থেকেই *কবিতা* পত্রিকায় নিয়মিত সুভাষের কবিতা ছাপা হতে থাকে।

১৯৪০ সালে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহে ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বৃত্তির অর্থে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক*। এই গ্রন্থ বাংলা কবিতার জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বুদ্ধদেব বসু *কবিতা* পত্রিকার পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যায় *পদাতিক*-এর কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা*-র সংকলনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়।[৯]

পদাতিক প্রকাশের পর থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে এই আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে নেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক *জনযুদ্ধ*-এর সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে এই পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ীর আগ্রহে তিনি গদ্য লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষার এক নতুন ধরনের সাংবাদিক গদ্য লেখেন সুভাষ যা রিপোর্টাজ নামে পরিচিত হয়। এই গদ্য সম্পর্কে জনৈক কমিউনিস্ট কর্মীর মন্তব্য –

> It was based on facts but had a strong literary flavour. And thus Subhas achieved distinction not only as a writer of poetry but also a new form of prose.[১০]

১৯৪৩ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে সুভাষ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত *কেন লিখি* শীর্ষক গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে। গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেন *এক সূত্রে*। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে তিনি যোগ দেন। এইসব রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে তাঁর মৌলিক লেখার পরিমাণ এ সময়ে হ্রাস পায়।

১৯৪৮ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিকোণ* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউজ। এই বছর কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে তিনি কারাবরণ করেন। জেলখানার দুই বছর কিছু গান লিখেছেন আর কবিতা অনুবাদ করেছেন। ১৯৫০ সালে কলকাতার সারস্বত লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় *চিরকুট*। ১৯৫১ সালে পার্টির নির্দেশে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন দুই মেয়াদে– প্রথমে ১৯৫১–১৯৫২ এবং পরে ১৯৬৬– ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ *আমার বাংলা*।

১৯৫২ সালে সস্ত্রীক বজবজ চলে যান মজুর ইউনিয়নের কাজে। এখানে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের সবচেয়ে উর্বর সময় পার করেন। অজস্র লেখালেখি ও অনুবাদকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তিনি। শ্রমিকদের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। ফলে তাঁর নন্দনচিন্তায়ও আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় (সন্দীপ দত্ত : ২০৬–২০৭)। এ বছরই সুভাষ মুখোপাধ্যায় তুরস্কের বিপ্লবী কবি নাজিম হিকমত (১৯০২-১৯৬৩)-এর কবিতার প্রথম বাংলা অনুবাদ *নাজিম হিকমতের কবিতা* প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে ভবানী ভট্টাচার্যের *So Many Hungers*-এর অনুবাদ *কত ক্ষুধা*, ১৯৫৪ সালে *রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ* প্রকাশিত হয়। এই সময় ছোটদের জন্য বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিশোরদের জন্য নানা-বিষয়ক গ্রন্থে তাঁর শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। ১৯৫২ সালে ডক্টর নীহাররঞ্জন

Dhaka University Institutional Repository

রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে কিশোর উপযোগী করে তিনি প্রকাশ করেন। এছাড়াও রয়েছে *অক্ষরে অক্ষরে* (১৯৫৪), *কথার কথা* (১৯৫৫) ও *দেশ-বিদেশের রূপকথা* (১৯৫৭)। ১৯৫৫ সালে অল্প লেখাপড়া জানা শ্রমিকদের জন্য তিনি কার্ল মার্কস-এর *ওয়েজ লেবার এন্ড ক্যাপিটাল* অনুসরণে লেখেন *ভূতের বেগার*। ১৯৫৭-তে প্রকাশিত হয় *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা*। ১৯৫৮ সালে প্রথম বিদেশে যান তিনি। তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে গিয়ে পরিচিত হন নাজিম হিতমতের সঙ্গে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সৃজনশীলতার স্রোত ষাটের দশকেও অব্যাহত থাকে। প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ– *যত দূরেই যাই* (১৯৬২), *কাল মধুমাস* (১৯৬৬); অনুবাদকাব্য– *দিন আসবে* (১৯৬৯), গদ্যগ্রন্থ– *নারদের ডায়রী* (১৯৬৯), *যেতে যেতে দেখা* (১৯৬৯); অনুবাদ গদ্য– *ব্যাঘ্রকেতন* (১৯৬০), *রুশ গল্প সঞ্চয়ন* (১৯৬৩), *ইভান দোনিসোভিচের জীবনের একদিন* (১৯৬৮), *ডোরা কাটার অভিসারে* (১৯৬৯)।[১১] ষাটের দশকের প্রথম দিকে (১৯৬১–১৯৬৩) তিনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ছোটদের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা *সন্দেশ* সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন।

এই সময় তিনি আফ্রো-এশীয় রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬২-তে কায়রোয়, ১৯৭৩-এ বৈইরুটে, ১৯৭৩-এ আলমাআতায়, ১৯৭৮ সালে লুয়ানদায়– ক্রমে চীন ছাড়া প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যান। ১৯৭০ সালে দিল্লীতে সংস্থার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। পরে এই সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারি পদেও তিনি অধিষ্ঠিত হন। এভাবেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও কবিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাশিয়ার রসুলগামজাভব, মির্জা ইব্রাহিম, ইয়েভতুশেঙ্কো, নিকলাই, জাপানী লেখক ও কবি হোতা অকাচি, ভিয়েৎনামী কবি তেহান, পাকিস্তানের ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ প্রমুখ বিশ্বখ্যাত কবি ও লেখকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ– *এই ভাই* (১৯৭১), *ছেলে গেছে বনে* (১৯৭২), *একটু পা চালিয়ে ভাই* (১৯৭৯); অনুবাদ কাব্য– *পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ* (১৯৭৩), *রোগা ঈগল* (১৯৭৪), *নাজিম হিতমতের আরো কবিতা* (১৯৭৯); গদ্য রচনা– *ক্ষমা নেই* (১৯৭২), *ভিয়েতনামে কিছুদিন* (১৯৭৪); অনুবাদ গদ্য – *চে গেভারার ডায়রি* (১৯৭৭)। ঔপন্যাসিক হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ এই দশকেই। রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে জেলজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মাত্র একুশ দিনে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস *হাংরাস* প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। দ্বিতীয় উপন্যাস *কে কোথায় যায়* ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয়।

উনিশ শো আশির দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– *মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো* (১৯৮০), *জল সইতে* (১৯৮১), *চইচই-চইচই* (১৯৮৩), *বাঘ ডেকেছিল* (১৯৮৫), *যা রে কাগজের নৌকো* (১৯৮৯), *গাথা সপ্তশতী* (১৯৮৯) অনুবাদ কাব্য– *হাফিজের কবিতা* (১৯৮৪), *চর্যাপদ* (১৯৮৬), *অমরু-শতক* (১৯৮৮); গদ্য রচনা– *আবার বাঘ বাংলার ডাকে* (১৯৮৪), *টোটো কোম্পানি* (১৯৮৪), *এখন এখানে* (১৯৮৬), *খোলা হাতে খোলা মনে* (১৯৮৭); আত্মজীবনী– *আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন* (১৯৮৭),

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস– *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* (১৯৮৩), *কাঁচা-পাকা* (১৯৮৯)।

নব্বইয়ের দশকেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-চর্চায় নিবেদিত ছিলেন। এই সময়ে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ– *ধর্মের কল* (১৯৯১), *একবার বিদায় দে মা* (১৯৯৫), কাব্য-সংকলন– *কবিতা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড ১৯৯২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৩, তৃতীয় খণ্ড ১৯৯৪, চতুর্থ খণ্ড ১৯৯৪, পঞ্চম খণ্ড ১৯৯৫); *ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই* (১৯৯৪); উপন্যাস– *কমরেড, কথা কও* (১৯৯০), গদ্য সংকলন– *গদ্য সংগ্রহ* (১৯৯৪)।[১২]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে ক্রমাগত লিখেছেন। কখনো জীবিকার প্রয়োজনে, কখনো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনে, সর্বোপরি জীবনের প্রয়োজনে তিনি সক্রিয় থেকেছেন। সমাজের সঙ্গে, রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে এবং কখনো কখনো নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছেন, বিদ্রোহের ভাষাকে কবিতার ভাষায় রূপান্তর করে এগিয়ে গেছেন বিপ্লবের পথে এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসার জগতকে জড়িয়ে দিয়েছেন সামষ্টিক উদ্বোধনের মূলস্রোতের সঙ্গে। ফলে সুভাষের কণ্ঠস্বর স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়েও সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, শব্দের শক্তিকে আবিষ্কার করার এক অভিনব কৌশল সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

জীবনবোধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষের ভগ্ন-বিশ্বাস ও বিপন্ন মূল্যবোধের বিপরীতে আশা ও উজ্জীবনের ধারায় জীবনের সদর্থক প্রান্তকে স্পর্শ করার প্রগাঢ় প্রত্যয়ে বেড়ে উঠতে উঠতে আরো একটি মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হলো মানবসভ্যতা, যার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধসহ বহুবিধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে উঠেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রাতিস্বিক জীবনবোধ। যে বিচ্ছিন্নতা ও বৈনাশিকতার প্রতাপে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত, সেই পৃথিবীর একজন সতর্ক এবং সাহসী মানুষ হিসেবে সুভাষ বেছে নিয়েছেন এই ক্ষত ও ক্ষতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের পথ। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানুষের শ্লোগান শুনতে শুনতে তিনি বড় হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে তাঁর বাল্যকাল হয়েছে বিলোড়িত এবং এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, সংঘবদ্ধ শক্তির উন্মেষ ব্যতীত উদ্ধার অসম্ভব। এইসব ঘটনার পেক্ষাপটেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৈশোর থেকেই একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনকে দেখায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার প্রয়োজনে সুভাষ তাদের ভাব ও ভাষার অংশীদার হয়েছেন। যে সময় ও সমাজে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তার প্রতিটি অভিঘাতই তাকে স্পর্শ করেছে। সুন্দর আগামীর জন্য শুধু অপেক্ষা নয়, সবাইকে নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার প্রয়োজনে পরিশ্রমী হওয়ার মধ্যেই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজেছেন। সামষ্টিক চেতনার এই প্রবণতাই তাঁর অন্যতম চারিত্র্যলক্ষণ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের প্রতিটি পর্বই তাঁকে নতুন মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তাঁর জীবন-প্রত্যয়ের প্রত্যেক প্রান্তেই আমরা খুঁজে পাই মানুষ সম্পর্কে তাঁর উজ্জ্বল অনাবিল ধারণার স্বাক্ষর। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সবকিছুর কেন্দ্রে তিনি মানুষকে স্থাপন করে জীবনের সদর্থকতায়

Dhaka University Institutional Repository

সমর্পিত হয়েছেন। বাংলা কবিতায় সুভাষের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে আছে মূলত তাঁর এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পসম্মত উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই। কবিতার প্রকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গত আমরা তাঁর কবিতার বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছি, যা তাঁর জীবনবোধের স্বরূপ উপলব্ধি করতে আমাদের সহায়তা করেছে। এখানে আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত মন্তব্যের আলোকে তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করব –

ক. সমাজটা এমন হবে যাতে মানুষের ভাল হয়। কিন্তু এটাও খুব রিলেটিভ। যে শ্রমিক কিছু কাজ না করে মজুরী নিচ্ছে, বোনাস পাচ্ছে, নানা রকমের সুবিধা পাচ্ছে – আমি তাকে সমর্থন করি না। কেন না, শুধু তার ভালো হওয়াটাই সব নয়। তাতে সমাজের ভালো হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এতে সমাজ আরো তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের ভালো হওয়াটা পরিষ্কার করে দেখা দরকার।[১৩]

খ. মানবতা আর দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি মোটেই দূরঅস্ত নয়। কাঙালী দরজায় এলে ভিক্ষা দিয়ে তাকে বিদায় করলাম। কেউ সেই মন কাঁদাকে রাজনীতি বলবে না। কিন্তু অতই যদি দরদ থাকে শুধু তাকে চোখের সামনে থেকে তখনকার মত বিদায় করে ক্ষান্ত হব না। দারিদ্র্যকে বিদায় করার পথ দেখতে হবে। তখনি চলে আসবে রাজনীতির কথা। দরদটাকে মুখের বদলে বুকের মধ্যে এবং তাৎক্ষণিকের বদলে বরাবরের কাজটাই হবে রাজনীতি। এ রাজনীতির সত্তা আমার কবিতার সত্তা থেকে পৃথক নয়। রাজনীতি ছোট জিনিস নয় তাকে যতই ছোট করে দেখি, তখনই আমরা ছোট হয়ে যাই।[১৪]

গ. সবকিছু ছকে ফেলে ভাবা এক ধরনের যান্ত্রিকতা। আসলে বাঁধাধরা নড়িয়ে চড়িয়ে দেয় মানুষের মন। মন বেঁকে বসলে অনেক বজ্রআটুনি হয়ে পড়ে ফসকা গেরো। যান্ত্রিকতার একটা বড় দোষ, মানুষকে নিতান্ত অবস্থার দাস মনে করে। কিন্তু কালের এই হিসেবটাকে বদলে দেয় কলজে। যারা তা না মানে তারা হাত পা ছুঁড়ে যতই প্রগতির কথা বলুক– আদতে তাল ঠুকে যেখানকার সেখানেই থাকাতেই বিশ্বাসী। এরই মধ্যে থাকে অনেক ভয়, অনেক সন্দেহের বীজ। কাউকে বিশ্বাস নেই চারিদিকে গণ্ডী দাও। আত্মরক্ষা করো। আগেভাগে আক্রমণ করে আক্রমণ ঠেকাও। দখল বাড়াও। এও এক ধরনের মানসিক রোগ। যা নয় তাই ভাবা। বাস্তব সম্পর্কে মনগড়া ধারণা করা। গোড়ায় মনকে একেবারে না মেনে এর শুরু, পরে সেই মনের কাছেই চোখ বেঁধে হাতজোড় করে নিজেকে সঁপে দেওয়া। যান্ত্রিকতার সঙ্গে তাই দৈববিশ্বাসের মিল আছে। দুটিই অকাট্য। শুধু তফাৎ এই– একটি পথ ডাইনে, অন্যটি বাঁয়ে। কিন্তু 'নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যায় এক জায়গায়'।[১৫]

ঘ. To me political slogans were not just slogans. I was vitally interested in them. Red Flag and processions were not part of the slogans. They were part of my life. I also wrote slogans but what were slogans to others were not just words to me. I was ready to give my life for those words.[১৬]

মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান প্রাণশক্তি। ভালেবাসার টানেই তিনি ছুটে গেছেন ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, বস্তিতে-কুড়েঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে। সমাজ সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা থেকে তাঁর জীবনবোধের একটা প্রান্ত স্পর্শ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। সমাজবিজ্ঞানী না হলেও সুভাষের সমাজচিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মূলত সামষ্টিক কল্যাণের প্রতিই তাঁর সমর্থন ক্রিয়াশীল থেকেছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সামাজিক উন্নতির

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। শ্রমিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া যেমন তিনি সমর্থন করেন নি, তেমনি কোন শ্রমিকের অর্জনে সমাজ উপকৃত না হলে তাকে বিশেষ কোন মূল্য দেন নি তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সামাজিক সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দারিদ্র্যকে নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন রাজনীতিকে জীবনমুখি করা। রাজনীতিতে জীবনের প্রতিফলন থাকলে কবিতা ও রাজনীতির মধ্যে কোন দূরত্ব থাকার কথা নয়। সুভাষ তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন, একই সত্তা থেকে উৎসারণ ঘটেছে এদের। এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে। মানুষের মন সর্বদাই সজীব, সচল এবং ক্রমশ পরিবর্তনশীল। মনের উপর আচরণে যান্ত্রিকতা দেখা দিলে তার ফল খুব ভালো হয় না। যান্ত্রিকতার মধ্যে যে দাসত্ব লুকিয়ে থাকে, তা-ই তাকে অন্ধবিশ্বাসের মতো বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাই যান্ত্রিকতাকে তুলনা করেছেন দৈববিশ্বাসের সঙ্গে। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতার শ্লোগানধর্মিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর কবিতায় যে সংঘশক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তা তাঁর জীবনেরই অংশ। এখানে কবি তাঁর জীবনবোধের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য মূলত তাঁর কবিতার শরণ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জীবনকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, বহুবিধ জটিলতার মুখোমুখী হয়েছেন, অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনার অপমৃত্যু দেখেছেন, কিন্তু কখনোই তাঁর মনে হয় নি – এই বেঁচে থাকা, এই স্বপ্নের সঙ্গে সহবাস, এই স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় টানা অর্থহীন। তিনি সমৃদ্ধ আগামীর জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আর সেই যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। বিক্ষুব্ধ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন মানবিকতার উজ্জীবন-মন্ত্র ।

সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিক্ষুব্ধ সময়ের সাহসী কণ্ঠস্বর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে 'উপহার' দিয়েছে বিশ্বাসহীনতা ও নৈরাশ্যে নিমজ্জিত নিরাবেগ মানুষ; আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জীবনের ক্ষীণ স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে শেকড়সহ উপড়ে ফেলে ভয়ঙ্কর বাস্তবতায় নিক্ষেপ করেছে মানুষকে। সুভাষের অগ্রজ কবিরা যুগ-যন্ত্রণার যূপকাষ্ঠে সমর্পিত হয়ে জীবনের নঞর্থক প্রান্তকেই অভিনন্দিত করেছেন, নৈঃসঙ্গ্য ও সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবোধের বিকাশে ব্যয় করেছেন তাঁদের মেধা-মনন-পাণ্ডিত্যের প্রবল-উজ্জ্বল-উর্বর ভূমি।[১৭] এই বিচ্যুতি ও বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যয়ে স্থির ছিলেন শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবনবোধের মূল স্রোত সার্থকতায়, স্বচ্ছলতায়, সম্পন্নতায় ঋদ্ধ হতে চেয়েছে। এই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর কবিচৈতন্যের মর্মমূলে সঞ্চার করেছে অভিনব আত্মবিশ্বাস। তাঁর ব্যক্তিগত ভুবন যে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, সেই বিশ্বাসকেই তিনি ভরে তুলেছেন এক গৌরবময় উত্তরণের শিল্পসম্পদে।

আমরা লক্ষ করেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দর্শন সংঘচেতনার উদ্বোধনে আস্থাশীল। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই শোষিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আত্মশক্তির উজ্জীবন অপরিহার্য। এই জাগরণের জন্য যে ভাষা নির্মাণ করেছেন তিনি, তা তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথন থেকে খুব দূরবর্তী নয়। ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জনসংলগ্ন হয়ে জেগে ওঠার কথা বলতে পেরেছেন। তাঁর 'সব কবিতারই উৎস তার

Dhaka University Institutional Repository

সমকাল আর জনজীবন'[১৮]। তাই যুগচিহ্ন ও জনচেতনার মিথস্ক্রিয়ায় সুভাষের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পভাবনা লাভ করেছে প্রাতিস্বিক মাত্রা। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পভাবনার প্রধান প্রবণতাগুলো প্রকাশ পেয়েছে –

ক. 'করা'র ব্যাপার থেকেই পরে এসেছে 'কলা'র ব্যাপার। কাজ থেকেই শিল্প। করা আর কলা, কাজ আর শিল্প যে আগে এদেশে এক চোখেই দেখা হত– 'ঐতরেওব্রাহ্মণে'র চৌষট্টি কলার নাম থেকেই তা বোঝা যায়। ...কাজ, তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার, খেলা, শিল্প সবকিছুই। চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হল কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম (১৯৮৪ : ৪৬-৪৭)।

খ. শাপভ্রষ্ট দেবশিশু? আর সেইজন্যেই বুদ্ধদেব বসু সব-কিছু ছাড়িয়ে কবি। ... বোধ হয় সব কবির মধ্যেই থাকে দেবশিশু। যার বয়স কখনো বাড়ে না। জীবনে যার ক্লান্তি নেই। শব্দ নিয়ে যার খেলা। শব্দের চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধ হয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা। ... আসলে মানুষ শুধু লেখা বদলায় না, লেখাও মানুষকে বদলায়। বাইরের তাড়না যত না, তার চেয়ে অন্তঃপ্রেরণাই হয় সে পরিবর্তনের আসল চাবিকাঠি (১৯৯৩ : ৮৫)।[১৯]

গ. আমি নিজের জীবনে দেখেছি যে লিখে সত্যি কাজ হয়, কিন্তু শুধু লেখা নয়, জীবনের সঙ্গে যদি বারবার নিজের সম্পর্ককে হাতেকলমে ঝালিয়ে নেয়া না যায়, তাহলে শব্দগুলো নিছক আওয়াজ হয়ে ওঠে লেখককে খানিকটা দমিয়ে দেয়। তখন তার স্রেফ পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে লেখার জগৎ থেকে। আমার মনে হয় যে, বারবার এই লেখার জগৎ এবং কাজের জগৎ, তার মধ্যে আসা যাওয়ার ভেতর দিয়ে আমরা দুটিকেই সজীব রাখতে পারি (১৯৯৩ : ১৬১-১৬২)।[২০]

প্রথম উদ্ধৃতিতে আছে শিল্পকলা সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবণতার স্বাক্ষর। তিনি শিল্পকে দেখেছেন কাজের মধ্যে, যার দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল নয়। সাহিত্যের কলাবিভক্তি থেকে দেখা যায়, তার নামকরণে নানাবিধ কাজ ও আচরণের চিহ্ন বিদ্যমান। অর্থাৎ, আমাদের দিনযাপনের প্রাত্যহিক স্পন্দন থেকেই ছন্দের উদ্ভব বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে নিজের মধ্যে দৈব প্রভাবের কথা মেনে নিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর শিল্পভাবনার সঙ্গে একটা সঙ্গতি অন্বেষণের চেষ্টা এখানে লক্ষ করা যায়। যে শক্তির প্রেরণায় শিল্পীর কলম সচল থাকে, তার বয়স কখনোই যেন বাড়ে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শব্দ এক জীবন্ত সত্তা। অভিজ্ঞতাকে শব্দের সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার কাজটি খুব সহজ নয়। একই মানুষ যেমন তার বক্তব্যের সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন স্বীকার করে নেয়, তেমনি মানুষকে বদলে দেওয়ার বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখে কোন সার্থক রচনা। প্রাণের ভেতরে কাজ করে যে প্রেরণা, তা-ই তাকে ক্রমাগত নতুনের পথে পরিচালিত করে। তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে লেখার ক্ষমতা সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত। তাঁর মতে, সেই লেখাই প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যে লেখায় জীবনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। জীবনবিচ্ছিন্ন রচনা অর্থহীন বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয় তাঁর কাছে। জীবনকে নানা ভাবে পাঠ করে তার ভেতরের অনুভব ও উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মধ্যেই শিল্পীর সার্থকতা নির্ভর করে। একজন শিল্পী কখনো এই কাজে অনায়াস সফলতা লাভ করেন, আবার কখনো তাঁর মনে হয়, তিনি যেন সত্যিকার জীবনস্পন্দনকে চিত্রায়িত করতে পারছেন না। তখন তিনি কাজের জগতে ডুব দিয়ে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তুলে আনেন। কাজের জগৎ ও লেখার জগতে আসা-

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সদর্থক প্রান্তে পৌঁছে যান একজন সৃষ্টিশীল মানুষ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই শিল্পদৃষ্টির পরিচয় তাঁর কবিতার মধ্যেও অপ্রকাশিত নয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার রক্তের ভেতরে তাঁর কাব্যচিন্তার নির্যাস ঢেলে দিয়েছেন, নির্মাণ করেছেন এমন এক শিল্পভুবন, যেখানে তাঁর কণ্ঠস্বর সবকিছুকে ছাপিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। জীবন এবং শিল্পের সার্থক সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, তাঁর কবিতা ও তাঁর জীবন একই জিনিসেরই ভিন্নতর উৎসারণ।[২১] কবিতার ভাব, ভাষা ও প্রকরণে তাঁর কাব্যদৃষ্টির স্বাক্ষর অনুসন্ধান করার আগে প্রগতি কবিতার প্রধান প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা জরুরি।

আমরা জেনেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর সাহিত্য-আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকে শিল্প-সাহিত্যের উপযোগবাদে আস্থা স্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি-ভাবনার পরিচয় প্রবল। শিল্প-সার্থকতার প্রশ্নে তিনি অনবরত অভিনবত্বের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। প্রগতি-চিন্তা ব্যক্তি-ভাবনায় যে বিপ্লব এনেছে, সমাজে যে পরিবর্তন আভাসিত হয়েছে, তার প্রতিফলন সাহিত্যে অনিবার্য – এই প্রত্যয় সুভাষের কবিতায় প্রাণ-সঞ্চার করেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে স্বীকরণের মাধ্যমে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করার প্রয়াস তাঁর শিল্পচিন্তার প্রধান প্রভাবক।[২২] সম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধির আলোকে পরিচালিত হয়ে সমাজ-ব্যবস্থা ও নানাবিধ আচার-আচরণের যুক্তিনিষ্ঠ নিরীক্ষণই তাঁর অন্বিষ্ট। কর্ম ও চিন্তায় শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে পারলেই সমাজে পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটতে পারে– এই আশাবাদই তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিপুঞ্জের আলোকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির মূল্যায়ন করা যেতে পারে –

ক. আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে ॥ (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি–
এই আমার ছুটি–
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও ॥ (আমার কাজ/*কাল মধুমাস*, ২/১৪১)

গ. ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুলকি–
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না। (পাথরের ফুল/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৫)

ঘ. আজ
যে কবিতা
রচনা করার ইচ্ছা
তাতে
ছত্রে ছত্রে
থাকে যেন
একালের সুর (রোমান্স/*দিন আসবে*, ২/৬১)

ঙ. আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি,
খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি,
কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।

আমরা নই প্রলয়-ঝড়ে অন্ধ ॥ (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৫০)

প্রথম উদ্ধৃতিতে সম্মিলিত উন্নতির প্রতি কবির পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত না হয়ে প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিকের সঙ্গে সখ্য করে মাটির পৃথিবীতে নিজের শেকড় অনুসন্ধানের প্রয়াস এখানে স্পষ্ট। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির মূল সুর জনসংলগ্নতা। রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত ভাবসম্পদে আচ্ছন্ন হয়ে জটিল ও কৃত্রিম রচনাভঙ্গির প্রশ্রয়ে কাব্য রচনা করে কবি-খ্যাতি অর্জনের লোভ নেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। আমৃত্যু তিনি মানুষের হাতে হাত রেখে প্রগতির পথে পরিচালিত হতে চান। তিনি কলম ও ট্র্যাকটরের ঘনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে তাঁর কাব্যকৃতির সার্থকতা নিরূপণ করতে চান তিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সঙ্গে বসে তাঁর দীর্ঘ চলার ক্লান্তি দূর করতে চান। ফুলের চেয়ে আগুনের ফুলকির দিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে তৃতীয় উদ্ধৃতিতে। কারণ তিনি মিথ্যা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর কবিতাকে দাঁড় করাতে চান। মুখোশ উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন অগ্নি-প্রজ্জ্বলন। সেই অগ্নি-মশাল হাতে নিয়েই তিনি বিপ্লবের পথে আহ্বান করেন সবাইকে। চতুর্থ উদ্ধৃতিটি সুভাষের কবিতার স্বকালমগ্নতার স্বাক্ষর বহন করে। সমকালের আঘাত-আন্দোলনকে ধারণ করেই তিনি কবিতায় প্রাণ-সঞ্চার করেছেন। পঞ্চম উদ্ধৃতিটিতে কবি আরো স্পষ্টভাবে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও কাব্যচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যারা অচল-অক্ষম-অসুস্থ, তাদের জীবনে গতি প্রদানের লক্ষে কবি কলম ধরেছেন। সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই তিনি তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতে চান। অন্ধের মতো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো নয়– উজ্জ্বল আলোকিত আগামীর প্রশ্নে আপসহীন সংগ্রামের পথেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যযাত্রা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন, শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তি, সমাজ ও সমকাল নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ জীবনের সার্থকতাকেই অস্বীকার করে, যা যে-কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প' এবং 'জীবনের জন্য শিল্প' –এই দ্বিবিধ বিতর্কের দ্বিতীয়টিকে সমর্থন করেছেন এবং তাঁর শিল্পসমগ্রের মর্মমূলে এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি খুবই স্পষ্ট। তাঁর জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা তাঁকে সংগ্রামের পথে ডাক দিয়েছে, আর তিনি তাঁর আত্মার স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়েছেন কাব্য-শরীরে। শব্দের শক্তিকে আপন উপলব্ধির আলোকে অন্বেষণ করে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর সৃজনভুবন। এই কাব্যবোধের কারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় ভিন্ন স্বরের স্রষ্টা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনবোধ ও সাহিত্যদৃষ্টি পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ শিল্পভুবন। জীবনকে নিবিড়ভাবে অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন তিনি, আর সেই জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে তাঁর কবিতার পুষ্টি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও জীবনাচরণের সঙ্গে তাঁর সৃজনকর্মের কোনো ব্যবধান নেই। বাংলা প্রগতি-কবিতার ধারায় সুভাষের স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করলে দেখা যাবে, তিনি বিপ্লবী জীবনেরই নিপুণ ভাষ্যকার। বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নির্মাণ করেছেন সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতিকৃতি, যা মানুষকে সম্ভাবনার পথে, সমৃদ্ধির পথে আহ্বান করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭ : ৭৩) বলেছেন, 'ব্যক্তিসত্তার আন্তর-বৈশিষ্ট্য ও কালধর্মের প্রভাবজাত চেতনাগুচ্ছের সমাহারেই গড়ে ওঠে বিশেষ কোন শিল্পীর সৃজনভুবন'।

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী-সংক্রান্ত তথ্য, অন্য কোন উল্লেখ না থাকলে, সন্দীপ দত্ত (২০০২) সম্পাদিত *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

৩. সন্দীপ দত্ত (২০০২ : ২০৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠীদের এই তালিকা প্রদান করেছেন।

৪. মাহবুবুল হক (২০০৫ : ১৭১) বলেছেন, "১৯৩৮ সালের দিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম সক্রিয়ভাবে জড়িত হন 'লেবার পার্টি'র সঙ্গে"। কিন্তু সন্দীপ দত্ত (২০০২ : ২০৩) বলেছেন, সুভাষ লেবার পার্টিতে যোগদান করেন ১৩৩৯ সালে।

৫. জলি মোহন কলকে ১৯৪৮ সালে আরো অনেক কমিউনিস্ট কর্মীর মতো কারাবরণ করেন। কাশ্মীরের ছেলে জলি মোহন কলকের 'Subhas Mukherji --The Rebel Poet' শীর্ষক লেখাটি শঙ্খ ঘোষ, সৌরেণ ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত (১৯৯৮ : ২৯৬) সংকলনে মুদ্রিত হয়।

৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দলের মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে আলেকজান্দার সলঝেনেৎসিনের কবিতার অনুবাদ করে তিনি পার্টিতে খুব সমালোচিত হন। কারণ এই কবির রাজনৈতিক অবস্থান কমিউনিস্ট পার্টির নীতিমালার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়েছে। আলেকজান্দার সলঝেনেৎসিনের চারটি কবিতা ('ইয়েসেনিনের গ্রামদেশ', 'এক কবির শব', 'নেভা নদীর ধারে শহর' ও 'সেগদেন সায়র') তাঁর *একটু পা চালিয়ে, ভাই* (মে ১৯৭৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৭. এ প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে গেলেও তাঁর জীবনবোধের ভিত রচনার পেছনে তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, একথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন –

> কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি যেটুকু দিয়েছি, আমি পেয়েছি তার বহুগুণ বেশি। পার্টির কর্মসূচি, প্রস্তাব,

Dhaka University Institutional Repository

রণকৌশল, রণনীতি– আমার পাওয়ার উৎস এসবেরও বাইরে।...কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে [সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৭, 'আমি ছেড়ে যাইনি', *খোলা হাতে খোলা মনে*, পৃ. ১৫, উদ্ধৃত : মাহবুবুল হক (২০০৫ : ১৮০)]

৮. 'রবিবাবুকে' কবিতাটির কোনো অনুলিপি পাওয়া যায় নি। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা অজয় দাশগুপ্ত স্মৃতি থেকে কবিতাটি উদ্ধার করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ডের (২০০৩ : ১৭০–১৭১) সম্পাদক সুবীর রায়চৌধুরী 'পরিশিষ্ট'-এ কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য 'শ্রী সত্যপ্রসন্ন দত্ত দাবি করেছেন যে পূর্ব্বাশা'তেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিরূপে আত্মপ্রকাশ' (২০০৩ : ১৭৯)।

৯. *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলনটির প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪০ সালে কবিতাভবন থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ও কালসীমা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

১০. জলি মোহন কলকের 'Subhas Mukherji -- The Rebel Poet', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদিত, যৌথ), পৃ. ২৯৬।

১১. এই গ্রন্থ তালিকার ক্রম সন্দীপ দত্ত (২০০২ : ২০৭) সম্পাদিত গ্রন্থ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *কবিতাসংগ্রহ* (প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা) ও মাহবুবুল হক (২০০৫ : ১৭৬–১৭৭)-এর গ্রন্থ অনুসৃত হয়েছে।

১৩. সন্দীপ দত্ত (২০০২ : ৪৮) সম্পাদিত গ্রন্থে অদ্রীশ বিশ্বাস সংগৃহীত 'পদাতিক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার'-এ কমিউনিজম এবং এ বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজ-চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

১৪. কবি মনন ও কাব্যচিন্তা সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *অন্যমনে*, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৮৮, উদ্ধৃত : বিজয় সিংহ, 'রাজনীতি ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা', সন্দীপ দত্ত (সম্পা.), (২০০২ : ৭৮)

১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৮ 'সবিনয় নিবেদন', *ক্ষমা নেই*, উদ্ধৃত : বিজয় সিংহ, 'রাজনীতি ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা', সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত), (২০০২ : ৮৮) ।

১৬. Sumatheendra Nadig, `An Interview with Subhas Mukhopadhyay', শীর্ষক লেখাটি শঙ্খ ঘোষ, সৌরেণ ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত (১৯৯৮ : ৩১৫) সংকলনে মুদ্রিত হয়।

১৭. বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে প্রধান কবিরা বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত, তাঁদের কবিতা নৈরাশ্য, নির্বেদ, নৈঃসঙ্গ্যের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত বলেই তাঁরা জীবনের সদর্থক প্রান্ত থেকে অনেক দূরবর্তী। ত্রিশোত্তর প্রগতি-কবিতা জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করেছে স্বপ্ন ও সম্ভাবনার এই উপেক্ষিত দিকটির গৌরব ও গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে।

১৮. জমিল শরাফী (রণেশ দাশগুপ্ত) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন (১৯৭৫ : ৫)-এর 'কবির কথা' শীষক ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ উক্তি করেন। এ বই বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯. এই উদ্ধৃতিতে বুদ্ধদেব বসুর শিল্পদৃষ্টির একটি বিশেষ প্রবণতার প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর (২০০৩ : ২৩) *বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা* গ্রন্থের 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় কবি বলেছেন, 'বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়/অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত–/শাপভ্রষ্ট দেবশিশু'।

২০. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৩ : ১৬১–১৬২) 'ফুল ফুটুক না ফুটুক : লোথার লুৎসের সঙ্গে কথাবার্তা' শীর্ষক

Dhaka University Institutional Repository

রচনায় জীবন এবং জীবনকে ধরে রাখবার মূল উপাদান 'শব্দ' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে ক্রমাগত যে বোঝাপড়া হয়, সেই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সুভাষের সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁর এই আলোচনা সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

২১. জীবনানন্দ দাশ (২০০২ : ১৭) কবিতার আলোচনায় জীবন ও কবিতার গভীরতর সম্বন্ধ স্বীকার করে বলেছেন, 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই উক্তির সততা ও সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

২২. ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘের ইশতেহারে বলা হয়েছে, '...আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করেছে, তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের কর্তব্য' [দিলীপ মজুমদার (সম্পাদক), *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৭, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ২৫০-২৫১, উদ্ধৃত : বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯৯ : ২৩৪]।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. জীবনানন্দ দাশ, ২০০২, *কবিতার কথা*, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

২. ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), ২০০৩, *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৭, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৯, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা।

৫. বুদ্ধদেব বসু, ২০০৩, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা : বিশ্বজিৎ ঘোষ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

৬. মাহবুবুল হক, ২০০৫, *তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৭. শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদিত, যৌথভাবে), ১৯৯৮, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৮. সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত), ২০০২, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৬, *নারদের ডায়রি*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।

১০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন*, সম্পাদক : জমিল শরাফী (রণেশ দাশগুপ্ত), লালন প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৪, *অক্ষরে অক্ষরে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৭, *আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

১৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৩, *কবিতার বোঝাপড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৪, *ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৬, *চিঠির দর্পণে*, আনন্দ পাবলিশার্স পাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প-প্রকরণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

শব্দ

কবিতা শব্দের ভেতর দিয়ে কবির আবেগ-অনুভূতি-স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে পাঠকের অনুভব-উপলব্ধি-চিন্তা-কল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়। একজন কবি শব্দের প্রচলিত ব্যবহারজনিত জরা-জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে তার গায়ে নতুন ও অভিনব অর্থময়তা দান করেন। শব্দ তখন গড়িয়ে চলতে চলতে পথচারীকে জড়িয়ে ধরে, পথিক নিষ্পাপ শিশুর মতো তাকে বুকে তুলে নেয়। শব্দকে গতিশীল করতে একজন কবির অনলস প্রয়াস প্রসববেদনার মতোই মহৎ যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তোলে। বেদনাবিহ্বল কবির এই আত্মনিবেদন, এই স্বপ্রতিষ্ঠ প্রয়াসের নামই হয়তো কবিত্ব।

কবিতার ভাষা কোন দৈব ব্যাপার নয়। তা মানুষের ভাবনারই বর্ণিল উপস্থাপন যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ অবলম্বনেই আত্মপ্রকাশ করে। 'শব্দ তার নির্জনতা বা নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে অর্থ-শক্তি লাভ করে... ধ্বনির সাহায্যে বাক্যে ছড়িয়ে পড়ে' (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৯ : ২২)। ফলে কবিতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণেও কোন কোন সমালোচক শব্দের ওপরই বেশি জোড় দিয়ে বলেছেন, কবিতা হলো অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণীবিন্যাস।[১] শব্দ ব্যবহারে আধুনিক কবিতায় যে স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্তি চোখে পড়ে, তার ফলেই গদ্য এবং পদ্যের মধ্যবর্তী ব্যবধান অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে এলিয়ট-এর মন্তব্য স্মরণ করা যায় –

> ...and I think that an interaction between prose and verse, like the interaction between language and language, is a condition of vitality in literature (T. S. Eliot Mcmlxvii : 152).

কবিতা যেমন সংস্কারমুক্ত এবং সর্বতোমুখী হয়, তেমনি প্রচল ও সাধারণ শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তির অপ্রকাশিত অভিপ্রায়কে উন্মোচিত করার জন্যে কবিকেও শ্রমিকের মতোই পরিশ্রম করে শব্দব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। 'শব্দের কিছু অর্থ ধারণালব্ধ, আবার কিছু অর্থ অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ' (সৈয়দ আলী আহসান ১৩৭৫ : ৩)। কবির আগ্রহ যেহেতু শব্দের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে ইঙ্গিতময় রসনিষ্পত্তির দিকে, তাই তাকে শব্দ ব্যবহারে রূপদক্ষ হতেই হয় (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ২৯৮)। আধুনিক কবি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় যে কোনো শব্দকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ভাবানুষঙ্গের অনুকূলে শব্দকে প্রয়োগ করার এই প্রবণতাই কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দপ্রয়োগে রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে যে কোন শব্দকেই তিনি পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন। 'যা বলবার আমরা জোর গলায় বলি,/শব্দ আমাদের ব্রহ্ম' (উত্তরপক্ষ/*এই ভাই*, ২/১৭১)– সুভাষের এই উচ্চারণ থেকে শব্দের শক্তি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্পষ্ট করে জোড় গলায় কথা বলার অঙ্গীকার থেকেই কবিকল্পনার সর্বোচ্চ প্রকাশের দিকে যত্নবান ছিলেন। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, আঞ্চলিক, লোকজ এবং বিদেশি শব্দ তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের ব্যবহার সুভাষের কবিতায় সংহতি এবং দৃঢ়তা এনেছে। তাঁর কবিতার তৎসম শব্দের অর্থ উদ্ধার করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য অভিধান অপরিহার্য নয়। সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দগুলোই তিনি কবিতার অন্যান্য শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি তৎসম বা সংস্কৃত শব্দবহুল কাব্যপঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে –

ক. টিকটিকি ডাকে, – বধির সে নির্বন্ধ। (রোমান্টিক/*পদাতিক*, ১/২৪)

খ. পেয়াদারা বশম্বদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির
তাদের কণ্ঠস্থ আজো (অতঃপর/*পদাতিক*, ১/৩৭)

গ. হাতে দুঃখহরা কোন বিশল্যকরণী ? (বর্ষশেষ/ *চিরকুট*, ১/৭০)

ঘ. বউদির মতো ভূষণ্ডি কালো নয়। (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

ঙ. হেঁট মুণ্ডে/ঝুলছে পঞ্চবিংশতি বেতাল। (হাত বাড়ালে/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৬)

চ. ইক্ষ্বাকু বংশের সেই ভগ্নস্নায়ু দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২১২)

উদ্ধৃতিসমূহের নিম্নরেখ শব্দগুলি তৎসম হলেও একমাত্র 'ইক্ষ্বাকু' (বৈবস্বত মনুর পুত্র, সূর্যবংশীয় রাজা) ছাড়া বাকি শব্দগুলি অর্থ উপলব্ধিতে তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। এছাড়া কমণ্ডলু (মাটি বা ধাতু নির্মিত সন্ন্যাসীদের জলপাত্র), বানপ্রস্থ (হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় আশ্রম), অক্ষৌহিণী (২১৮৭০০ চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী), শঙ্ক পট্ট (সূর্যঘড়ি), কঠোপনিষদ (কঠপ্রোক্ত উপনিষদগ্রন্থ সংকঠ + উপনিষদ) ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারে কবিতার ভাষায় অভিনব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর ব্যঙ্গকবিতায় অর্ধতৎসম শব্দ চমৎকারভাবে অনুরণিত হয়েছে। এই ধরনের শব্দে কবির ব্যঙ্গবাণ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার যেমন কাব্যভাষায় লাবণ্য সৃষ্টি করে, তেমনি কবিতার বাকভঙ্গিকেও তা করে তোলে সপ্রাণ, স্বতঃস্ফূর্ত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. শত্রু পরখ করুক ধার (গ্রাম্য/*চিরকুট*, ১/৫১)

খ. এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬২)

গ. হাসপাতালের রুগীর পোশাকে রোদ্দুর (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫২)

ঘ. ধম্মপুত্তুর দারোগা/বাগে পেলে মারে ঘা ॥ (রক্ষাকবচ/*জল সইতে*, ৩/৩৪৫)

ঘ. ফোকলা পুরুতের মতো/...তর্পণের মন্ত্র (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৬)

উদ্ধৃতিসমূহে পরখ (পরীক্ষা), কুচ্ছিত (কুৎসিত), রোদ্দুর (রৌদ্র), পুত্তুর (পুত্র) এবং পুরুত (পুরোহিত) ইত্যাদি অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া গিন্নি (গৃহিণী), কত্তাল (করতাল), ভদ্দরলোক (ভদ্রলোক), রাত্তির (রাত্রি), সরেবানাশ (সর্বনাশ), পেত্যয় (প্রত্যয়) প্রভৃতি অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার সুভাষের কবিতায় চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে।

তদ্ভব শব্দের ব্যবহার যে কোনো আধুনিক কবিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রচুর তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন। তদ্ভব শব্দের উৎপত্তির পেছনে প্রাকৃতজনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সুভাষ সাধারণের মুখের ভাষাকেই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে বিশেষ ভাষাভঙ্গি গড়ে তুলেছেন। ফলে তদ্ভব শব্দ তাঁর কাব্যপঙ্‌ক্তিতে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছে। সমালোচক সৈকত আসগর সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত কতিপয় তদ্ভব শব্দের উৎস নির্দেশ করে কবির শব্দকৌশলের পারঙ্গমতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন –

তদ্ভব শব্দের ব্যবহার অন্যান্য আধুনিক কবির মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও অনেক বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ক'টি শব্দ নির্দেশ করছি। যেমন, কাঁকড়া (কর্কটক >কক্কডঅ >কাঁকড়া), হাঁটু (অষ্টুক >অট্ঠুঅ >আঁঠু >হাঁটু), পুথি (পুস্তিকা >পুথিঅ >পুথি), বত্রিশ (দ্বাত্রিংশৎ >বাত্রিস >বত্রিশ), কাম (কর্ম >কর্ম্ম >কাম), সাঁড়াশি (দংশিকা >সণ্ডংসিঅ >সাঁড়াশি), পিড়ি (পীঠিকা >পিঠিঅ >পিড়িঅ >পিঁড়ি >পিঁড়ি), খুদ (ক্ষুদ্র >খুদ্দ >খুদ) প্রভৃতি তদ্ভব শব্দ ব্যবহারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১২৫)।

বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। সেই ভাণ্ডার থেকে সুভাষ অবলীলায় গ্রহণ করেছেন প্রয়োজনীয় শব্দাবলি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন দেড়, দুই, তিন, চার, এগার, বার, তের, পনের, ষোল, আঠার, বাইশ, বাহান্ন প্রভৃতি শব্দ সুভাষ ব্যবহার করেছেন। সুভাষ ব্যবহৃত আরো কিছু তদ্ভব শব্দের উদাহরণ –

আখড়া, আজ, আদিখ্যেতা, আঁঠি, আড়াই, আমড়া, আমি, ইঁদারা, এলা, ওঝা, কাছারি, কামার, কাহন, কুমোর, খই, খাজা, গাঁ, গাঙ, গাজন, গাঁট, গাধা, ঘি, চাকা, চাঁদ, জেঠা, ঝাঁঝ, ঝি, টাকা, ঠাকুর, ঠোঁট, ডাঁশ, ঢাক, দাম, দীঘি, দেউল, দেরখা, দোজ, নট, নধর, নাতি, পাথর, পান, পালা, পো, ফাগ, বাঘ, বাঁদর, বিজলি, বেহুলা, ভাই, ভাজ, ভাত, ভাপ, ভাল, মঞ্চ, মড়া, মা, মাছ, মাটি, মাসি, রাখাল, রান্না, লাউ, শাশুড়ি, সাঁকো, সিঁথি, সোহাগ, হাত, হালকা, হেঁট ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রধান উৎস দেশি বা আঞ্চলিক শব্দ যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনে ব্যবহার করা হয়। কথ্যভঙ্গিকে কবিতায় ব্যবহার করার প্রয়োজনেই সুভাষকে দেশি বা আঞ্চলিক শব্দের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে। এই ঝোঁক তাঁর কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করেছে। সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত দেশি বা আঞ্চলিক শব্দকে ধারণ করেছে এমন কয়েকটি শিল্পসফল কাব্যপঙ্‌ক্তির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে –

ক. ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সদলে। (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৮)

খ. ইতিহাস স্পষ্টবক্তা, ভারী ট্যাক কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের ভাঁড়ারি; (দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

গ. বোম্বেটেদের টুঁটি যেন পায় জিঘাংসু হাত (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৭)

ঘ. এবার করতেই হবে এস্পার ওস্পার । (চলচ্চিত্র/*চিরকুট*, ১/৫৫)

ঙ. যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে। (শত্রু/*চিরকুট*, ১/৫৫)

চ. কারখানায় পড়েছে কুলুপ (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮)

ছ. বাতাসে বারুদ ঠেসেঠুসে দিয়ে/কামানের মুখে মৃত্যুর ঝড় তোলে। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ৮৬)

জ. আমরা শহরের/হাড়কালি মানুষ। (যেতে যেতেই/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪০)

ঝ. যা রে/সাপের বিষ/দিয়েন বিয়েন/ফুঃ ॥ (দিয়েন বিয়েন ফুঃ/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৮)

ঞ. আমার চেয়ে ঢ্যাঙা/এক চোয়ারে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

ট. বুড়োধাড়িদের একেবারেই/ভালো লাগল না। (যেতে যেতে/*যত দূরেই যাই*, ২/৬৮)

ঠ. ছেলেটা আমার/পুঁটুলি পাকিয়ে বসে। (পাথরের ফুল/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৪)

ড. মিনসের আক্কেলও বলিহারি! (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৮)

ঢ. এপারে গিলে ওপারে ওগড়াবে। (পারঘাটের ছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১২৬)

ণ. ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গেছে/মাঝরাতের মালগাড়ি। (হালুম/*কাল মধুমাস*, ২/১২৬)

ত. তেঁতুলতলায় শব্দ কিসের/বিশ্রী বিদিকিচ্ছিরি (হেঁ-হেঁ আলির ছড়া/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

থ. হাতে গণতান্ত্রিকের কবচ-তাবিচ। (রোমাঞ্চ সিরিজ/*এই ভাই*, ২/২০৮)

দ. কোণাঘুপচিতে গা-ঢাকা দেওয়া অন্ধকার (আলোয় অনালোয়/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫৫)

উদ্ধৃতিগুলোতে ব্যবহৃত নিম্নরেখ শব্দগুলি পঙক্তিসমূহে দেশীয়, আঞ্চলিক বা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনের আবহ সৃষ্টি করে কবিতায় গতি সঞ্চার করেছে। এই ধরনের প্রচুর শব্দের সন্নিবেশ ঘটেছে সুভাষের কবিতায়। আরো কিছু দেশি, আঞ্চলিক বা গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক বাক্যালাপে ব্যবহৃত শব্দের উল্লেখ করছি –

> কপচানো, টাটি, ভেরা, চিকন, কুজ, সরাই, বটি, ঠোঙা, ঠ্যাঙানি, হাপর, গোঁয়ার, আল , ডিড়া, খোঁড়ে, ঝি, গোদ, ঘুটেকুড়োনি, দরাম, হরবোলা, ধিঙি, ভাটি, বালতি, ট্যাক্সো, ঠুলি, তানসেনগুলি, ডগা, পটি, মালকোচা, হামান-দিস্তা, চেরাগ, ঠকাস, চ্যাকা, চিৎপটাং, ছেই, তালেবর, খেপ, ফাৎনা, ল্যাং, মটকা, গুজগুজ, পোঁচ, লারেলাপ্পা, দুরমুশ, ভোচকানি, চ্যাংদোলা, চাঙারি, গুখেকো, খুঁতখুঁতানি, আবাগীর বেটা, শিকো, গাঙ, ঠাহর, গতর, মোড়ল, হাঁকুপাকু, ধুনি, সইবহরে, ভুষি, ইত্যাদি।[২]

শব্দ ব্যবহারে সুভাষ বিশেষ কোনো সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না। প্রাসঙ্গিক বিষয়কে প্রাণবন্ত করার প্রয়োজনে যে কোনো শব্দকেই তিনি সানন্দে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন। ফলে কবিতার ভাষা যেমন বেগবান হয়েছে, তেমনি বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকের যোগও লাভ করেছে প্রগাঢ়তা। আরবি–ফারসি-ইংরেজি-হিন্দি প্রভৃতি বিদেশি শব্দের মেলবন্ধন তাঁর কবিভাষার প্রধান প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। *পদাতিক* থেকেই কবি বিদেশি শব্দের স্বাচ্ছন্দ্য-ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কয়েকটি কাব্যপঙক্তিতে আরবি–ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করি –

ক. এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই; (প্রস্তাব/*পদাতিক*, ১/২৫)

খ. তেজারতির মতন কিছু পুঁজি/সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে। (বধূ/*পদাতিক*, ১/২৭

গ. হে দীনবন্ধু নইলে সমূহ কড়ি বেহাত। (শ্রেষ্ঠীবিলাপ/*পদাতিক*, ১/৩৬)

উদ্ধৃতিসমূহে নিম্নরেখ শব্দগুলি কাব্যশরীরে চমৎকার মানিয়ে গেছে। থোড়াই (হিন্দি), তেজারতি (আরবি) এবং বেহাত (ফারসি+তদ্ভব) প্রভৃতি শব্দ কবির বক্তব্যকে দৃঢ়তা দান করেছে। *পদাতিক*-এ ব্যবহৃত আরো কিছু আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দ : আদালত, উষ্ণীষ, কসরত, কিস্তিমাৎ, খাসা, খিল, গেলাশ, চিজ, জরিপ, তামাশা, দুলাল, নিশান, পরোয়া, পেয়াদা, ফিকির, ফতোয়া, মাড়োয়ারি, মোতায়েন, লড়াই, শরিক, সওদাগর, সেপাই, হরতাল ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

চিরকুট থেকে বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিছু পঙক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে –

ক. আকাশে বুঝি এমন রোশনাই! (চলচ্চিত্র/*চিরকুট*, ১/৫৩)

খ. হুজুরে নিবেদন এই–/মাপ করবেন খাজনা এ সন (চিরকুট/*চিরকুট*, ১/৬২)

গ. রুখবে কে আজ ? বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার – (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)

ঘ. ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই ॥ (দীক্ষিতের গান/*চিরকুট*, ১/৭২)

ঙ. পথে পথে আজ হোক মোকাবিলা, দেখি কার কত শক্তি। (উনত্রিশে জুলাই/*চিরকুট*, ১/৭৪)

উদ্ধৃতিগুলোতে নিম্নরেখ বিদেশি শব্দে কবির ভাবনা শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। এভাবে আওয়াজ, আস্তিন, কদম, কবর, কসম, কার্তুজ, কলিজা, খুন, খিড়কি, জরিপ, জাবর, ঝটপট, তরোয়াল, তৈয়ার, দালাল, দলিল, নজর,

Dhaka University Institutional Repository

নহবত, নিশানা, পত্তন, পরোয়ানা, পাইক, বরকন্দাজ, বহর, ময়দান, মহল্লা, লড়াই, শ্রেফ, সওয়ার, সামিল ইত্যাদি বিদেশি শব্দ সুভাষের কাব্যদেহে শক্তি সঞ্চার করেছে। *চিরকুট* কাব্যগ্রন্থে আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দ তুলনামূলকভাবে বেশি। সুভাষের যে কোনো কাব্যগ্রন্থ থেকেই বিদেশি শব্দের দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপন করা সম্ভব। সুভাষের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দ উল্লেখ করছি –

> আখের, আগুয়ান, আজান, আন্দাজ, আফগারি, আবলুস, আস্তানা, আরশি, আলখাল্লা, আস্তিন, আশমান, ইনাম, উকিল, উজবুক, উজির, উর্দি, কসরত, কাড়া-না-কাড়া, কায়দা, কিস্তি, কবিরাজ, কেয়ামজা, কেল্লা, কিংখাব, খোদাতালা, গোমস্তা, ঘাঘরা, চিজ, ছোকরা, জামাই, জাহান্নাম, ঝক্কা, টুপি, তজবিজ, তক্তাপোষ, তল্লাট, তালিম, তোষাখানা, দমন, দরবার, দরিয়া, দজ্জাল, দুলদুল, দেমাক, নায়েব, পাহারা, পহলবী, ফৌজি, বন্দে-মাতরম, বরবাদ, বরাত, বাইজি, বাতচিৎ, বালাই, বেইজ্জত, বেদম, বেটা, বেয়াদব, বোতল, বোরখা, ভেরী, মস্তান, মহরম, মর্সিয়া, মুনসেফ, মুল্লুক, মুসাফির, মুশকিল, মেরজাই, মোক্তার, জেরা, জোয়ান, রোয়াক, সওয়ার, সরেজমিন, সাজোয়ান, সাফাই, সেরেস্তা, সেলাই, হট, হরফ, হাকিম, হাবিস, হুকমত ইত্যাদি।

আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে বাংলার সঙ্গে প্রচুর ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কথা বলার যে ধরন তৈরি হয়েছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই বাকভঙ্গিতে কাব্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পুরো বাক্য বা পঙ্‌ক্তির শরীরে সুভাষের ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলো বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের অবিকল উপস্থাপনে ইংরেজি শব্দ যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের মুখেও অনবরত ইংরেজি শব্দ শুনেছেন কবি। কাব্যদেহে এই শব্দাবলি নাগরিক জীবনপদ্ধতিকেই প্রতিবিম্বিত করেছে। গবেষক সৈকত আসগর সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত ইংরেজি এবং কিছু বিদেশি শব্দের একটি তালিকা করেছেন যা সুভাষের শব্দভাবনার স্বরূপ উপলব্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমাদের মনে হয় –

> এরোপ্লেন, বাল্‌ব, ফ্যান, লেক, টর্চ, গ্লেসিয়ার, ডবল ডেকার, বেঅনেট, কমরেড, বুর্জোয়া, রোম্যান্টিক, রেস্তোরাঁ, বলশেভিক, নেবুলা (*পদাতিক*), বুট স্টিল, হেলমেট, গ্রীনরুম, ব্যাংক, ক্রেংকার, পল্টন, টাইফুন, ট্যাক্স, স্ট্রাইক, ট্রাম, বাস, টেলিফোন (*চিরকুট*), ব্যারাক, ইস্তাহার (*অগ্নিকোণ*), ইস্টিশান, আপিস, পেট্রোল, পাম্প, ডলার (ফুল ফুটুক), রংরুট, রেলিং, শোকেস, রিফ্রিজারেটার, রেডিও, ইলেক্টিক, স্যার, মেড-ইন-লন্ডন, ডন, ট্রাঙ্ক, চারমিনার, ক্রুশ্চভ, পোলিশ (*যত দূরেই যাই*), ক্যালেন্ডার, টব, গ্রুপ (+ ছবি), ফ্রেম, ল্যাম্পপোস্ট, পাম্প, ফ্ল্যাট (+বাড়ি), চেন, সুটকেস, ওয়াগন, টিফিন, কোরাস, মনুমেন্ট, ফরমুলা, সাইজ, পুলিশ, ব্রেভো, লিফ্‌ট, পেরেক, সেন্সার, বাটা (জুতো), হরতনের টেক্কা, হাফ-টিকেট, ডবল, শিফট, প্লট, ডায়নামো, ট্রেন, ব্রিজ, রেনট্রি, রানার, সার্কাস, জেলার, ম্যাজিস্ট্রেট, বিস্কুট, মেস, শিল্ড, প্লেয়ার, লজেঞ্জুস, স্ট্রেচার, এস.ডি.ও, মাস্টার, ব্যাংক ম্যানেজার, সিভিল সার্জেন, সাবরেজিস্ট্রার, মার্জিন, বান্ডিল, পেন্সিল, (*কাল মধুমাস*), প্যান্ট, স্টপে, গেট, টিকেট, লেদ, অ্যালবাম, ব্যারিকেড, টিয়ারগ্যাস, ক্লিনার, ড্রাইভার, হর্ণ, সিট, ট্রানজিস্টার, সেফটিফিন, পিস্তল, রোমান, গিয়ার, পোর্ট কমিশনার, নোট, নিউমার্কেট, সিরিজ, কন্ডাক্টর, ব্রেক, উইন্ডস্ক্রিন, স্টেটবাস (*এই ভাই*), ট্রাম, হেলিকপ্টার, লেট, সিগনাল, ডিউটি, কেবিন, বেসিন, ট্যাপ, সুইচ, ব্যাটারি, মেকআপ, ম্যাজিক, ক্যাম্প, ট্রেনিং, ডাস্টবিন, স্টল, রড, সিন (*ছেলে গেছে বনে*), হারমোনিয়াম, রিভ, বেলো, রেডবুক, মামি-ড্যাডি, লেক-মার্কেট, কমিশন, অর্ডার, প্রাইভেট টিউটর,

Dhaka University Institutional Repository

ডিউপার্ট, প্যাশান, প্লাস্টিক, গ্যারান্টি, লেন্স, পার্সেল, ওভার কোট (*জল সইতে*), ক্রীচে, হোসপাইপ, প্যান্ডেল, জম্পেস (?) (*চইচই-চইচই*) প্রভৃতি (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১২৮)।

শব্দজোড় তৈরি করার ব্যাপারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ লক্ষ করার মতো। এই শব্দবন্ধে কবির মানসপ্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে হয়। যৌগিক শব্দ ব্যবহারে কাব্যভাষায় সংহতি আসে, বক্তব্যে দৃঢ়বদ্ধতা তৈরি হয়। সুভাষের যে কোনো কাব্যগ্রন্থ থেকেই যৌগিক শব্দের বিস্তর দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে। আমরা যৌগিক শব্দ ব্যবহৃত কিছু পঙ্‌ক্তির উদাহরণ দিচ্ছি –

ক. চিমনির মুখে শোনো সাইরেন–শঙ্খ (মে-দিনের কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)

খ. পাষাণ-কায়া হায় রে , রাজধানী (প্রস্তাব : ১৯৪০/*পদাতিক*, ১/২৭)

গ. ছাত্র-যুবক-চাষী-মজুরের/গলায় গর্জে উঠল/বজ্রের সেই আওয়াজ। (ফের আসব/*চিরকুট*, ১/৭৩)

ঘ. ঘুম-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ। (অগ্নিকোণ/অগ্নিকোণ, ১/৮৫)

ঙ. কোটালের বানের উত্তঙ্গ তরঙ্গ-শিখরে উঠে (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩২)

চ. দম-আটকানো হাওয়া (মা, তুমি কাঁদো/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৫)

ছ. হাড়-বাড়-করা পাঁজরগুলো/এখন/বজ্রতৈরির কারখানা (আগুনের ফুল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪১)

জ. বাপের-আদরে-মাথা-খাওয়া-ছেলের মতো
হিজিবিজি অক্ষরগুলো (কেন এল না/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৭)

ঝ. লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি। /চাল-চিনি-মাছ তেল-ঘি ॥ (ছি-মন্তর/*কাল মধুমাস*, ২/১২৩)

ঞ. দুপুরে গড়ায়/ রোদে-দেওয়া গেঞ্জি গামছা জাঙিয়া মেরজাই। (ছিন্নভিন্ন ছায়া /*এই ভাই*, ২/১৯৭)

ট. যে-রোমাঞ্চ অন্ধকারে যেতে হাতে-ঝোলানো লণ্ঠনে। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২৩)

ঠ. যেন পোড়–খাওয়া কোন মানুষের কপালের রেখা।
(মরুভূমির হাওয়ায়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০৭)

ড. সেই কবেকার হলদে-হয়ে-যাওয়া/ফটো। (আগুন লাগলে/*জল সইতে*, ৩/৩৩৪)

উদ্ধৃতিগুলোতে ব্যবহৃত নিম্নরেখ যৌগিক শব্দসমূহ কাব্যপঙ্‌ক্তিকে দৃঢ়বদ্ধতা দিয়েছে। কবিকল্পনাকে সংহত ভাষায় বেঁধে ফেলার প্রয়াস সার্থক করে তুলতে এইসব শব্দবন্ধ সহায়ক হয়েছে। সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু যৌগিক শব্দের উল্লেখ করছি –

প্রজাপতি-সন্ধানী, যৌবন-আত্মা, দ্বিধা-বিলম্বে, হাত-মিলানো, আনা-তিনেকের, আরাম-চেয়ারে, হৃদয়-দুয়ারে, তীর-ধনুকের, শরীর-মনের, আলো-জ্বালা, মহিলা-আসরে, সলিল-সমাধি, নির্বাণ-লোভে, লেনিন-দিবস, হতোস্মি-সড়কে, রামধনু-রঙ, হাঙর-যক্ষ্মাই, নির্বাণ-বিদ্যা, স্বপ্ন–ভঙ্গ, সা-রো-গা-মায়, ধনুক-আঁকা, ভুলে-যাওয়া, হাত-বদলে, সংসার-সমুদ্রে (*পদাতিক*), সংসার-স্বর্গ, নগর-রক্ষা, স্বাধীনতা-রক্ষাকল্পে, বজ্রমুষ্টি, গতিচ্যুত, চষে-ফেলা, কাস্তে-হাতুড়ি (*চিরকুট*), বনেজঙ্গলে, গাঁ-উজাড়, বালব-চুরি-করা, ককিয়ে-ওঠা, গায়ে-গা-দেওয়া, দিনকে-রাত-করতে-পারা, দম-আটকা, লাফিয়ে-পড়া, হরিনাম-করা-পাখি, বাসন-ধোয়া, ভোট-কুড়ুনিরা, শান-বাঁধানো (*ফুল ফুটুক*), জল-মাটি-হাওয়ায়, কাঁটা-মারা, মরচে-ধোয়া, হাড়-জিরজিরে, আলো-জ্বালা, গন্ধে-ভরা, ঢালা-উপুড়, খেঁকি-কুকুর, ছানি-কাটা, জানলা-দরজা, নিভে-যাওয়া, পা-ঝাড়া (যত দূরেই যাই), ঝিলিক-দেওয়া, ঘুঙুর-পায়ে, হৃদয়-বীণা, সুশীলা-ফুশীলা, শো-কেস, নড়ে-চড়ে, ভালুক-নাচ, নোঙর-বাঁধা, মণি-জ্বলা, বাড়ি-গাড়ি, আফগারি-দারোগা (*কাল মধুমাস*), নাম-ঠিকানা, আগুন-

Dhaka University Institutional Repository

রঙ, দম-বন্ধ-করা, ছুঁড়ে-দেওয়া, ঘর-বার, কবচ-তাবিজ (*এই ভাই*), লাল-গাড়ি-পাশ-হওয়া, হাত-রাঙানো, কাকতাড়ুয়া, ঘর-দোর-চাপান-উতোরে, টুপভুজঙ্গ, দাঁড়-করানো, ছলেবলেকৌশলে, গালে-কাটা-দাগ, কোণাঘুপচিতে, চড়াই-উৎরাই (*ছেলে গেছে বনে*), আলো-নেভানো, ডানা-কাটা, কাজে-না-লাগা, সোনার-জলে, ছাপা-মলাট, ভোঁচকানি-লাগা (*একটু পা চালিয়ে, ভাই*), কাজল-লতা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সুরকি-চুন, গায়ে-কাঁটা-দেওয়া, দ্যাখ্-না-দ্যাখ্, সুবর্ণপদকধারী, বোবা-কালা, (*জল সইতে*), পাড়-ভাঙা, শেকল-ভাঙা, দাঁত-বার-করা, শ্বাসরোধ-করা, এই-অন্ধকার-দূর-করা-আলো, মন্ত্র-জপ-করা, কথা-দিয়ে-কথা-জোড়া (*চইচই-চইচই*), নাকের-জলে-চোখের-জলে, কোল-জোড়া-ধন, মরতে-না-পারা (*ধর্মের কল*) প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত যৌগিক শব্দসমূহে কবির প্রয়োগ-দক্ষতা চোখে পড়ার মতো। একাধিক ছোট শব্দ জুড়ে দিয়ে একটি দীর্ঘ শব্দ তৈরির এই কৌশল প্রয়োগে সুভাষের কাব্যদেহে লাবণ্য এসেছে। যৌগিক শব্দ সুভাষের কবিভাষায় গতি সঞ্চার করেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রচুর নামবাচক এবং স্থানবাচক বিশেষ্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নামবাচক বিশেষ্যের আধিক্যে তাঁর কবিতার শিল্পগুণ ব্যাহত হয় নি। কবির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দায়বদ্ধতা নানা নামের অনুষঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে নানা সাফল্য ও ব্যর্থতার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির স্মরণ নিয়েছেন । ধর্মীয় অনুষঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, বাসুকি, বীরবাহু, পাণ্ডব (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব), দ্রোণাচার্য, কেষ্ট (কৃষ্ণ), দশরথ, বিভীষণ, দধীচি, কম্ভুকর্ণ, নচিকেতা, কালী, শিব, রামকৃষ্ণ পরমহংস, অহল্যা প্রমুখ নানা দেবতা ও পৌরাণিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা ব্যক্তি যেমন– ভুসুকু, কুক্কুরীপাদ, কাহ্নপা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নোগুচি, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নাজিম হিকমত, প্রবোধচন্দ্র সেন, সাগরময় ঘোষ, রত্নাকর, সুগত মৈত্র, রামকৃষ্ণ মৈত্র, নীরদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কালীসাধন দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, শাহরিয়ার, রাইনার মারিয়া রিলকে, এরিখভাইনার্ট, হেরমান হেস্‌সে, দস্তয়ভস্কি, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী সহ আরো অনেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন কবি। রাজনৈতিক অনুষঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে গান্ধী, লেনিন, মার্ক্স, ক্যাম্বেল, চিয়াঙ, হো চি মিন, কমরেড স্টালিন, নিয়াজি, নেতাজী (সুভাষচন্দ্র) প্রমুখ ব্যক্তির নাম। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সুভাষের কবিতায় বাবরালি, সালেমন, সালেমনের মা, রাম, রহিম, যদু, মধু, শ্যাম, আহম্মদের মা সহ অনেক মুখ উপস্থিত। হেড্রিক, বল্লভ ভাই, পারুল বোন, আলাদিন, গৌরীসেন, সুশীলা, লাবণ্য *(শেষের কবিতা*-র নায়িকা), উলানোভা, দাসদিভানিয়া, গোপাল ভাঁড়, আইনসাইনজী (আইনস্টাইন), রেগান, চার্বাক প্রমুখ চরিত্রের সপ্রসঙ্গ উল্লেখ সুভাষের কবিতায় অভিনবত্ব এনেছে।

ব্যক্তির নামের মতো স্থানের নাম ব্যবহারেও সুভাষের আগ্রহ উল্লেখ করার মতো। সুভাষের সমাজমনস্কতা এবং রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয় এইসব নামের ভেতর দিয়ে চারুকৃত হয়েছে। একজন সমালোচক সুভাষের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত স্থানের ও নদীর নামসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছেন যা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায় –

যুক্তরাষ্ট্র, ডায়মণ্ড, হারবার, বার্সিলোনা, কলকাতা, খিদিরপুর, চীন, ভারতবর্ষ, ঢাকা, হ্যাঙ্কাও, কান্টন,

Dhaka University Institutional Repository

সাংহাই, আসানসোল, অলকা (*পদাতিক*), জালিয়ানবাগ, দিল্লী, সিমলা, জাপান (জাপ), ভারত, মিউনিখ, এশিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মালয়, বর্মা, সিঙ্গাপুর, আরাকান রেঙ্গুন, স্টালিগ্রাদ, গোয়ালিয়র, চৌরঙ্গি, কুরুক্ষেত্র (*চিরকুট*), সিঙ্গাপুর, শ্যাম, কম্বোজ, পেনাঙ, তেলেঙ্গানা, ব্যঞ্জনহেড়িয়া (গ্রাম), বাংলাদেশ (বাংলা) (*ফুল ফুটুক*), আফ্রিকা, লন্ডন (*যত দূরেই যাই*) ক্রেমলিন, নওগাঁ, দুবলহাটি, দিঘাপতিয়া, (*কাল মধুমাস*), ভিয়েতনাম, আমেরিকা, মথুরা (*এই ভাই*), লেনিনগ্রাদ, চীন, মার্কিন (*ছেলে গেছে বনে*), বাগদাদ, আলীপুর (*জল সইতে*), কম্বোজ, লাতভিয়া (*চইচই-চইচই*)। সুভাষ কবিতায় পদ্মা, গঙ্গা, ভল্গা, ইরাবতি, মেকং, প্রভৃতি নদীর নামও দেখা যায় (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১৩০-১৩১)।

উপর্যুক্ত নামবাচক এবং স্থানবাচক শব্দ থেকে সুভাষের শিল্পভাবনার মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। মার্কসবাদী রাজনৈতিক বিশ্বাস কবিকে জনসংলগ্ন করেছে। ফলে অনিবার্যভাবেই কবিতার শব্দে যুক্ত হয়েছে প্রগতিশীল রাজনীতির উত্তাপ। 'মতাদর্শে অনুরঞ্জিত হয়েছে তাঁর কবিতার শব্দ। সমাজবিপ্লবের রোমান্টিক স্বপ্নের সঙ্গে প্রগতির বেগ সঞ্চারে প্রত্যয়ী সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার শব্দরূপে সৃষ্টি করেছেন নান্দনিক ব্যঞ্জনা' (আহমেদ মাওলা ২০০৭ : ১৮২)। সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই তিনি মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আহত হয়েছেন, ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় শ্রমশোষণের বহুবর্ণিল প্রক্রিয়ার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। আর যেখানেই সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গর্জে উঠেছে, সমাজতান্ত্রিক শক্তির উদ্বোধন ঘটেছে, কবি তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ফলে কবির কাব্যদেহে নানা অনুষঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে নানা ব্যক্তি, নানা স্থানের নাম।

বিশেষণ ব্যবহারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব কাব্যপাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশেষণ ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে বক্তব্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে মানুষ স্বভাবতই বিশেষণ প্রয়োগ করে। কবি-কল্পনায় যে ভাবের অঙ্কুরোদ্‌গম, পাঠকের চিন্তায় তারই বিস্তার ঘটে নানাবিধ উপমা ও বিশেষণের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, উপমাও সামগ্রিক বিচারে বিশেষণেরই বিস্তৃত রূপ। সুভাষের কবিতায় বিশেষণের বহুমাত্রিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত –

ক. চোখে আর স্বপ্নে নেই নীল মদ্য/ কাঠফাঁটা রোদ সেঁকে চামড়া (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২২)

খ. বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে/ভূমিষ্ট নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ
(চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৬)

গ. কাস্তের মুখে নতুন ফসল/তুলবার। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৬)

ঘ. পুড়ে পুড়ে ছাই হবে আত্মক্ষয়ী আগুন (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩১)

ঙ. যৌবনে পা দিয়ে রয়েছে/একটি উলঙ্গ মৃত্যু (পায়ে পায়ে/*যত দূরেই যাই*, ২/৬৯)

চ. নিরক্ষর হাওয়া /বারে বারে বইয়ের ওলটাচ্ছে পাতা (জলছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৬)

ছ. হুস হতে দেখি ধুরন্ধর সে চোট্টা/মেরে নিয়ে গেছে/ আগামীবারের ভোটটা (সর্ষে/*এই ভাই*, ২/২০৩)

জ. শুয়ে শুয়ে দেখছ হাঁ-করা আকাশটা। (ধরাবাঁধা/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২৮)

ঝ. বছরে বারোমাস ভোঁচকানি লাগা ক্ষিধে (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫১)

ঞ. বাড়ি করেছি।/নীল আকাশে তুলেছি ছাদ। (তুঘলক লেনে/*জল সইতে*, ৩/৩৩৩)

ট. মুণ্ডহীবাহীন এক নির্বোধ কবন্ধ (অন্ধকারে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮১)

ঠ. কুকুরটা অতি নচ্ছার অতি বদ্‌ (কখনও কখনও/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮০)

Dhaka University Institutional Repository

ড. হেঁড়ে গলা, গাল-চড়ানো ক'জন/জন্মদুঃখী হিজড়ে (ডোমকানা/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/১৬)

ঢ. তাতে পাতায় পাতায় ভুল-বানানে ভর্তি/আমার নাম (ফেউ/*ধর্মের কল*, ৫/২৩১)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের নিম্নরেখ শব্দগুলো বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলোর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুভাষের শিল্পদৃষ্টিও সমাজভাবনার প্রকাশে প্রাণবন্ত হয়েছে। 'তাঁর বিশেষণগুলো জীবনঘনিষ্ঠ এবং হৃদয়গ্রাহী' (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১৩১)। আরো কিছু বিশেষণের উল্লেখ করা যাক –

লাল উল্কিতে, শতাব্দীলাঞ্ছিত, বালখিল্য স্বপ্নরা, লাল প্রত্যূষ, ব্যবসায়ী মন, ভূখা সমাজ, অহিংস শকট, ভ্রষ্ট কবিতা, খাসা চিজ, রক্তচক্ষু মারোয়ারি, কংগ্রেসি মনোনয়ন, নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, গ্লেসিয়ার দিন, পণ্য যুবতী, নিরামিষ নাচ, বোমাত্মক এরোপ্লেন, নিশাচর স্ফূর্তি, গলিতনখ পৃথিবী, সংক্রামক স্বাস্থ্য, প্রাকপুরাণিক লোভ, নির্ভুল গায়েন (*পদাতিক*), অপমৃত্যু, উন্মত্ত হিংসা, উপবাস রুক্ষ হাড়, ঋণগ্রস্ত চাষী, অগ্নিদগ্ধ মাঠ, পিপাসু ঘাস, ভগ্নদূত শাখা, নিরস্ত্র দেশ, অনুকম্পাহীন ঘৃণা, প্রতিজ্ঞাকঠিন হাত, শানানো কাস্তে, বেত্রাহত অন্ধকার, রক্তলোভাতুরা শিবা, পুঞ্জিত ক্রোধ, মুক্তিদাতা মজুর চাষা, দ্রুতগতি ইতিহাস, কাপুরুষ ভয়, বিপর্যস্ত উত্তরপুরুষ, মৃত্যুঝলকিত কামান, নিরুদ্দিষ্ট আল, ছিন্নপত্র সংসার, লুব্ধ লালা (*চিরকুট*), ক্ষুরধার তলোয়ার, নেশাতুর চোখ, লাল নিশান, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র (*অগ্নিকোণ*), আসন্নসম্ভবা বউ, দম-আটকানো হাওয়া, বেগান্ধ পতন, জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, উজ্জ্বল নক্ষত্র, দুরন্ত ক্রোধ, জোয়ানমদ্দ অন্ধকার, কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে, বেগান্ধ পতন, কাঠখোট্টা গাছ, অন্ধকারে মোড়া অন্তহীন পাথার, দুর্দমনীয় স্পর্ধা, মহিমান্বিত জীবন, পিচুটি-পড়া চোখ (*ফুল ফুটুক*), দজ্জাল স্মৃতি, দাঁত-খিচানো ভয়, ভয়ঙ্কর সুন্দর, বাজখাই গলা, ঘোমটা দেওয়া অরণ্য, আদ্যিকালের লাঙল, খুনখুনে অন্ধকার, উড়ু উড়ু ঢেউ, মরচে-ধোয়া জল, আঁশটে সন্দেহ (*যত দূরেই যাই*), ঝিঝিলাগা ফ্লাটবাড়ি, তুলকালাম মেঘ, বিকলাঙ্গ ভিখিরি, অন্ধকার সিঁড়ি, পুরোনো বিজ্ঞপ্তি, পুলকিত পদচিহ্ন, শোকস্তব্ধ ভালোবাসা, উদ্ভিন্ন মাটি, গেরুয়া-রং ঢেউ, নিষ্ঠুর থাবা, ধোঁয়াটে কথা, ধুরন্ধর শেয়াল (*কাল মধুমাস*), পুরোনো মূর্তি, সাজোয়ান ছোকরা, হাত-ধোয়া নোংরা জল, সাদা চুল, মরচে-ধরা লতাপাতা, জোয়ান তিন ধিঙ্গি, কেতাদুরস্ত আপিস, মৃত্যুঞ্জয় মনুষত্ব, ফিটফাট টেরিকাটা ফুল বাবু (*এই ভাই*), অন্ধকারে চেরা জিভ, বিভেদের এক টুকরো মাংস, দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা, ধৃষ্ট সিগন্যালের আলো, গাঁ-শহরে বসানো পুতুল, ঢেউ-খেলানো টিন, গা-ঢাকা দেওয়া অন্ধকার (*ছেলে গেছে বনে*), জন্মদুঃখী মা, আলো নেভানো শহর, ধূ ধূ করা মাঠ, হেমন্তের হলদে পাতা, ঐন্দ্রজালিক কুয়াশা, রঙীন রুমাল, বৃষ্টি ধোয়া ঘাস, কালো ভ্রমর (*একটু পা চালিয়ে, ভাই*), বোবা কোকিল, ছেঁড়া হাতপাখা, জংধরা খাঁচা, বাকসিদ্ধগণতন্ত্রাচার্য, বেদম হাতঘড়ি, হাল ফ্যাশানের ট্র্যানজিস্টর (*জল সইতে*), নিদারুণ রসিক, দীর্ঘ মেয়াদী অন্ধকার, ঢেউ-খেলানো বক্স, ফিনকি দেওয়া জোনাকি, টগবগে লাল ঘোড়া (*চইচই-চইচই*) প্রভৃতি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে বিশেষণের স্বাভাবিক এবং নিপুণ ব্যবহার ঘটেছে। বিশেষণের ব্যবহার-বিপর্যয় ঘটিয়েও কখনো কখনো ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন তিনি। 'কবিতার যে-অভিঘাত আমাদের হৃদয়ে আবিষ্কারের আনন্দ দেয়, বিপ্রতীপ বিশেষণও সেই অভিঘাত নির্মাণ করতে পারে'(মাহবুব সাদিক ১৯৯১: ৩১২)। সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বিশেষণই পাঠক-কল্পনাকে সম্প্রসারিত করে বলেই তাঁর প্রয়োগসাফল্য প্রশংসাযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে কবিতায় সাঙ্গীতিক ধ্বনিমাধুর্য এবং কথ্যভঙ্গির গতি-সঞ্চারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাতাসের প্রেরণায় জলের সঙ্গে জলের সংঘর্ষে যেমন ঢেউয়ের নাচন জেগে ওঠে, তেমনি দ্বিরুক্তি শব্দও পারস্পরিক আঘাতে উদ্বেলিত হয়, যা পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকেও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। কিছু দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. শকুনির নখরে নখরে/উন্মত্ত হিংসায় লালা ঝরে (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯)

খ. মাঠের সোনালী ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে। (স্বাগত/*চিরকুট*, ১/৬৯)

গ. কচি কচি কণ্ঠে দিন আর রাত্রিকে টুকরো টুকরো করে (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

ঘ. অন্ধকারকে আছড়াতে আছড়াতে/ছোট্ট বউটা ভাবে (বাসি মুখে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৪)

ঙ. খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০০)

চ. শাশুড়ি বিড়বিড় বিড়বিড় করে .../গটগট গটগট করে হেঁটে গেল (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৭)

ছ. ঘষে ঘষে তোলা হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫০)

জ. হিজিবিজি হিজিবিজি/নদী নৌকো নদী নৌকো নদী (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৫৭-১৫৮)

উদ্ধৃতিসমূহে ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দগুলো কাব্যপঙ্‌ক্তিতে চমৎকার ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। কথ্য ভাষাভঙ্গিকে কাব্যদেহে জুড়ে দেয়ার প্রবণতাই হয়তো সুভাষকে অধিক পরিমাণে দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে। তবে তাঁর প্রয়োগ কখনোই অপ্রাসঙ্গিক কিংবা আরোপিত মনে হয় না। বিষয়ের প্রয়োজনেই ভাষা সবচেয়ে উপযোগী ভঙ্গিটিকে আয়ত্ত করে নেয়। সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ উল্লেখ করা হলো –

> মাঝে মাঝে, জমে জমে, গরর গরর, দিকে দিকে, বছর বছর, মোড়ে মোড়ে, একে একে, ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে, গ্রামে গ্রামে, নাচতে নাচতে, বাজাতে বাজাতে, নগরে নগরে, মুছতে মুছতে, ডালে ডালে, পড়ো-পড়ো, দাউ দাউ, টিকিয়ে টিকিয়ে, কোটি কোটি, ঠেলে ঠেলে, পাকে পাকে, হাজারে হাজারে, নখে নখে, রক্তে রক্তে, জ্বলজ্বল, ঠেলে ঠেলে, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে, ফোঁটায় ফোঁটায়, ঘষে ঘষে, বিন্দু বিন্দু, চম্‌কে চম্‌কে, হঠাৎ হঠাৎ, চুপি চুপি, ঠেলতে ঠেলতে, চিক চিক, হাঁটি-হাঁটি পা-পা, টিপ টিপ, টপ টপ, দোলাতে দোলাতে, ডুবে ডুবে, উঁচু উঁচু, কচি কচি, বলতে বলতে, গড়াতে গড়াতে, ক্যাঁচর ক্যাঁচর, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, ভেঙে ভেঙে প্রভৃতি।

সুভাষের কবিতায় সর্বনামের নানামাত্রিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'সর্বনামের গৌরবার্থের এবং তুচ্ছার্থের রূপ অর্থাৎ, আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, আমাদের, তোমাদের, আমাকে, তোমাকে, তার, ওরা, যারা, সে প্রভৃতির সাক্ষাৎ মেলে। সর্বনাম তাঁর কবিতার মূল-সুরের নিয়ন্ত্রক' (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১৩৩)। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. কৃষক, মজুর! আজকে তোমার পাশাপাশি
অভিন্ন দল আমরা। বন্ধু, আগে চলো– (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৩)

খ. তোমরা অক্লান্ত কর্মী মাঠে মাঠে,/তোমাদের হাতের ফসল
আমাদের বাড়ায় কদম।/...তোমার হাতের বল্গা। (সীমান্তের চিঠি/*চিরকুট*, ১/৬১)

গ. আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা। (পারাপার/(*ফুল ফুটুক*, ১/১৪২)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. আমাকে দেয় নি শাপ
শোকগ্রস্ত কোনো অন্ধ মুনি। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২১)

ঙ. ইস্রাফিল, শিঙা তোর বাজা। (সাজা চাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২২)

অব্যয় ব্যবহারে সুভাষের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। কখনো কখনো অব্যয়কে অবলম্বন করেই নাটকীয় ভঙ্গিতে কবিতা রচনা করেছেন তিনি। সমালোচক সৈকত আসগর উল্লেখ করেছেন যে, *জল সইতে*-এর 'যাচ্ছি' কবিতাটিতে 'ও' অব্যয়টি ১১৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে (১৯৯৩ : ১৩৩)। অব্যয়ের যথার্থ ব্যবহার কবিতার বাকরীতিকেও প্রভাবিত করতে পারে। আবেগঘন উচ্চারণে অব্যয় প্রাণসঞ্চার করে। একটি উদ্ধৃতি দেয়া যাক –

উঁচু উঁচু পেল্লায় বাড়ি
আহা-হা তা
উঠবেই তো!
আমাদেরও ওঠার পালা
এল এবার;
যা করবার
তাড়াতাড়ি! (তো/*জল সইতে*, ৩/৩২২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় কথ্যভঙ্গিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে কথ্যক্রিয়াপদ ব্যবহারের দিকেই তাঁর ঝোঁক স্পষ্ট। 'কথ্যশব্দ, কথ্যবাকভঙ্গি ও কথ্যক্রিয়াপদ-এর ব্যবহার কবিতার ভাষায় বিশেষ ঝোঁক ও গতিশীলতা আনে। সামাজিক মানুষের কথ্যভাষা কাব্যপঙ্‌ক্তিতে ব্যবহারের ফলে কবিতায় সঞ্চারিত হয় নতুন মাত্রা ও সংবেদনা' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩০০)। কথ্যক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ব্যবহারই তাঁর কবিতায় অভাবনীয় গতি সঞ্চার করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে –

ক. কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ? (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে/হুজুর জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে/ জ্বলে উঠবে আগুন ॥ (চিরকুট/*চিরকুট*, ১/৬২)

গ. এক জায়গায় ব'সে/আমরা হাপুস-হুপুস ক'রে খাচ্ছি। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

ঘ. কালের সেপাই এসে ঘাড় ধ'রে তুলে দিয়ে বলল : যা-হট্! (যা হট্ /*কাল মধুমাস*, ২/১৪৬)

ঙ. ...হাত পা ছড়াচ্ছে গাড়ির রাস্তা/মা-বাবাকে দূরে হটাচ্ছে মামিড্যাডি
(হাটবাহার/*জল সইতে*, ৩/৩২০)

চ. ...প্রভাতফেরির সঙ্গে/ভোরের আজান/একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে
(একাকারে/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৬৭)

একই কথ্যক্রিয়াপদের ক্রমাগত ব্যবহার করে কবি কখনো কখনো এক ধরনের ছন্দদোলার সৃষ্টি করেছেন যা অসাধারণ কাব্যসিদ্ধি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে *জল সইতে*-এর 'যাচ্ছি' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে যাচ্ছি শব্দটি অর্ধশত বার ব্যবহার করেছেন কবি। এক বাক্যের একটি কবিতায় শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন কবি – 'আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে/দুলে দুলে/সারাক্ষণ/দুলে দুলে/নিশান/দুলে দুলে/ নিশান/দুলে

Dhaka University Institutional Repository

দুলে/সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে/নাচছে ॥' (নিশান/*কাল মধুমাস*, ২/১১৭)।

এই কথ্যভঙ্গিই সুভাষকে লোকসাহিত্য-বিষয়ক শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা বা ইডিয়ম, ধাঁধা, লোকগল্প ইত্যাদির যেমন নিজস্ব ভাষা ভঙ্গি রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার। লোকবিশ্বাস এবং লোকাচার থেকেও শব্দ সংগ্রহ করেছেন তিনি। কিংবদন্তি, তন্ত্রমন্ত্র, পীর-ফকির, গোপাল ভাঁড়, গাজীরপট, গাজনের গান, কবিগান, রাক্ষসখোক্ষস, দৈত্যদানব ইত্যাদিও তাঁর আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনা প্রকাশের সহায়ক-শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।[৩] এভাবে লোকসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক পাঠককে নতুনভাবে পরিচয় করে দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

চলতি ক্রিয়াপদ ও কথ্যশব্দের আশ্রয়ে কাব্যরচনায় স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন কিছু নতুন ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সমকালীন সমাজজীবন এবং রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'নিজের অনুভবের বাহন হিসেবে কবি কখনো অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন, কখনো নির্মাণ করেন নতুন শব্দ' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩০৬)। প্রগতিশীল রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার আলোকে সুভাষ জনমানসের নানা প্রতিক্রিয়াকে চারুকৃত করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁকে কতিপয় নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে –

ক. কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে। (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. রুপোর পিপাসা মেটাবে জাপানি রূপকে। (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৮)

গ. বাহান্ন হাতির শুঁড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট। (নারদের ডায়রি/*পদাতিক*, ১/৩১)

ঘ. জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৭)

উদ্ধৃতিসমূহে নিম্নরেখ শব্দগুলো কবির মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনেই পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়েছে। উদ্ধৃতি ক-এ 'কুয়াশা' ও 'কঠিন' মিলে 'কুয়াশাকঠিন' প্রচলিত ব্যবহারের বাইরের কোন অভিনব ভাবনার স্মারক হিসেবে। দৃষ্টান্ত খ-এর 'জাপানি রূপক' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আগ্রাসী তৎপরতাকে নির্দেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে কবি সৃষ্টি করেছেন উদ্ধৃতি ঘ-এর 'জাপপুষ্পক' শব্দটি। জাপানি বোমায় বিধ্বস্ত চীনের প্রসঙ্গে শব্দটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশিত করেছে। উদ্ধৃতি গ-এর 'অহিংস শকট' ব্যবহার করে কবি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে ইঙ্গিত করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'শব্দের চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধ হয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৩ : ৮৫)। তিনি সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজস্ব অর্জনের অন্বয় ঘটিয়ে গড়ে তুলেছেন এক সমৃদ্ধ শিল্পভাণ্ডার। তাঁর যাত্রা সহজের পথে বলেই সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার মসৃণ। সুভাষ 'কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত' হেঁটে গেছেন, আর তিনি কলমকে রেখেছেন 'ট্রাক্টরের পাশে'। তাই তাঁর শব্দসম্পদে মাটির গন্ধ এমন নিবিড়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. কবিতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণে Coleridge বলেছেন, কবিতা হলো Best words in the best order. উদ্ধৃত, শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, ১৯৯২, চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা। পৃ. ৩১।

২. গবেষক ড. সৈকত আসগর *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক* (১৯৯৩ : ১২৫) গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় দেশি বা আঞ্চলিক কিংবা সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত শব্দের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। আমরা সুভাষের সেই শব্দগুলোকে উদ্ধৃত করেছি যে শব্দগুলোর উপস্থিতিতে কাব্যপঙ্‌ক্তি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে এবং পুরো কবিতার বিবেচনায় শব্দের আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে তা অভিনবত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

৩. প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা বা ইডিয়ম, ধাঁধা, লোকগল্প ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (বাক্-রীতি) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আহমেদ মাওলা, ২০০৭, *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩. শ্রীশচন্দ্র দাশ, ১৯৯২, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, , চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা।

৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৩, *কবিতার বোঝাপড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫. সৈকত আসগর, ১৯৯৩, *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. সৈয়দ আলী আহসান, ১৩৭৫, *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*, বইঘর, চট্টগ্রাম।

৭. সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৮৯, *কবিতার রূপকল্প*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. সৈয়দ আলী আহসান, ১৩৭৭, *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

৯. T. S. Eliot, Mcmlxvii, *The Use of Poetry And The Use of Criticism*, Reprinted, Faber and Faber, paper-back, London.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাক্-রীতি

কবিতা জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকেই শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করে। অন্যকে আলোকিত করার অভিনব শক্তিতে সমৃদ্ধ না হলে কবির সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে না। সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়োজনেই কবি তাঁর ভাষায় স্বাতন্ত্র্য আনার চেষ্টা করেন, নিজেকে প্রকাশের জন্য নির্মাণ করেন এমন 'ঢঙ' বা 'ধরন', যার সম্মোহন অনায়াসেই পাঠকের চিন্তাকে আলোড়িত করতে পারে। কবিতার প্রকরণ আলোচনায় প্রকৃত অর্থে কবিতার ভাষার নানা প্রান্তকেই বিশ্লেষণ করা হয়। যে কোন সফল শব্দশিল্পীরই থাকে নিজস্ব ভাষাভঙ্গি, যার স্পর্শে কবিতার বিষয় মধুর, মুখর এবং মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে, পাঠকের কল্পনাপ্রতিভা প্রাণবন্ত হয়। প্রকরণ-প্রকৌশলে কবির সার্থকতা সেই অর্থে তাঁর ভাষাগত স্বকীয়তাকেই চিহ্নিত করে। বর্তমান আলোচনায় আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার স্বরভঙ্গির প্রধান প্রবণতাসমূহ আলোচনা করে তাঁর কাব্যভাষার বিশেষত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

যে কোন সৃষ্টিশীল প্রতিভাকেই ক্রমাগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর চলার পথটিকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে হয়। কাজটি সহজ নয় বলেই শিল্পসাহিত্যে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার অভিযানে অধিকাংশকেই কালের গর্ভে বিলীন হতে হয়। সম্ভাবনাময় শিল্পী প্রতিনিয়ত নিজেকে অতিক্রম করেন। চিন্তায়, কৌশলে সেই অতিক্রমণের ছাপ পড়ে। ফলে একজন কবি আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণ করতে গিয়ে এক জীবনে বহু পূর্বগামীর অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে আত্তীকরণ করেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> বড় কবি আর অ-বড় কবি, বা বলা যায়, লায়েক কবি আর নালায়েক কবির মধ্যে আসল তফাত এইখানে যে লায়েক কবি কখনো, এক-আধবারের জন্যেও, যেসব কাঁচা মাল নিয়ে তাঁকে কবিতাটি লিখতে হয় সেই শব্দ, ছন্দ, মিল, অলংকারের ব্যাপারে কোনো দ্বিধা দেখান না, দেখাতে পারেন না। ঐ সব কাঁচা মাল তাঁর মাথার কোনো অতল গভীরতায় ঠিকঠাক এমন বিন্যস্ত হয়েই থাকে, যেন সাত পুরুষের কুমোরের ছেলে তার চাকা ঘুরোচ্ছে আর তার মাত্র দশ-দশটি আঙুলের চাপের হেরফেরে গোল হয়ে উঠছে একটা কলস, বা একটা হাঁড়ি, বা নেহাত একটা ভাঁড়। এ সবই তো গোল। কিন্তু এসব গোল এক রকমের গোল নয়। কোন গোল কী রকম হবে, আর কী বানাতে কতটা মাটি লাগবে, তা জানে এক কুমোরের আঙুল, আর সে-আঙুল তা জেনেছে তার সাত পুরুষের কাছ থেকে। সব কবিরই নিজের নিজের সাত পুরুষ থাকে। যে কবি নিজের জন্যে সেই সাত পুরুষ বানাতে পারে না, তার আর কবি হওয়া হয়ে ওঠে না।[১]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পসাধনায় আত্মনির্মাণের এই প্রয়াস সাফল্যের মুখ দেখেছে। সুভাষের সৃজনভুবনে নিজস্ব আঙুলের ছাপ এতো স্পষ্ট যে, সেখানে 'সাত পুরুষের' অর্জিত অভিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রবল উপস্থিতিই যেন প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। ভাষার ভেতর দিয়ে কবির জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার নানা প্রান্তের মধ্যে একটা অন্বয়ের চেষ্টা চোখে পড়ে। এই সমন্বয়-প্রচেষ্টার ভেতর সুভাষের আত্মোপলব্ধির যে-পরিচয় অঙ্কিত হয়েছে, তার জন্যে কবিকে ভাষার প্রচলিত কাঠামোকে স্বীকার করে নিয়েই বিপ্রতীপ ক্রম ব্যবহারের সাহস দেখাতে হয়েছে, যদিও এই ক্রম কবির নিজস্ব সৃষ্টি – এমন কথা বলা যায় না। মানুষের কথোপকথনের মধ্যেই শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম নানা কারণে পাল্টে যেতে পারে। কবিতা কিংবা গদ্য যাই বলি না কেন, তাকে মানুষের ব্যবহৃত ভাষাকেই অবলম্বন করতে হয়। 'আমাদের অন্বয়ের মধ্যে যে সম্ভাবনা, তা সাধারণ মানুষই খুঁজে পেয়েছে, ব্যবহার করেছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সেই বিশেষ ক্ষেত্র হল মূলত আবেগের, মূলত প্রাত্যহিকের বাইরে বৈচিত্র্য সন্ধানের। আর সেই কারণেই কবিতার মধ্যে তার আবির্ভাব হল আগে, আর কবি তার বিচিত্র সম্ভাবনাকে কবিতার ভাষার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এই হল কবিতার ভাষার ভেতরের ইতিহাস।'[২] সুভাষের কবিতায় ভাষার এই মূল শক্তির বর্ণিল প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে শিল্পাদর্শে নিজেকে নির্মাণ করেছেন সেখানে সাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে। প্রগতিচেতনার মূল সূত্রই হলো জনসংলগ্নতা। বিচ্ছিন্নতার বিপ্রতীপ উচ্চারণই প্রগতিপন্থীদের স্বতন্ত্র ভূখণ্ড সৃষ্টি করেছে। সেখানে কবিকে ঘোষণা করতে হয় 'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি/একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে' (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)। এই 'মিলিত অগ্রগতি'র জন্যেই কবিকে নির্মাণ করতে হয়েছে এমন এক কবিভাষা, যার আহ্বান সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চিত্তে প্রবেশ করতে সক্ষম। অবশ্য *পদাতিক* থেকে *অগ্নিকোণ* পর্যন্ত কবি ভাষাকে মেজে-ঘষে যে শাণিত দীপ্তি দিয়েছেন, তা মানুষের দৈনন্দিন ভাষা থেকে খানিকটা দূরবর্তী– একথা স্বীকার করতেই হয়। এ প্রসঙ্গে দেবেশ রায় বলেছেন –

> আমার যেন মনে হয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'অগ্নিকোণ' পর্যন্ত নিজেকে বেঁধে রেখেছেন কবিতার একটু রক্ষণশীল বাচনেই। মুখের কথা থেকে সে-বাচন দূরত্বের কথা বলে না বটে, তবে, ছন্দে-উপমায়-মিলে মুখের কথা থেকে তার দূরত্বটা খুব বেশি অস্পষ্ট থাকে না। পড়তে-পড়তে, বলতে-বলতে, শুনতে-শুনতে আমাদের এত ভেতরে ঢুকে গেছে এমন কথা-বলা –
>
> মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ,
> মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
> আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;
> বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
> আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান
>
> যে ভুলে যাই এই কবিতাটি লেখার আগে আমরা এ-ভাষায় কথা বলিনি। আমাদের মুখ থেকে কবি এ-ভাষা নেননি, কবির কবিতা থেকে আমরা এমন করে কথা বলা নিয়েছি। বড় কবিদের কাছ থেকে এইভাবে আমরা নিজেদের ঠোঁটে বুলি ফুটাই।[৩]

সুভাষের বাক্‌রীতি মুখের ভাষাকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছে, না কি তাঁর কবিতার ভাষায় আমরা কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছি, এ বিষয়ক বিতর্কে অবতীর্ণ না হলেও তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, তিনি সাধারণের বোধকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়েই দুর্বোধ্যতা থেকে দূরে থেকেছেন। সমাজের সর্বস্তরে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বলেই সরলতার দিকে তাঁর এই যাত্রা। কারণ 'সমাজের কবিকে সুবোধ্য হতেই হয়'।[৪] সমাজমনস্কতা এবং রাজনীতিসচেতনতার প্রভাবেই সুভাষের কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি চিত্রিত হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গাত্মক ভাষাভঙ্গি দিয়েই তাঁর কাব্যযাত্রা শুরু করেছেন। *পদাতিক*-এর অনেক

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায়ই তাঁর ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্য সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সমালোচক সত্যজিৎ চৌধুরীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে –

> ব্যঙ্গপ্রবণতা সমর সেনে প্রথম থেকেই ছিল, এই 'ব্যঙ্গ'-র উৎস দীপ্তবুদ্ধিই তাঁর কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছে। সমর সেন তাই যে পরিমাণে আঘাত করেন সেই পরিমাণে হৃদয়ে পৌঁছান না। ...বক্তব্যের এই ঋজু প্রকাশভঙ্গি এবং স্পষ্টবাদী কবিস্বভাব সুভাষেই যথার্থ রূপ পেয়েছে বলে মনে করি। ব্যর্থ হলেও সমর সেনেই যার সূচনা– সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে তারই সার্থক উত্তরাধিকার। সুভাষের কবিতায় হৃদয়বৃত্তির উদ্দামতা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণী বুদ্ধি আশ্চর্য মাত্রাজ্ঞানে সমৃদ্ধ। তিনি নজরুলসুলভ ভাবালুতায় ভেসে যান না, অথচ বুদ্ধিমার্গের নির্ধারিত পরিণাম 'ব্যঙ্গ'ও তাঁর একমাত্র অবলম্বন নয়। সুভাষের কবিতায় ব্যঙ্গ কখনও সহজ অনুভূতির অভিব্যক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি এবং সুচতুর বাক্যশরসন্ধান অব্যর্থভাবে কাব্যরসেরই উদ্বোধক।[৫]

ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই স্বাতন্ত্র্য যে কোন সচেতন পাঠকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে বাণ ছুঁড়েই ক্ষান্ত হন না, সহানুভূতি দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে দেখেন। ফলে বিপরীত শিবির বিক্ষুব্ধ না হয়ে ভাবতে শুরু করে। বোধোদয়ের এই অব্যর্থ বাণ সুভাষের জীবনবীক্ষারই নানা প্রান্তকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে –

ক. প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীরধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;
দেহ না চললে চলবে তোমার কড়া চাবুক। (প্রস্তাব : ১৯৪০/*পদাতিক*, ১/২৫)

খ. বুঝেছি কাঁদা বৃথা; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল ॥ (বধূ /*পদাতিক*, ১/২৮)

গ. আজকে এপ্রিল মাস, –(চৈত্র না ফাল্গুন ?)
ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়াইয়েরা ভণে। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

ঘ. বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী,
মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাসা বাঁধি,
কেবলি নিষ্ফল বাদ্য ছিদ্রময় ঢাকে,
পুরনো অভ্যাসবশে চিরুনির পণ্ডশ্রম টাকে। (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৮)

ঙ. সব্যসাচী আমি বিনা অস্ত্রে বাজি মাৎ–
ভেদাভেদ নামেমাত্র ডাইনে আর বাঁয়। (চলচ্চিত্র/*চিরকুট*, ১/৫৪)

উদ্ধৃতিগুলোতে সুভাষের শাণিত ব্যঙ্গের লক্ষ্য কে বা কারা, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। তাঁর পরবর্তী কাব্যসমূহে ব্যঙ্গাত্মক বাকভঙ্গির প্রয়োগ ক্রমশ কমে এলেও মাঝে-মাঝেই তাঁর কবিতা এই ভাষায় সমকালীন সমাজব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিকে চিত্রিত করেছে।

রাজনৈতিক অনুষঙ্গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। আধুনিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন মানুষই যেহেতু বিশ্বনাগরিক, তাই বিশ্বব্যাপী সংঘটিত নানাবিধ ঘটনা প্রগতি-চেতনাঋদ্ধ সুভাষের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে বিলোড়িত করেছে। বিশেষ করে মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রভাবে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে কবিতার প্রকরণ-প্রকৌশলেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মার্কসবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছে বলে আমরা জানি। তাঁর কবিতায় পাই মার্কসবাদের নির্যাসরূপী কয়েকটি প্রবল অনুভূতি আর মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক অনেক ঘটনার উল্লেখ (সুবীর রায়চৌধুরী ২০০৩ : ২০৪)।

যে ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান হয়ে থাকে, কবির মেধা ও মননের স্পর্শে তা-ই যদি অস্পষ্ট ও স্পর্শাতীত হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ভাষা তার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। প্রগতির ভাষা পরস্পরকে সম্পৃক্ত করে, সন্নিহিত করে – মার্কসবাদী সুভাষের বাক্‌রীতি নির্মাণে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন স্পষ্ট। রাজনৈতিক অনুষঙ্গ তাঁর কবিতার ভাবগত সর্বজনীনতা হারিয়েছে– সমালোচকদের এই রকম অভিযোগ সত্ত্বেও 'এটাকে বাদ দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার স্বাদ পাবার যে কোন রকম বিমূর্ত চেষ্টা নখ তুলে দিয়ে হাতকে সুন্দর করার চেষ্টা মাত্র' (জমিল শরাফী ১৯৭৫ : ১০)[৬] এবং প্রাকরণিক বিচারে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ যে তাঁর কবিভাষায় অভিনবত্ব এনেছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। রাজনৈতিক বক্তব্য বা ভাষণের কাব্যরূপ দেয়ার কাজটি সহজ নয়, কারণ তাতে ভাষার ওপর নিবিড় দখল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই ধরনের কবিতায় কবি সহজ সরল শব্দের ভেতর এমন শক্তি সঞ্চার করেন যে, পাঠকের চিন্তাজগতে নতুন অনুভব সঞ্চারিত হয়। প্রসঙ্গত কয়েকটি রাজনৈতিক কবিতা বিবেচনা করা যেতে পারে–

ক. শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন-দিবস; লালপাগড়ি মোতায়েন;
আতঙ্কিত অন্তরাত্মা; ইষ্টনাম জপে রক্তচক্ষু মাড়োয়ারি;
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন;
... ...
ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস; পরিচ্ছন্ন স্থান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে;
(সাবাস বল্লভভাই! প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক!)
হাজরা পার্কে সভা কাল; নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ ॥ (দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

খ. স্তালিন জীবন হোক। আজ থেকে
মৃত্যুহীন জীবনের
নাম হোক
কমরেড স্তালিন ॥ (কমরেড স্তালিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫২)

গ. লেনিনকে আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি ধর্মতলায়
ট্রামের গুমটির একপাশে।
আঁস্তাকুড়ের ভাত একদল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে
ডাস্টবিনে হাত চালিয়ে দিয়ে।
লেনিন দেখছেন। (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই* ৩/২৫৪)

উদ্ধৃতিসমূহে সুভাষের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়ার জনগণের ভাগ্যবদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে লেনিন প্রগতিশীল রাজনীতিচর্চার আদর্শে পরিণত হয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মৃত্যুযন্ত্রণা উদ্ধৃতি ক-এ চারুকৃত। কিন্তু শব্দপ্রয়োগে এমন অনায়াস, অবিচলিত ভঙ্গির সঙ্গে পাঠকের এই যেন প্রথম পরিচয়। মহাত্মা গান্ধীর চিবুক নেড়ে দেওয়ায় বল্লভভাইয়ের প্রশংসা এমন বাকভঙ্গিকে আশ্রয় করেছে যে, রাজনৈতিক অনুষঙ্গ অবলীলায় ঘরোয়া বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আর সাম্যবাদী মতাদর্শে কবির পক্ষপাত এমন নির্বিকার অথচ মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, শপথের এই নির্মোহ কৌশল বিপথগামী মানুষকে বিচলিত করে তোলে। উদ্ধৃতি খ-এ কমরেড স্তালিন প্রগতিপন্থীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্তালিনের কর্মময় জীবনকে স্মরণ করে কবি বলেছেন, 'মরুতে ফুল ফুটিয়ে, /নদীতে মিলিয়ে নদী/আমাদের হাতে তুমি রেখে গেলে নতুন জীবন'। তাই মৃত্যুহীন স্তালিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি ঘোষণা করেন, 'আমাদের হাতে তুমি দিয়ে গেলে /এ পৃথিবী, /তোমার নিশান'। কবির রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের এই ধরন পাঠককেও কলাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। উদ্ধৃতি গ-এ কবি লেনিনকে কলকাতার ধর্মতলার ট্রামের গুমটির পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। আর তাঁর চোখের সামনে এমন সব দৃশ্যপট উপস্থিত করেন, যেখানে চিত্রিত হয় মানবেতর জীবন। ধনতন্ত্রের শোষণে মানুষকে ডাস্টবিনের খাদ্য কুড়িয়ে খেতে হয়। আর অসহায় লেনিনকে এই মর্মঘাতী ঘটনার সাক্ষি হিসেবে উপস্থিত করে সুভাষ মূলত সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অভাবে জনজীবনে যে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই তুলে ধরেছেন। ফলে লেনিনকে দেখতে হয়েছে গ্রাম থেকে চিকিৎসার জন্যে আসা মানুষটির পকেটমারের হাতে সর্বস্বান্ত হওয়ার দৃশ্য, বেঁচে থাকার তাগিদে নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে দেয়া একটি মেয়ের গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাই তোলা ইত্যাদি দৃশ্য। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই দিকে নজর দিয়েছেন, যেখানে 'লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে'। এভাবেই কবি তাঁর আশাবাদকে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফেরাতে শেখান। মানুষের মুক্তি মার্কসবাদেই নিহিত– এই বিশ্বাসই সগর্বে ঘোষণা করেন কবি, 'আমার মনে হল, লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, /শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে –/একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে'। উদ্ধৃতিসমূহের বাক্‌ভঙ্গি লক্ষ করলে সুভাষের রাজনৈতিক বিবেচনা কবিতার ভাষাকে কীভাবে নতুন মাত্রা দিয়েছে তা অনুধাবন করা যায়। মতাদর্শের মর্মবাণী অসাধারণ সরলতায় উপস্থাপনের ফলেই তা সাধারণের জীবনবোধকে আলোড়িত করতে পেরেছে।

রাজনৈতিক কারণেই কবিতা কখনো কখনো চড়া গলার সুরকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কখনো-বা শ্লোগানের ভঙ্গি রপ্ত করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্লোগান বা দেয়ালে লেখার উপযোগী যেসব পঙ্‌ক্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। কবিতার নামকরণে কবির এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. ভোটের আগে কী যে সজ্জন।
ভোটের পর কী যে গর্জন ॥ (দেয়ালে লেখার জন্যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৩)

খ. এদিকে পাণ্ডা সর্বহারার

Dhaka University Institutional Repository

কুড়োন টাকা বাড়িভাড়ার ॥ (দেয়ালে লেখার জন্যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৩)

গ. লক্ষ্মীর চেলামুণ্ডাদের উৎপাতে।
সরস্বতী দাঁড়ান এসে ফুটপাতে ॥ (কিংবদন্তী/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৪)

ঘ. খাচ্ছি গাছের খাচ্ছি তলার
সংসদে জোর দেখাই গলার ॥ (কিংবদন্তী/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৪)

ঙ. গৌরীসেনের বাপের টাকায়।
বাছাধনেরা ফলার পাকায় ॥ (কিংবদন্তী/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৪)

চ. রাজা করবার লোভ দেখালেও ডাইনী
প'ড়ো না কো, দাদা, প্যাঁচে।
শেষকালে ওই কেড়ে নেবে মই
চড়িয়ে তোমাকে গাছে ॥ (দেয়ালে লেখার জন্যে/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৫)

ছ. ঠোঁটকাটা জব্দ কানকাটার কাছে।
উজির জব্দ পুঁজির কাছে ॥ (দেয়ালে লেখার জন্যে/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৫)

জ. মন্ত্রী মশাই করেন কী ?
পরের ধনে পোদ্দারি। (দেয়ালে লিখন/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৪)

ঝ. হাকিম সাহেব করেন কী ?
খোদার ওপর খোদকারি। (দেয়ালে লিখন/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৪)

ঞ. গণতন্ত্রে এটাই মজা।
আজ যে রাজা, কাল সে প্রজা ॥ (দেয়ালে লিখন/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৫)

ট. কান-কাটাদের রাজ্যে।
ঠোঁটকাটারা যাই বলুক না
আনে না কেউ গ্রাহ্যে ॥ (দেয়ালে লিখন/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৫)

উদ্ধৃতি আরো বাড়ানো যেতে পারে। কবির জীবনবীক্ষার নির্যাস এভাবেই খেলার ছলে পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়েছে। উদ্ধৃত অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই সমকালীন রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃতি খ-এ কবি সর্বহারাদের নেতার সম্পদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাম্যবাদী রাজনীতিকের ভণ্ডামিকে বিবৃত করেছেন। উদ্ধৃতি গ-এ কবি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে লক্ষ্মীর অর্থাৎ, বিদ্যার চেয়ে ধনের আধিপত্যের ছবি এঁকেছেন। কবির সমাজবীক্ষা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের স্মারক এইসব পঙ্‌ক্তি এমন এক বাক্‌ভঙ্গিকে অনুসরণ করেছে যা অবচেতনভাবেই পাঠককে দৈনন্দিন জীবনের নানা অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অনুপ্রাণিত করে। অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দেয়ার এই অভিনব কৌশল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

এই বাক্‌ভঙ্গির সমান্তরালেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় মৃদু লয়ের কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আত্মোপলব্ধির শিল্পরূপ দিতে গিয়ে কখনো কখনো স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথা বুনে গেছেন তিনি। দু'য়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো
পাহাড় থেকে
ক্লান্ত চোখে। (এখানে/*পদাতিক*, ১/৩৯)

খ. নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান–
মাঠের সম্রাট দেখে দিগন্ত নেত্রে
ধান আর ধান ॥ (স্বাগত/*চিরকুট*, ১/৭০)

গ. এখুনি
বাসন-ধোয়া জলে
নিজের মুখ দেখবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরও একটি সকাল। (আমরা যাব/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৭)

উদ্ধৃতিসমূহে কবি আপন মনে যেন নিজের সঙ্গেই কথোপকথনে মগ্ন। এই ভাষাভঙ্গির দৃষ্টান্ত সুভাষের যে কোন কাব্যগ্রন্থ থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব। সুবীর রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে আমি তিনটি সুর শুনতে পাই : ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ সুর, চড়া গলার সুর, স্বগতোক্তির মৃদুতর সুর। সুরত্রয়ের সর্বত্র এক অটল প্রত্যয় লেগে আছে, সে-প্রত্যয় মূলতঃ কবির রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কিন্তু কাব্যের স্তরে এসে সে-প্রত্যয় কোনো দার্শনিক তর্কাতর্কির সামিল হয় নি, স্বকীয় বেগভারে পৌঁছেছে অনুভূতির ও মনঃশক্তির সরল সাযুজ্যে। আজকের দ্বিধাবিক্ষুব্ধ চিত্তাবস্থার যুগে এই দৃঢ় প্রত্যয় যেন জঞ্জালতাড়ানো হঠাৎ-হাওয়া, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও– তখনকার ফলিত জীবনে যে রাজনৈতিক মতই চলুক না কেন– কবিপ্রত্যয়ের এ হেন বলিষ্ঠতা ও সারল্য কাব্যানুরাগীকে আনন্দ দেবে' (সুবীর রায়চৌধুরী ২০০৩ : ২০৮)। সমালোচকের এই বিশ্লেষণ যুক্তিযুক্ত বলেই আমাদের মনে হয়।

যুগ যুগ ধরে মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর আধুনিক জীবনবোধকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। এ কারণে কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন। কখনো প্রবাদের অবিকল উপস্থাপনের সাহায্যে তিনি পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত সত্যের সঙ্গে সমকালীন জীবনবাস্তবতার সাধর্ম্যকে চারুকৃত করেছেন; কখনো-বা প্রবাদকে ভেঙে কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। প্রচলিত প্রবাদের অংশবিশেষ উল্লেখ করে কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। একই কবিতায় একাধিক প্রবাদের ব্যবহার করেছেন তিনি, কখনো আবার দুইটি প্রবচনের বিপ্রতীপ ক্রম কবিতায় অভিনব শক্তি সঞ্চার করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে –

ক. আদার ব্যাপারী, তাই বুঝি না জাহাজের হালচাল কিছুই। (কিংবদন্তী/*পদাতিক*, ১/৪৪)

খ. কুকুরের মাংস কুকুরে খায় না। (রাম রাম/*অগ্নিকোণ*, ১/৯১)

গ. হেরেছি ? তাতে কী ?/কখনো যায় না শীত/এক মাঘে। (রংরুট/*যত দূরেই যাই*, ২/৯০

ঘ. দেখুন, ও যে-গাছের আঙুর/তাতে টক না হয়ে যায় না।
তাছাড়া এও তো ঠিক/সব বেড়ালের ভাগ্যেই/শিকে ছেঁড়ে না। (এখন যাব না/*যত দূরেই যাই*, ১/৯১)

ঙ. সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না/আড় হয়ে লাগতে হবে। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

চ. সে পেয়েছে শিবতুল্য বর (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৬৪)

ছ. নইলে শিব গড়তে গিয়ে/হয়ে যেত নিশ্চয় বাঁদর। (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৬৪)

জ. বাদশা আর মেমসাহেবা/গাছে তুলে মই কাড়ছ এখন বারে বা!(রোমাঞ্চ-সিরিজ/*এই ভাই*, ২/২০৮)

ঝ. কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আর যাই হোক সব/ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয় (ছেলে ধরা/*জল সইতে*, ৩/৩৩৭)

ঞ. এড়াব সফর –/ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো শরীরটা দেখিয়ে। (চইচই-চইচই/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯১)

ট. সাবধানের জানোই তো, মার নেই (চইচই-চইচই/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৩)

ঠ. তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকা বুড়ো (অগত্যা/ *চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৪)

ড. হাতের লক্ষ্মী/পায়ে ঠেলে/যার যেমন ঠাঁই/যার যেমন খাঁই (তোমার যদি কম হয়/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৭)

ঢ. ধর্মের কল বাতাসে নড়ার ভঙ্গিতে/...বসিয়ে দেওয়া হল (খালি পুতুল/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮৪)

ণ. চোরের মায়ের খুব ফুর্তি রে দাদা (টানা ভগতের প্রার্থনা/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৯৬)

ত. শুধুই পাওয়া এবং শুধু নেওয়া/সবুরে ফলে মেওয়া (দে-দোল/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪৪)

থ. শিকে ছিঁড়লে বেড়ালের ভাগ্যে/করবে সবাই আপনি-আজ্ঞে (মুক্তকণ্ঠে বহুবচনে/*ধর্মের কল*, ৫/২২২)

দ. পিঁপড়ে খাবে লাভের গুড়/পঙ্‌ক্তিভোজের পাতায় (হাল ছাড়া/*ধর্মের কল*, ৫/২২৯)

ধ. পাকাধানে মই দেওয়া (হচ্ছেটা এই/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৫)

ন. পরের ধনে পোদ্দারি/... খোদার ওপর খোদ্‌কারি। (দেয়ালে লিখন/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৪)

প. সব শেয়ালের এক রা। (লোকে বলে/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৬)

ফ. একরত্তি বিষ নেই তার/কুলোপনা চক্কর। (লোকে বলে/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৭)

ব. স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। (লোকে বলে/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৭)

ভ. হিজলি কাঁথি দাঁতন ঘাটাল/কিলিয়ে কেউ পাকায় কাঁঠাল ? (শিঘ্রি শিঘ্রি/*ধর্মের কল*, ৫/২৭০)

ম. আলু সেদ্ধ বেগুনপোড়া।/ঘোড়া দেখে যে হলি খোঁড়া ॥ (৬/*মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো*, ৫/২৭৮)

য. অনন্তমূল তোপমারি।/ঝোপ বুঝে ঠিক কোপ মারি ॥ (৪৭/*মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো*, ৫/৩০২)

র. কাকাতুয়া ময়না।/কচুপাতায় জল সয় না ॥ (৪৮/*মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো*, ৫/৩০৩)

উদ্ধৃতিসমূহে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলো কবির প্রগতিশীল বিশ্ববীক্ষার অনন্য স্মারক হয়ে উঠেছে। প্রতিটি দৃষ্টান্তেই কবির কথ্য ভাষাভঙ্গি প্রবাদের ব্যবহারে আরো সজীব ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। অল্পকথায় গভীর ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে ব্যবহৃত এইসব প্রবচন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি সামাজিক রীতিনীতি, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার সারবত্তাকে ধারণ করে কবির বক্তব্য কখনো তীর্যক হয়ে উঠেছে, কখনো আবার তা কবিতার ভাষাকে দান করেছে তীক্ষ্ণতা। প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে কবির দূরসঞ্চারী জীবনদৃষ্টিকে সমন্বিত করে সমকালীন নানা সমস্যা ও সংকটের শব্দচিত্র নির্মাণের এই কৃতিত্ব অসাধারণ।

বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধির প্রয়োগে কবিতার ভাষা সরল ও সবল হয়ে ওঠে। কথ্যভঙ্গির নিকটবর্তী না হলে কাব্যশরীর বাগ্‌ধারাকে ধারণ করতে পারে না। এ সম্পর্কে হার্বার্ড রীড এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে–

> Idioms arise out of the contacts of daily life. They are the response of the human organism to the elements around it. They reflect the speed of life, the pressure of life, its very essance (Herbert Read 1950 : 55-56).

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদের মতোই বাগ্‌ধারা ব্যবহারেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। তাঁর সমাজচিন্তার পরিচয় বাগ্‌ধারা বা 'ইডিয়ম' প্রয়োগে যেমন ধরা পড়ে, তেমনি সমাজের নানা স্তরের মানুষের প্রবণতাসমূহকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যাক –

ক. রাবণের চিতা
দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে ॥ (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৬)

খ. রাবণের চুল্লির সামনে লাইনবন্দী হয়ে
ধর্না দিচ্ছে
লালগাড়ি-পাশ-হওয়া
ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ
অপাপবিদ্ধের দল (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৯)

গ. ভাশুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে চুনকালি মাখাত। (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

ঘ. কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আর যাই হোক সব
ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়! (ছেলে ধরা/*জল সইতে*, ৩/৩৩৭)

ঙ. ধম্মপুত্তুর দারোগা
বাগে পেলে মারে ঘা ॥ (রক্ষাকবচ/*জল সইতে*, ৩/৩৪৫)

চ. কেল্লা ফতে ক'রে দিতে পারত। (কেল্লা/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৮)

ছ. মনে হল, এ তো তোমারও হাতের পাঁচ
তেরে কেটে ব'লে, বাপ রে, কী তুড়ি লাফ! (দেয়ালে লেখার জন্যে/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৫)

উদ্ধৃতিসমূহে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বাগ্‌ধারাই কবির জীবনদৃষ্টি ও সমাজবীক্ষার পরিচয় বহন করে। মানুষের নানাবিধ যন্ত্রণার চরম অবস্থাকে কবি রাবণের চিতার উল্লেখে মূর্ত করে তোলেন। উদ্ধৃতি ক ও উদ্ধৃতি খ-এ দুর্বিষহ জীবনযাত্রার দীর্ঘ বর্ণনার পরিবর্তে কবি 'রাবণের চিতা' শব্দযুগলের আশ্রয়ে বর্ণনাতীত কষ্টকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে অবাধ্য বউয়ের প্রতি শাশুড়ির ক্ষোভ এবং অত্যাচার-পীড়িত কালো কুৎসিত পুত্রবধূর আত্মহত্যা-পরবর্তী নানা রকম ঝামেলার আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে। বংশে চুনকালি দেয়ার এই প্রক্রিয়ায় বউয়ের প্রতি শাশুড়ির বিরক্তি ও নির্যাতন বরং বেড়েছে। এভাবে বউ-শাশুড়ির তিক্ত সম্পর্কের মতো একটি সামাজিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন কবি। উদ্ধৃতি ঘ এবং উদ্ধৃতি ঙ যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠতার বিপ্রতীপ অবস্থাকে তুলে ধরেছেন 'ধর্মপুত্তুর' শব্দের মাধ্যমে। আর কেল্লা ফতে করে দেয়ার (উদ্ধৃতি চ) অনুষঙ্গে কবি ঝুঁকি নেয়ার ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানো বা কার্যসিদ্ধি লাভ করার সম্ভাবনাকে চিত্রিত করেছেন। মঞ্চে বসে পুতুলনাচ দেখতে দেখতে অধৈর্য দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় শিল্পীর সর্বশেষ প্রচেষ্টার পরিচয় ধরা পড়েছে উদ্ধৃতি ছ-এ। এভাবেই কবির জীবনভাবনা প্রচলিত বাগ্‌বিধির মাধ্যমে শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত আরো কিছু বাগধারা বা ইডিয়ম-এর উল্লেখ করা যাক–

পাততাড়ি, সর্ষেফুল, পোয়াবারো, গৌরীসেনী টাকা (পদাতিক), নিধিরাম সর্দার, আকাশ কুসুম (অগ্নিকোণ), পটল তোলা, সাত পাঁচ (ফুল ফুটুক), পাজীর পাঝাড়া (যত দূরেই যাই), তালপাতার সেপাই (কাল

Dhaka University Institutional Repository

মধুমাস), কেতাদূরস্ত, অক্কা পাওয়া, ঘুঘুর ফাঁদ (এই ভাই), মুসকিল আসান (চইচই-চইচই) ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় রূপকথা, লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোকাচার – লোকসংস্কৃতির এসব উপাদানের সঙ্গে আধুনিক জীবনবীক্ষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। গল্পের প্রতি বাঙালির সহজাত আকর্ষণকে সফলভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে যা পুরোপুরি রূপকথা বা লোককথার ঢঙে নির্মিত। আবার কিছু কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে লোককাহিনীর স্মরণ নিয়েছেন। গল্পের ভঙ্গিতে কাব্যরচনার এই কৌশল তাঁর কবিতাকে যেমন নির্ভার করেছে, তেমনি পাঠকের স্মৃতিতে এর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। পুরো কবিতা লোককথা বা রূপকথার অবয়বে নির্মিত হয়েছে এমন কয়েকটি কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. অন্ধকার পিছিয়ে যায়/দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহাড়া দেয়/পারুল বোন আমার –
দেখি তো কে তোমার পায়/বেড়ি পরায় আবার ? (পারুল বোন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৫)

খ. এক যে ছিল রাজা–/রাজত্বটা মস্ত
উঠতে বললে উঠত লোকে/বসতে বললে বসত। (এক যে ছিল/*ফুল ফুটুক*, , ১/১৫৯)

গ. 'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে .../দেখি বনের মধ্যে /আলো-জ্বলা প্রকাণ্ড এক শহর।
সেখানে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি,/আর সিঁড়িগুলো সব/যেন স্বর্গ উঠে গেছে।/তারই একটাতে
দেখি চুল এলো ক'রে বসে আছে/এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।' (যেতে যেতে/*যত দূরেই যাই*, ২/৬৭)

ঘ. সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর/রাজ্যে দিল হানা
পাথরচাপা কপাল যার সেই/ ঘুটেকুড়ুনির ছানা
...দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার/কলের ডুলি
এই গল্পে ভর্তি ক'রে/ঠাকুরমার ঝুলি ॥ (ঠাকুরমার ঝুলি/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৪৯)

উদ্ধৃতিসমূহে প্রচলিত লোককাহিনীর অবয়বে কবি সমকালীন নানা সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন। উদ্ধৃতি ক-এ সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের গল্প এবং ষড়যন্ত্রী বিমাতার অত্যাচারের কাহিনীর অন্তরালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের নেতা ইলা মিত্র পাক-স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে চরম নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে সে সময় কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। কারাবন্দি ইলা মিত্রের ওপর রাজনৈতিক অত্যাচার আর তাঁর সহযোদ্ধাদের অপেক্ষার পালা –এই চিত্র ধরা পড়েছে কবিতাটিতে। তাঁর সহযোদ্ধারা রূপকথার সাত ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন । তাই কবি বলেন, 'শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে/পারুল বোন আমার ॥' (পারুল বোন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৫)। 'সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে/পারুল বোন রইল কাছে' (ঠাকুরমার ঝুলি/ *একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫০)-এর মাধ্যমেও তিনি 'সাত ভাই চম্পা'র লোককাহিনীর রূপকল্পে অস্থির সময়কে ধরার চেষ্টা করেছেন। উদ্ধৃতি খ-এ গল্পের রাজার রূপকল্পে স্বৈরশাসকের দম্ভ এবং তার পরিণতি দেখানোর চেষ্টা লক্ষ করা যায়। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি গল্পের সম্মোহনে পাঠক বা শ্রোতাতে বেঁধে নিয়ে সমকালীন নানা সমস্যা চিত্রিত করেছেন। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পগুলিতে রয়েছে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে গল্পের নায়কের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা। উদ্ধৃতি ঘ-এ সুভাষ আধুনিক জীবনদৃষ্টি দিয়ে অপরাধপ্রবণ সমকালকে রূপকথার আবহে উপস্থাপন করেছেন। কবি সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী মানুষকে 'সুয়োরানী'র সমর্থক হিসেবে দেখেছেন, আর বঞ্চিত, বিড়ম্বিত মানুষগুলো আজ

Dhaka University Institutional Repository

'ঘুঁটেকুড়ুনির ছানা'।

বেশ কিছু কবিতায় লোককথা বা রূপকথার কোন ঘটনার ইঙ্গিত বা কোন চরিত্রের উল্লেখ করে কবি তাঁর কবিতার প্রকরণে অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে সমকালীন নানা প্রসঙ্গকে সম্পৃক্ত করায় কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে স্বাভাবিকত্ব এবং সংহতি। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যাক –

ক. 'যা রে /সাপের বিষ/দিয়েন বিয়েন/ফুঃ' (দিয়েন বিয়েন ফুঃ/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৮)।

খ. আমাদের প্রাণভোমরাগুলো বড় বড় খোলের মধ্যে ভ'রে
সরু সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; (উত্তরপক্ষ/*এই ভাই*, ২/১৭০)

গ. রাক্ষসদের হাড় একদিকে, মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ/থমকে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে।
রামলক্ষ্মণের চুলোচুলি। (ভালো লাগছে না/*এই ভাই*, ২/১৯৫)

ঘ. তার কাছে নেই/বাইরে ডানা-কাটা পরী/ভেতরে রাক্ষসী (সফরী/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২৪)

ঙ. একবার ক'রে গেলে,/একবার ক'রে উগ্‌রে দেয়/এক রাক্ষুসী সময় (অন্ধকারে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮১)

চ. মুখোসে ফোটানো/রাক্ষসখোক্কস দৈত্যদানো (খেলা/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮২)

ছ. চোখে যাদের দেখেছিলাম/আলাদিনের আলো
দীনদরিদ্র বন্ধুরা সব/অখ্যাত নাম/তারা কোথায় গেল ? (*দে-দোল/যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪৫)

জ. কী-হয় কী-হয় সারাদিন/প্রদীপ খোঁজে আলাদিন। (পিক-এ/*ধর্মের কল*, ৫/২৬৫)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহে রূপকথা ও লোককথার নানা অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে কবিতাকে যেমন কথনভঙ্গির নিকটবর্তী করেছে, তেমনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমকালকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও তা পালন করেছে দূরসঞ্চারী ভূমিকা। কবির আধুনিক জীবনবীক্ষা বিরূপ-বিপন্ন-বিচলিত সমকালকে চিহ্নিত-চিত্রিত করতে লোককাহিনী ও রূপকথার মোড়ক কবিতার প্রকরণে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

কবিতার শব্দ-সংগঠনে মেয়েলি ঢঙ সৃষ্টি করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় কথোপকথন বা আড্ডার আবহ নিয়ে এসেছেন কখনো কখনো। 'মেয়েলি জগতের সঙ্গে এই কবির আত্মীয়তার একটা দিক– মেয়েদের নানান আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ। ভাইফোঁটা, আঠকৌড়ে, সাধ, গায়ে হলুদ – এইসব মেয়েলি অনুষ্ঠান নানান তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়।'[৭] দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমাদের মেয়েদের উচ্চারিত কতিপয় শব্দ কবিতায় প্রাণসঞ্চার করেছে। শব্দের প্রতি কবির এই সচেতন স্নেহ কবিতার ভাষাভঙ্গিতে নতুনত্ব এনেছে। কখনো কবি, আবার কখনো বা কবিতায় বর্ণিত কাহিনী বা গল্পের কথক এতে অনায়াসে পাঠকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন। এই মেয়েলি ভাষাভঙ্গির কারণেই সুভাষের কবিতায় কখনো কখনো সৃষ্টি হয় অভিনব ভাবকল্প। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করা যাক –

ক. সোনা আমার মানিক আমার/বাছা রে, কী পেলে তুই খুশি হবি,
কী নিবি/নতুন এই বছরে ? (নতুন বছরে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪১)

খ. যে মেয়েকে স্বামী নেয় না /যমেরও অরুচি –
ছি ছি! /আবার তার ছেলে হবে! (ড্যাং ড্যাং ক'রে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬১)

গ. চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল

Dhaka University Institutional Repository

আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৩)

ঘ. মিনসের আক্কেলও বলিহারি!/কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুণে
পায়ে ক্ষুরঅলা ধিঙ্গি মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

ঙ. কেন ? অসুখ করে মরলে কী হয় ?/ঢঙি আর বলেছে কাকে! (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

চ. মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে দ্যাখ/বলছে আ মর মিন্‌সে (হিংসে/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০৫)

ছ. আমি সইয়ের/গঙ্গাজল হই/শালুক ফুল/আমার সই (দিকভুল/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫৫)

উদ্ধৃতিগুলোতে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বাঙালি নারীর বাচনভঙ্গি থেকে গৃহীত। উদ্ধৃতি ক-এ 'সোনা আমার' এবং 'বাছা রে' শব্দবন্ধ কবিতাটিতে আন্তরিকতার আবহ এনেছে। বাঙালি মায়েরা এভাবেই তাদের স্নেহের সন্তানদের সম্বোধন করে বুকে জড়িয়ে নেয়। ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশের মেয়েলি শব্দ 'ছি ছি!' উদ্ধৃতি খ-এ নতুন ব্যঞ্জনা এনেছে। উদ্ধৃতি গ-এর 'আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি'– এই পঙ্‌ক্তির 'প্রজাপতি' শব্দটি ছাড়া সবগুলোই মেয়েলি ঢঙ-এর পরিচায়ক। একটি কালো মেয়ের প্রতি শাশুড়ির অবজ্ঞা এবং ছেলেকে এমন অলক্ষুণে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার কারণে নিজের স্বামীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশের যে ভাষা উদ্ধৃতি ঘ-এ ব্যবহৃত হয়েছে, তা মেয়েদের মুখের ভাষারই অবিকৃত রূপ। উদ্ধৃতি ঙ-এর 'ঢঙি', উদ্ধৃতি চ-এর 'মুখপুড়িটা' ও 'মিনসে' এবং উদ্ধৃতি ছ-এর 'সই' মেয়েদের বাকভঙ্গিকেই মূর্ত করে তুলেছে। সুভাষের এই ভাষাবৈশিষ্ট্য কবিতার বক্তব্যের অনুসরণেই অনিবার্যভাবে নির্মিত।

সম্বোধনের ক্ষেত্রেও সুভাষ প্রচলিত বাকভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। সম্বোধন ভাষায় যেমন সজীবতা আনতে পারে, সম্পর্কের উন্নয়ন বা নতুন সম্পর্ক সৃষ্টিতেও তেমন প্রভাব ফেলতে পারে। কখনো সম্বোধনের ভাষা এমন হয়ে ওঠে যে, তা শপথের ভঙ্গিতে পাঠককে আলোড়িত করে। ভাষাকে সাধারণের কথনভঙ্গির কাছাকাছি পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা রয়েছে। 'দৈনন্দিনের মধ্যে যেখানে ক্লান্তি পৌনপুণিকতা সবাই দেখে, কবিতার জগতে, শিল্পের জগতে মুক্তি চায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেখানে কবিতাকে বসান দৈনন্দিনে, ঐ প্রত্যহের জগতই তাঁর কাছে কবিতা।'[৮] ফলে আটপৌরে শব্দের শরীরে তিনি জুড়ে দেন অপরূপ লাবণ্য। সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> সুভাষ প্রায় মুখের ভাষার কাছাকাছি একজাতীয় কবিভাষা আয়ত্ত করেছেন যা নিরাভরণ ও শাণিত, প্রাত্যহিক জীবন থেকে তুলে আনা রূপকল্পে রূপময় ও গতিবান। পরিমিত শব্দে, ছন্দের নিগূঢ় তাৎপর্যে পাঠককে আকৃষ্ট করেন ও অভিভূত করেন (উত্তম দাশ ১৯৯১ : ৩০)।

সম্বোধন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সুভাষের এই চেষ্টা চোখে পড়ে। আবেগের উত্তাপ বা উষ্ণতা সম্বোধনে সপ্রাণ হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে –

ক. বাপু হে, বড়ই খারাপ পড়েছে/দিনকাল। (ডাইনে বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৯)

খ. আরে! মুখুজ্যে মশাই যে! নমস্কার, কী খবর ? (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৬)

গ. ক্যালেন্ডারে হাত দিস নে/যা ভাগ্, বোকা হাবা! (জলছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৬)

ঘ. হে জননী,/আমরা ভয় পাই নি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে/আমরা বিরক্ত। (জননী জন্মভূমি/*কাল মধুমাস*, ২/১২৯–১৩০)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. বন্ধুরা, এবার যেতে পারো/থাকা আর না থাকার মধ্যে
এখন/দোল খাচ্ছে সময়। (রক্তবীজ/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২৮)

বিজ্ঞানের সূত্রকেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় আটপৌরে ভাষাভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞানী Bergson-এর গতিতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ *বলাকা* কাব্যগ্রন্থে প্রয়োগ করে অসাধারণ শিল্পসাফল্য লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, সুভাষের কবিতায় এই তত্ত্ব অনেকটা অবিকলভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রকাশও এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই ভাবে তিনি দুইটি কবিতায় Bergson-এর গতিবাদ প্রয়োগ করেছেন–

ক. জলে এখন
টান খুব
বসে রয়েছি পাড়ে
এক নদীতে দুবার
দেওয়া যায় না ডুব (ফিরি/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২০)

খ. বেকুব
বদলে যাচ্ছে দিন।
জানে না সে, এক নদীতে দুবার
দেওয়া যায় না ডুব ॥ (বদলাচ্ছে দিন /*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৩৬)

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তত্ত্ব তিনি এমন ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, তা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনাভিজ্ঞতারই স্মারক হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই বর্ণনাভঙ্গিতেই কবিতাকে 'সর্বত্রগামী' করে তুলতে চেয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বাক্‌রীতির উপরিউক্ত দিকসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি কবিতায় দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গকে যেমন ধারণ করেছেন, তেমনি বলার ভঙ্গিটিকেও নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন মানুষের সাধারণ কথনবৈশিষ্ট্যের আলোকে। 'সুভাষকে চেষ্টা করে নিজের কাব্যভাষা তৈরি করতে হয়নি। সাধারণের মুখের ভাষা কেটে-ছেঁটে নিজের করে নিয়েছে'– ইতিহাসবিদ নীহারঞ্জন রায়ের এই মন্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত।[৯] ফলে কবির সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন পাঠক। বিশেষ করে যাঁরা সুভাষের প্রগতিশীল সমাজভাবনায় নিজেদের উজ্জ্বল আগামীতে অবলোকন করেছেন তাঁদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছেন তিনি। মুখের ছিপছিপে, সরু কথাকে প্রায় বেতের মতো ব্যবহার করেছেন বলেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় প্রাত্যহিকের সুরকে সুদূরসঞ্চারী করতে পেরেছেন।[১০] তাঁর প্রগতিশীল শিল্পদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে যে মানুষ, তাদেরকে জাগ্রত করতে সেই বাক্-রীতিকেই রপ্ত করেছেন তিনি, যে রীতি হৃদয়ের বন্ধনে সুদৃঢ় হয়, সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধনে পরস্পরকে আত্মীয় করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. দেবেশ রায়, 'কথার সেই উৎসে', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, ১৯৯৮, সম্পাদক : শঙ্খ ঘোষ ও অন্যান্য, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৫১।

২. শিশিরকুমার দাশ, 'কবিতার ভাষা : বিপ্রতীপ ক্রম', *কবিতার ভাষা*, ১৯৮৬, সম্পাদক : অঞ্জন সেন, গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা, পৃ.১৬–১৭।

৩. দেবেশ রায়, 'কথার সেই উৎসে', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৩। তিনি *পদাতিক* থেকে *অগ্নিকোণ* পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিভাষাকে সমকালীন বেশ কয়েকজন কবি বিশেষ করে সমর সেন, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব এবং সুধীন্দ্রনাথের কবি-ভাষার সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নি। তিনি বলেছেন –

> সেই শহুরে আদলের কথা বলায় এই 'অগ্নিকোণ' পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সমকালীনদের চাইতে কখনো-বা তুখোর, 'ডায়মন্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা ...একত্রিশে চৈত্রেই চম্পট', 'পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরত দেখায়', 'সাবাস বল্লভভাই!', 'বাপুজি, দক্ষিণ করে আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই', 'সভা-মিছিলে দেখি নি কখনো, বুঝি নি কিছুই কী চিজ ছিলে', 'রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই', আরো কত এমন প্রবাদতুল্য লাইনই তো টোকা যায়। তবু, এমন প্রবাদতুল্য লাইন সমকালীন অন্য কবিদের কবিতাতেও পাওয়া যাবে।

লক্ষ করার বিষয়, দেবেশ রায়ের কাছে সুভাষের কবিভাষা এখানে 'সমকালীনদের চাইতে কখনো-বা তুখোর' এবং উদ্ধৃত সুভাষের পঙ্‌ক্তিসমূহকে 'প্রবাদতুল্য' মনে হলেও তিনি উদ্ধৃতিসমূহে সুভাষের বাক্‌রীতিকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বলে স্বীকার করেন নি। আমাদের বিবেচনায়, দেবেশের এই মূল্যায়ন কিছুটা সরলীকৃত। দেবেশ-উদ্ধৃত সুভাষের পঙ্‌ক্তিসমূহই আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে যে, তাঁর এই বিশেষ বাক্‌ভঙ্গির কারণেই সুভাষ সমকালীন পাঠক ও কাব্যসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

৪. সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছদ্মনামে (সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়) *নিরুক্ত* পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৪৮) *পদাতিক*-এর সমালোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, 'সমাজতন্ত্রী কাব্যের raison d'etre হচ্ছে তার সামাজিক সার্থকতা। সন্ধ্যা ভাষায় (য়?) সে সার্থকতা আসতেই পারে না। তার জন্য চাই প্রত্যক্ষতা এবং শবলতা সংগে সবলতা। সমাজের কবিকে সুবোধ্য হতেই হয়। আমার আশা আছে যে সুভাষও তাই চা'ন। তা হ'লে বাংলা কবিতার জন্য তাঁর কাছে কিছু আশা করবার আছে।' উদ্ধৃত, 'পরিশিষ্ট' সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ২০০৩, *কবিতাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৮২।

৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, *নতুন সাহিত্য*, অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত, ৩ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৫৯। উদ্ধৃত, 'পরিশিষ্ট' সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ২০০৩, *কবিতাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪।

৬. 'জমিল শরাফী' রণেশ দাশগুপ্তের ছদ্মনাম। তিনি ১৯৭৫ সালে *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন*, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ সম্পাদনা করেন, যা প্রকাশিত হয় লালন প্রকাশনী, ঢাকা থেকে।

৭. সুতপা ভট্টাচার্য, 'পুরুষের কলমে নারী', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

৮. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : দৈনন্দিনের কবি', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*,

Dhaka University Institutional Repository

২০০২, দ্বিতীয় প্রকাশ, সম্পাদক : সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ৬৬।

৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়-এর এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন প্রণবরঞ্জন রায়। তিনি বলেছেন –

> ...নানা সময়ের টুকরো টুকরো কথা থেকে তিনি (নীহাররঞ্জন রায়) সুভাষদা সম্পর্কে কী ভাবতেন তার একটা ধারণা আমার গড়ে উঠেছিল। 'পদাতিক', 'চিরকুট'-এর কবির সাধারণের মুখের ভাষাকে দৃঢ়তা দেবার, শাণিত করার, কথা-বলার ভঙ্গিকে ছন্দে ধরার, অর্থবহ ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দ দিয়ে বাক্যবন্ধ রচনার ক্ষমতাকে কবিকৃতির চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করতেন। মনে করতেন, এ বাঙালির মুখের ভাষার সুপ্ত-সম্ভাবনা আবিষ্কার। একটা কথা নীহাররঞ্জন প্রায়ই বলতেন, 'সুভাষকে চেষ্টা করে নিজের কাব্যভাষা তৈরি করতে হয়নি। সাধারণের মুখের ভাষা কেটে-ছেঁটে নিজের করে নিয়েছে।'...পরে 'ফুল ফুটুক', আর 'কাল মধুমাস'-এর কবির দৈনন্দিনকে, তুচ্ছকে, ক্ষুদ্রকে বড়ো কিছুর বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষমতাও নীহাররঞ্জনকে মুগ্ধ করত।...কী পদ্যে, কী গদ্যে সাধারণের মুখের কথার আদলে শব্দ-চয়ন, বাক্য-বন্ধ গঠন, যে যতির রীতি সুভাষদা নিয়েছিলেন, নীহার রঞ্জন মনে করতেন, তা দেশের মানুষ আর মাটির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই আসে। নীহাররঞ্জনের মনে হতো, সুভাষের এ-মমত্ব আবেগসর্বস্ব নয়, কোনো ধারণাপ্রসূত নয়। এর উৎস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।...সুভাষের মধ্যে নীহাররঞ্জন এমন এক ভাষাশিল্পীকে খুঁজে পেয়েছিলেন যাঁর ভাষা-প্রীতির মূলে দেশের জীবন্ত মানুষ (প্রণবরঞ্জন রায়, 'অসমবয়সী বন্ধুত্ব', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২)।

আমাদের বিবেচনায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাক্‌রীতি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়-এর এই মূল্যায়ন খুবই বস্তুনিষ্ঠ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

১০. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 'চল্লিশের কবিতা', *আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস*, ১৯৮৩, সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ. ১২৬–১২৮।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অঞ্জন সেন (সম্পাদিত), ১৯৮৬, *কবিতার ভাষা*, গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা।

২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৮৩, *আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস*, ভারত বুক এজেন্সী, কলকাতা।

৩. উত্তম দাশ (সম্পাদিত, মৃত্যুঞ্জয় সেন সহযোগে), ১৯৯১, আধুনিক প্রজন্মের কবিতা, মহাদিগন্ত, কলকাতা।

৪. জমিল শরাফী (সম্পাদিত), ১৯৭৫, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন*, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, লালন প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৮, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬. সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), সুভাষ মখোপাধ্যায়ের *কবিতা সংগ্রহ*, ২০০৩, প্রথম খণ্ড, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭. সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত), *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, ২০০২, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

৮. Herbert Read, 1950, *Collected Essays in Literary Criticism*, second edition, Reprinted, MCMLiv, Faber & Faber Ltd. London.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার

সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। মানুষ স্বভাবতই অন্যের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়। নিজের কাজ ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে সে অন্যের মনোযোগ দাবি করে। মানব-সভ্যতার ইতিহাস কেবল টিকে থাকার ইতিহাস নয়, ক্রমাগত নিজের অন্তর্গত ভাবনাকে সুন্দরভাবে প্রকাশের মাধ্যমে নানাবিধ ক্ষতির হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে জীবনে গতি-সঞ্চারেরও ইতিহাস। কবিতা যেহেতু জীবনাভিজ্ঞতারই বিশিষ্ট প্রকাশ, যা অন্যের জীবনভাবনাকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে রচিত, তাই কবিতাকেও অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হয়। অলঙ্কার মূলত মানুষের সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসারই শিল্পিত প্রয়াস।

কবিতার ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সংবাদ প্রকাশের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হতে গিয়ে কিছু কৌশল অবলম্বন করে বলেই তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে কবিতা পাঠক-চিত্তে রসানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়। মানুষের হৃদয়ের রসানুভূতিগুলো 'সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্ত বৈচিত্র্যশীল এবং হৃদয়ের গহনে বহুস্থলেই তাহা চিৎস্পন্দন। এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা – এমনকি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎস্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৬৩ : ৬)। কবিতার ভাষা এই অসাধারণত্ব লাভ করার জন্য অনেকাংশে অলঙ্কারের কাছে ঋণী। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, অলঙ্কার সব সময় কবিতার সজ্জায় তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত থাকে না, কবিতার ভাষা কখনো কখনো এমন অবয়ব নির্মাণ করে নেয় যে, অলঙ্কার তার ভাষার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়।[১] কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগ পাঠকের রসানুভূতি জাগানোর যান্ত্রিক কৌশল মাত্র নয়, কবির আত্মিক অনুরণন অনুভূত হলেই অলঙ্কার সার্থক হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক ভাষারই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সেই ভাষার রূপকলা, নান্দনিক স্বাতন্ত্র্য, কাব্যরীতি ও শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে প্রকাশিত হয় (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩১৭)। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে আয়ত্ত করেই কবিতার প্রকরণ-প্রকৌশলে অভিনবত্ব এনেছেন। আবহমান বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব নির্মাণকলা। সুভাষের কবিতার প্রকরণ আলোচনায় অলঙ্কার অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা লক্ষ করব, অলঙ্কারবাহুল্যে তাঁর কবিতা কখনোই শ্লথগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে নি, আমাদের গৃহকর্মনিপুণা বধূটির মতোই প্রাঞ্জল-চঞ্চল-হাস্যময় তাঁর কবিতার ভাষা, যা আপন প্রাণের উচ্ছলতায় অন্যজনের হৃদয়কে কেবল স্পর্শই করে না, একটু নাড়াও দিয়ে যায়। তাই অনায়াসেই পাঠকের রসানুভূতির সাড়া লাভ করেন তিনি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ধ্বনিগত অলঙ্কার আলোচনা করা যেতে পারে। শব্দালঙ্কার কবিতার ভাষায় যোগ করে এমন অভিঘাত যা কবিতাকে সঙ্গীতময়তা দান করে। বিশেষ করে অনুপ্রাসের অনুরণন কবিতায় ব্যবহৃত প্রচল শব্দকে দান করে সম্মোহন-ক্ষমতা, যা সঙ্গীতের মতো পাঠকের কানের ভেতর দিয়ে প্রাণে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ করে তাকে মোহিত করে।[২] বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ কখনো যুক্ত আবার কখনো বিযুক্তভাবে যখন বাক্যে একাধিকবার ধ্বনিত হয় তখন সেই বর্ণের অভিঘাত সমগ্র বাক্যটিকে অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দান করে। সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত অনুপ্রাসের কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

অন্ত্যানুপ্রাস

অন্ত্যানুপ্রাসে কবিতার প্রথম চরণের শেষ শব্দটির সঙ্গে পরবর্তী চরণের শেষ শব্দটির অথবা প্রথম চরণের শেষ শব্দের সঙ্গে তৃতীয় চরণের শেষ শব্দের ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে অন্ত্যানুপ্রাসের আধিক্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে *পদাতিক* এবং *চিরকুট*-এর অধিকাংশ কবিতায় তিনি অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী গ্রন্থসমূহে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার খুবই কম। শেষ দিকের দু'য়েকটি কাব্যগ্রন্থে (বিশেষ করে *যা রে কাগজের নৌকো* এবং *মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো*) এই অনুপ্রাসের প্রতি কবির আগ্রহ লক্ষ করা গেলেও তা মূলত ছড়ার ছন্দকে অনুসরণ করার ফল। কয়েকটি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে ॥ (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা –
তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার
শত্রু পরখ করুক ধার ॥ (গ্রাম্য/*চিরকুট*, ১/৫১)

গ. কে কোনখানে ঘুমোন সেটা
একেবারেই গৌণ
দেখব তিনি কোথায় জেগে
কোথায় নন মৌন (জাগ্রত/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২১)

ঘ. সারাটা শরীরে
আঁচরের দাগ
কাল রাত্তিরে
ডেকেছিল বাঘ। (বাঘ ডেকেছিল/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৬১)

ঙ. ময়দানবেরা সব তাঁবু ছেড়ে এসে
দে-গোল দে-গোল ব'লে ধরবেই ঠেসে। (ময়দানব/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৮)

বৃত্ত্যনুপ্রাস

প্রকৃত অর্থে যে কোন অনুপ্রাসই বৃত্ত্যনুপ্রাস। কারণ ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্তি বা পুনরাবৃত্তি ছাড়া অনুপ্রাস অসম্ভব। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বৃত্ত্যনুপ্রাসের ব্যবহার থাকলেও আমরা লক্ষ করব, তাঁর কবিতার ভাষা অনুপ্রাস-প্রবণতাকে খুব বেশি প্রশ্রয় দেয় নি। ফলে তাঁর কাব্যপাঠে অনুপ্রাসের অনুরণন আলাদাভাবে অনুভূত

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। সুভাষের কবিতা থেকে কিছু বৃত্ত্যনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি –

ক. চিমনির মুখে শোনো সাইরেন–শঙ্খ (মে-দিনের কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)

খ. তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার (গ্রাম্য/*চিরকুট*, ১/৫১)

গ. গোয়েন্দা চোখ ঘোরে সর্বদা লাল দলিলে (ভূতপূর্ব/*চিরকুট*, ১/৫২)

ঘ. প্রেত পল্টন, জালিয়ানবাগ প্রয়াগ আজ (মুখবন্ধ/*চিরকুট*, ১/৫৩)

ঙ. কচি কচি কণ্ঠে দিন আর রাত্রিকে টুকরো টুকরো করে/কারা কাঁদছে (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

চ. একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে (লোকটা জানলই না/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৮)

ছ. প্রকাশ্যে ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া যায় (আশ্চর্য কলম/*কাল মধুমাস*,২/১৩৭)

জ. আনো দিন হাতুড়ির/আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের। (আজকের গান/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫৫)

ঝ. ধার নিলে আর শোধ দেবার নাম করে না। (আজ আছি কাল নেই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০১)

ঞ. ছেঁড়া নামাবলীতে জড়ানো লক্ষ্মীর পাঁচালী (হটাবাহার/*জল সইতে*, ৩/৩২১)

ট. নতুনের মতো নেই তার মৃতসঞ্জীবনী গন্ধের উষ্ণতা। (চইচই-চইচই/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯২)

ঠ. বাইরের জগতে তারা ইচ্ছে করলে ড্যাডাং ড্যাডাং অনায়াসে দিতে পারত
লাফ– (সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৬৩)

ড. ততবার তাকে কেটে ছোট ছোট করে (শতকিয়া/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৩১)

ঢ. রাত তার মনিহারি জিনিস ফেরি করুক (বুড়ি বসন্ত/*ধর্মের কল*, ৫/২২৮)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রাস-প্রয়োগের কৃতিত্ব চোখে পড়ে। কেবল ধ্বনিগত চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুপ্রাসের স্মরণ নেন নি সুভাষ, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তসমূহের অনুপ্রাসমালায় ধ্বনিমাধুর্য ও ধ্বনিতরঙ্গে যে সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিস্ময়কর। উদ্ধৃতি ক-এ 'খ' দু'বার, 'ন' তিনবার, 'ম' দু'বার, 'র' দু'বার এবং 'শ/স' তিনবার ধ্বনিত হয়েছে। একাধিক ধ্বনির বৃত্ত্যনুপ্রাসে সমগ্র বাক্যটি বিস্ময়কর সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বিশেষ করে 'সাইরেন' শব্দটি পুরো বাক্যের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে দুর্দান্ত সম্মোহন। ফলে অনুপ্রাসের আধিক্য অনায়াসে আড়ালে পড়ে গেছে। উদ্ধৃতি খ-এ 'র' তিনবার ধ্বনিত হয়েছে। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'ল' এসেছে চারবার। এছাড়া 'গ' এবং 'ঘ'-এর মধ্যে শ্রুত্যনুপ্রাস পুরো পঙ্‌ক্তিকেই প্রগাঢ়তা দিয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এ 'গ', 'জ', 'ন' এবং 'ল' দু'বার উচ্চারিত হয়েছে এবং 'প' ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার। উদ্ধৃতি ঙ-এর প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'ক' সাতবার এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দু'বার ব্যব্যহৃত হয়েছে। এছাড়া দুই পঙ্‌ক্তিতে 'র' ধ্বনিত হয়েছে মোট ছয় বার। 'চ', 'ণ/ন' দু'বার এসেছে। 'ট' এবং 'ঠ'-এর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে শ্রুত্যনুপ্রাস। অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও 'কাঁদছে' শব্দটি পুরো চরণটির মধ্যে যে কষ্ট ছড়িয়ে দেয়, তাই যেন ঢেকে দেয় অনুপ্রাসের স্বতন্ত্র অবস্থিতি। চ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'গ' চারবার অনুরণিত হয়েছে। ত' এবং 'ল' ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার করে। উদ্ধৃতি ছ-এ 'ক' ও 'প' অনুপ্রাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'য' ও 'ঝ'-এর মধ্যে শ্রুত্যনুপ্রাস। জ-সংখ্যক উদ্ধৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'ন' দু'বার এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'র' ও 'শ/স' চারবার ধ্বনিত হয়েছে। উদ্ধৃতি ঝ-এ 'ধ' দু'বার এবং সেই সঙ্গে 'দ'-এর সন্নিবেশ চমৎকার ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। 'ন' উচ্চারিত হয়েছে তিনবার এবং চারবার রয়েছে 'র'-এর ব্যবহার। দৃষ্টান্ত ঞ-তে 'ন', 'ড়' এবং 'ল' ধ্বনির অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধৃতি ট-এ 'ত' ধ্বনি পাঁচবার, 'ন' ছয়বার, 'ম' দু'বার এবং 'র' তিনবার ধ্বনিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ঠ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে রয়েছে 'ড', 'ত', 'র' এবং 'ল' ধ্বনির অনুপ্রাস। এছাড়া 'প' এবং 'ফ'-এর শ্রুত্যনুপ্রাসের ফলে বাক্যটি ভিন্নতর ধ্বনিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি ড-এ ব্যবহৃত হয়েছে 'ক', 'ছ', ট' এবং 'র' ধ্বনির অনুপ্রাস। ঢ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'ক','ত' এবং 'ন' দু'বার ধ্বনিত হয়েছে। 'র' ধ্বনি প্রযুক্ত হয়েছে পাঁচবার।

ছেকানুপ্রাস

ছেকানুপ্রাসে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ছেকানুপ্রাস অনুপস্থিত নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে –

ক. পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে, (পলাতক/*পদাতিক*, ১/৩০)

খ. 'সবি তো শূন্যেও রঙ্গ!' ফিরঙ্গ পাড়ায় সন্ধ্যা দেখে হাওয়াগাড়ি; (দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

গ. হাতুড়ি বিদ্যুৎগতি! বিস্ফোরক স্ফুলিঙ্গেরা গম্বুজে লাগুক; (দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

ঘ. ভীরগ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত আমি (আর্য/*পদাতিক*, ১/৪৩)

ঙ. বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত; (স্তালিনগ্রাদ/*চিরকুট*, ১/৬৮

চ. কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শিখরে উঠে (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্তভাবে ক্রমানুসারে ধ্বনিত হয়েছে। ফলে পুরো পঙ্‌ক্তিটি সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

শ্রুত্যনুপ্রাস

শ্রুত্যনুপ্রাস বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে ঘটে থাকে। শ্রুত্যনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাসেরই সহকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। এই অনুপ্রাসে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রত্যেক বর্গের প্রথম চারটি ধ্বনি সদৃশ ধ্বনি হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এমনকি প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ণেরও মিল হতে পারে। 'র' কম্পনজাত এবং 'ড়' তাড়নজাত ধ্বনি হলেও উচ্চারণ সাদৃশ্যের কারণে শ্রুত্যনুপ্রাস হয় (নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮ : ৫৪)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শ্রুত্যনুপ্রাসের উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. ক খ : ফসলের সূচীমুখে দৃপ্ত বাধা, প্রতিবন্ধ চিমনীর হাঁ-মুখ,
অরণ্যের ভালে ক্রমবর্ধমান হাতের চাবুক। (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৬)

খ. ক ঘ : লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি।
চাল-চিনি-মাছ তেল-ঘি ॥ (ছি-মন্তর/*কাল মধুমাস*, ২/১২৩)

গ. গ ঘ : দিশাহীন ঝড়ে জানি, তুমি যুগবিপ্লবী মেঘ
তড়িৎ কাটুক তোমাদের দ্রুত চলবার বেগ (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৮)

ঘ. চ ছ : দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাইনি কোথাও ছায়া
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে (লাল টুকটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪২)

ঙ. জ ঝ : ঝড় আসন্ন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ
উঁচু আসমানে ভাসে নিষিদ্ধ কথার ঝাঁঝ। (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

চ. দ ধ : তারপর পালে আসে পেয়াদা।
খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা ॥ (ধাঁধা/*পদাতিক*, ১/৪১)

ছ. ত থ : আলেয়ার নেই। আমার মতে,
এসো আজ এই জটিল পথে (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৮)
শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা – (গ্রাম্য/*চিরকুট*, ১/৫১)

জ. র ড় : অরণ্যে পর্বতে জনবাহিনীর তরঙ্গিত ভিড়
–ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর। (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৬)

ঝ. প ভ : কানামাছি ভোঁ ভোঁ
ছুঁয়ে দিয়েছি ঘোষের পো ॥ (ছি-মন্তর/*কাল মধুমাস*, ২/১২৪)

ঞ. ট ঠ : ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি (ঠাকুরমার ঝুলি/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫০)

আদ্যানুপ্রাস

আদ্যানুপ্রাসে পঙ্‌ক্তির প্রথমেই অনুপ্রাস বজায় রাখা হয়। বাংলা কবিতায় আদ্যানুপ্রাসের চর্চা খুব বেশি না হলেও প্রায় প্রত্যেক কবির রচনাতেই দুয়েকটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও আদ্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করি –

গুণীকে দেন মালা কোথায়
খুনীকে দেন সাজা (জাগ্রত/*একটু পা চালিয়ে ভাই*, ৩/২২১)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুপ্রাসের মাধ্যমে কবিতায় সাঙ্গীতিক ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতার ভাষায় পাঠকের রসানুভূতি জাগানোর যে বিষয়টি নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, তার মূল শক্তিই এই সঙ্গীতময়তা। এই শক্তির উদ্বোধন অলঙ্কার প্রয়োগে সম্ভব হয়ে ওঠে। যে কোন কবির ভাবনাই ভাষায় ধরা দিলে তা সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা লাভ করে। ফরাসি কবি মালার্মে এবং ভালেরি কবিতায় সাঙ্গীতিক ধ্বনিতরঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড় (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩২০)। এ প্রসঙ্গে স্তেফান মালার্মের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> ...সঙ্গীত ও সাহিত্য হচ্ছে সেই একক, সনাতন বস্তুর প্রতিমান রূপ যাকে আমি বলেছি ভাব বা আইডিয়া। এই মিলিত রূপটি আপন সচলতায় কখনো বিলিন হয় অন্ধকারের বুকে, কখনো বা প্রোজ্জ্বল হয় অপরাজিতের মতো। এদের [সাহিত্য ও সঙ্গীত] একটি অপরটির দিকে প্রত্যাশায় নুয়ে পড়ে, অপরটির অন্তরে ডুব দিয়ে গহীন অতলে ছড়ানো মুক্তো আহরণ ক'রে ফিরে আসার জন্যে। আর এভাবেই সমগ্র বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়।[৩]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রগতিচেতনা কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠলেও তাঁর কাব্যভাষা সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা থেকে সব সময় দূরবর্তী থেকেছে এমন কথা বলা যায় না। অনুপ্রাসের আলোচনায় উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিসমূহেও আমরা সাঙ্গীতিক ধ্বনিতরঙ্গের দোলা অনুভব করেছি। আরো কিছু দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে –

ক. কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে/এক স্বপ্ন

Dhaka University Institutional Repository

কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শিখরে উঠে/আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম
আকাশ। (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩১–১৩২)

খ. যখন ভোঁ বাজতেই/মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি করে ইস্তাহারের জন্যে/উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না–/তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে ॥ (সুন্দর/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৩)

গ. শহর-বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে /আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলেছে।
মানুষ মানুষকে আর/মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে,/
কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না।
'বাঃ, কী সুন্দর' বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে।
(ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ২/১০২)

উপর্যুক্ত তিনটি উদাহরণেই ব্যবহৃত শব্দের সম্মোহন সঙ্গীতময়তা লাভ করেছে বলে আমাদের মনে হয়। পাঠকের চিন্তাকে আলোড়িত করে তা ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয় যা অন্য জগতের অনালোকিত ঐশ্বর্যের দিকনির্দেশনা নিয়ে আসে। বিশেষ করে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে 'মানুষ' শব্দটি বারবার উচ্চারিত হওয়ায় মানুষের হিংস্রতায় মানুষেরই অসহায়ত্বের কথা কানের কাছে গানের মতো বেজে উঠেছে।

যমক

যমকে একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনিসহ নির্দিষ্টক্রমে একাধিকবার উচ্চারিত হয়। এই উচ্চারণ কখনো সার্থকভাবে, আবার কখনো বা অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যমককে কৃত্রিম অলঙ্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক কবিতায় যমকের ব্যবহার তেমন চোখে পড়ে না। কবির জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির প্রভাবে যমক সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বেশ কিছু যমক শিল্পসফলতা লাভ করেছে। বক্তব্যের প্রগাঢ়তায়ই যমক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. নায়ক অধুনা কংগ্রেসী মনোনয়নে–/...শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে। (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৯)
খ. অহল্যা হোক পিচ্ছিল হাতছানি, /...চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৩)
গ. স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো।/ ...কঙ্কালখানা কালের স্কন্ধে টানো । (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৩)
ঘ. বড়ই ধাঁধায় পড়েছি মিতে/ ...বারবার ধান বুনে জমিতে (ধাঁধা/*পদাতিক*, ১/৪১)
ঙ. আমরা কয়েক হাজার প্রজা/বাস করি এই মৌজায়/..কেমন করে বাঁচা যায়।(চিরকুট/*চিরকুট*, ১/৬২)
চ. মামা ডেকে কন, 'ভাগ্নে/তবে এ-যুদ্ধে অন্তত কিছু ভাগ নে।' (মামা ভাগ্নের গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৫)
ছ. যেতে হবে শুয়ে শুয়ে যে।/...যেতে চাও যাও সুয়েজে (মামা ভাগ্নের গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৬)
জ. রুদ্ধ করে গান/...নিউট্রন বোমার দায়ভাগ/যোগায় রেগান ॥ (গুরুভাই/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৯)

উপমা

কবিতার প্রকরণ আলোচনায় উপমা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকে। উপমার ব্যবহারে ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 'কাব্যে শব্দ বা বাক্য একটি বিশেষ সংহতি এবং ধ্বনিবৃত্তির সাহায্যে বক্তব্যকে মুক্ত করে। যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে একজন কবি তাঁর বক্তব্যকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকাশ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে উপমা একটি আশ্চর্য কৌশল।' (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৯ : ৬৪)। কোন কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় উপমার অভিনবত্বের মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। উপমা কেবল কবির বিমূর্ত ভাবনাকেই প্রকাশ করে না, এই প্রকাশ-প্রবণতার মধ্যে ধরা পড়ে তাঁর দূরদর্শিতা। উপমার ব্যবহারে কবিভাবনা বিস্তৃত হয়, পাঠকের চিন্তাকে সহায়তার মানসেই উপমার প্রয়োগ ঘটে বলেই কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত অর্থে উপমা রোমান্টিক কবিকল্পনার অনুসন্ধিৎসাকে আপাত বিসদৃশ বস্তুরাশির মধ্যে ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ তৈরি করে।[৪] পরস্পর সম্পর্কহীন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে কবিতায় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়। 'আবেগের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কবি আবিষ্কার করেন আপাত দূরবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও সুসামঞ্জস্য। এই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের পুনরাবিষ্কারই কবিতায় উপমারূপে রূপায়িত হয়' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩২৪)। কবির অনুসন্ধিৎসা সুদূর এবং অপরিচয়ের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে তোলে যা কেবল ইঙ্গিতময়ই নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও বটে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ সেখানে কাব্যলেখা বোধহয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।
>
> (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৪ : ৩৯৩-৩৯৪)।

উপমেয় ও উপমানের রহস্যময় গোপন ইঙ্গিতের অভিঘাত পাঠকের চিন্তা-কল্পনা-স্বপ্ন-স্মৃতিকে প্রণোদিত করে, যদিও তা কবির বস্তুগত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই সংগৃহীত। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা বিষয়ের মধ্যে উপমা সৃষ্টি করে অপ্রকাশিত এবং অপ্রত্যাশিত অভিঘাত। উপমার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিবিড় হলেও কেবল উপমার অভিনবত্বই কবিতার শিল্পসফলতার জন্যে যথেষ্ট নয়, কবিকল্পনার সামগ্রিকতাকে প্রকাশসম্ভব করে তোলার জন্যেও এর অবদান অনস্বীকার্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্যচর্চার প্রথম দিকে উপমা-প্রয়োগে তেমন আগ্রহ দেখান নি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক*-এ উপমার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। তিনি রোমান্টিকতার 'অস্পষ্ট মধুর সৌরভ' সৃষ্টির পরিবর্তে বামপন্থী মতাদর্শকে শিল্পরূপ দিয়ে দিনবদলের চেষ্টা করেছেন। ফলে কবিতার ভাষাকে স্পষ্ট-শীলিত-শাণিত হতে গিয়ে উপমার লাবণ্য থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। তবুও *পদাতিক*-এ উপমা একেবারে অনুপস্থিত নয়। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি –

> মৌমাছির মতো বসে কতিপয় নক্ষত্র নাগর
> নিশাচর ফূর্তির চূড়ায়। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *চিরকুট*-এ ভাষা কিছুটা কোমলতার দিকে অগ্রসর হলেও উপমার প্রতি সুভাষের আগ্রহ তেমন বাড়ে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধপরবর্তী দিনগুলোতে মানুষের দুর্বিষহ জীবনের গ্লানি কবিতায় মূর্ত করার প্রয়োজনে তাঁর কবিতার ভাষা উপমার ইঙ্গিতময়তার পরিবর্তে অস্ত্রের মতোই ধারালো হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উপমায় কবির শিল্পভাবনার চমৎকারিত্ব চোখে পড়ে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. ঘুরে বেড়াই পাড়ায় আপন খুশিমতো
লঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি। (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৭)

খ. পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাঙে

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে টলায়মান দেয়ালে দেয়ালে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত এসে লাগে। (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)

গ. রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে;
মাঠের ফসল দিন গোনে। (স্বাগত/*চিরকুট*, ১/৭০)

অগ্নিকোণ-এ কবি প্রকৃত অর্থে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মহাবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ভাষ্যকার। আধুনিক কবিতায় সমষ্টি ও ব্যক্তি একই সঙ্গে বৈপরিত্ব ও ঐক্যের ধারায় অগ্রসর হয়ে যে সমান্তরাল অভিব্যক্তির সৃষ্টি করে, এই গ্রন্থ তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যস্ত মানুষের ভগ্নবিশ্বাসের বিপরীতে তিনি মানুষকে আশান্বিত করেছেন ঋদ্ধ আগামীর দিকে। তিনি নিপীড়িত মানুষের সম্মিলিত শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে তাদের জাগরণে আশ্বস্ত হয়েছেন। ফলে কবিতায় প্রতিবাদী মানুষের কথাই মূর্ত করে তুলেছেন তিনি। বার বার মিছিলের প্রসঙ্গ এসেছে, মিছিলের মুখগুলোকে নানা বিশেষণে উপস্থাপন করেছেন এবং বর্ণিল উপমার সাহায্যে এই সংঘশক্তিকে গৌরবান্বিত করেছেন। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করলেই কবির শিল্পভাবনার এই দিকগুলো উন্মেচিত হবে –

ক. ধনুকের মতো বাঁকা পিঠগুলো
টান করে ঘুরে দাঁড়ায় – (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)

খ. আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

গ. বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান। (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)

ঘ. ফস্‌ফরাসের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ। (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)

ঙ. নিষ্কোষিত তরবারির মতো
জেগে ওঠে আমাকে জাগায়। (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)

অগ্নিকোণ-এ একটি চমৎকার গুচ্ছ উপমার সৃষ্টি করেছেন সুভাষ। মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষগুলোর মধ্যে তিনি যে মুক্তির বাণী উচ্চারিত হতে শুনেছেন, সেই মিছিলকেই তিনি মহিমান্বিত করেছেন নানা উপমার সাহায্যে। মিছিলের মানুষগুলোর নাক, চোখ, হাত, বিশেষ করে মুখমণ্ডলকে তিনি অভাবনীয় উপমায় উদ্ভাসিত করেছেন। সুভাষের কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক –

কারো বাঁশীর মতো নাক ভালো লাগে
কারো হরিণের মতো চাহনি নেশা ধরায়
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জ্বলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
ফস্‌ফরাসের মতো। (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)

ফুল ফুটুক 'পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে জনগণের সর্বাত্মক মুক্তির প্রশ্নে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উত্তরণের ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার পটভূমিতে আত্মসমীক্ষণমূলক লেখা। বিচ্ছিন্নভাবে উগ্রপন্থার আশ্রয় নেয়ার ক্ষয়ক্ষতির

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণে ঘেরা নতুন সম্ভাব্যতাকে ছাই-এর মধ্যেকার স্ফুলিঙ্গকে খুঁচিয়ে দেওয়ার কবিতা' (জমিল শরাফী ১৯৭৫ : ৮)। ফলে উপমা প্রয়োগেও কবির এই জীবনভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে –

ক. পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ। (সালেমনের মা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৬)

খ. বাবরালির চোখের মতো এলোমেলো
এ আকাশের নীচে কোথায় (সালেমনের মা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৬-১৩৭)

গ. ঘ্যানঘেনে ছোট্ট মেয়েটার/পায়ে আঠার মতো লেগে (একটি লড়াকু সংসার/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৮)

ঘ. স্নিগ্ধ স্নাত গাধূলির মতো /বিলম্বিত/আমাদের ভালোবাসা। (গাছে গাছে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৯)

ঙ. কপালে জ্বল্‌জ্বল্ করছে/ঘাম/–রাজটীকার মত। (গাছে গাছে/ফুল ফুটুক, ১/১৩৯)

চ. বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দুবিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মতো জ্বলছিল (সুন্দর/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৩)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপমা প্রয়োগে সর্বাধিক শিল্পসাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন *যত দূরেই যাই* কাব্যগ্রন্থে। এই গ্রন্থেই তিনি সর্বাধিক উপমা ব্যবহার করেছেন। উপমার যে অন্তর্নিহিত শক্তি পুরো কবিতাকে উজ্জ্বল করে তোলে, সেই শক্তির অনুসন্ধিৎসায় তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় এখানে স্পষ্ট। কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার অভাব তাঁকে তাড়িত করেছে, ফলে এক অভাবিত অস্থিরতায় পীড়িত হয়েছেন তিনি। কবিতায়ও সেই বিক্ষুব্ধ মানসিকতার প্রভাব পড়েছে। ষাটের দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার অভিঘাত তাঁর চৈতন্যকে আলোড়িত করেছে। সেই সঙ্গে জীবন ও জগতের চিরকালের সত্যকে জানবার আগ্রহ এবং তা অবহিত করার আকাঙ্ক্ষা যেমন এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি তাঁর যৌবন-উত্তীর্ণ বিশ্ববীক্ষায় অপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক বিপ্লবকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামকে তিনি চিত্রিত করেছেন (জমিল শরাফী ১৯৭৫ : ৯)। তাঁর উপমাসমূহেও পড়েছে এই জীবনদৃষ্টির প্রভাব। এই গ্রন্থের উজ্জ্বল উপমাসমূহের একটা তালিকা তুলে ধরছি –

ক. ভয়চকিত হরিণীর মতো/আমাকে জড়িয়ে ধরল হাওয়া ॥ (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)

খ. রঙ যার/ঠিক চাঁপা ফুলের মতো। (পোড়া শহরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)

গ. আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মতো/তার মুখচ্ছবি কেমন (পোড়া শহরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)

ঘ. যেখানে তার চোখের/উজ্জ্বল নীল মণির মতো আকাশ। (পোড়া শহরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)

ঙ. যেখানে স্টিমারের খালাসির মতো/স্মৃতি – (যেন না দেখি/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৭)

চ. তুমি আমার দুটো চোখ/দুটো পায়ে/ঘুঙুরের মত বেঁধে দিও ॥ (যেন না দেখি/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৭)

ছ. ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে। (ঘোড়ার চাল/*যত দূরেই যাই*, ২/৮১)

জ. তারপর কাঁদুনে গ্যাসের মতো/ধোঁয়ার কালো গাড়ি (গণনা/*যত দূরেই যাই*, ২/৮২)

ঝ. গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মতো/রাস্তাটা (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৪)

ঞ. বাপের-আদরে-মাথা-খাওয়া ছেলের মতো
হিজিবিজি অক্ষরগুলো একগুঁয়ে (কেন এল না/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৭)

ট. জোনাকিরা দল পাকিয়ে/উড়োজাহাজের আলোর সংকেতের মতো
সারা রাত জ্বলবে আর নিববে। (বারুদের মতো/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৮)

ঠ. 'অন্ধকার/কালো বারুদের মতো,' (বারুদের মতো/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

ড. ছানি-কাটা চোখের চশমাটা তার মুখের গোড়ায়
দূরবীনের মতো ধরে, (পা রাখার জায়গা/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৫)

ঢ. মাটিতে চাপ চাপ রক্তের মতো ফুল:
ভুট্টার রং মানুষের গায়ের মতো। (পা রাখার জায়গা/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৬)

ণ. বউদির মতো ভূষণ্ডি কালো নয় । (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

ত. বাঃ কী সুন্দর! দেখো, দেখো ঠিক ছবির মতন ! (ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ২/১০১-১০২)

থ. অমনি পাকা গিন্নি পৃথিবীটা
শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল – ছেই-ছেই-ছেই(ছেই/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩)

দ. কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই, / চোখের জলের মতো। (ছেই/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩)

ধ. আমার কোলের ওপর দুটো আঙুল
কুরুশকাঠির মতো বুনবে স্মৃতির জাল – (দূর থেকে দেখো/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩)

ন. ডানাভাঙা পাখির মতো/একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল (এই পথ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৪)

প. মুচির দোকানের লাশে-চড়ানো জুতোর মতো
মাথার ওপর ঝুলছে। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৯)

এই গ্রন্থে একটি বিস্ময়কর মালোপমার সৃষ্টি করেছেন তিনি। উপমেয় ফুলকে তিনি নানা উপমানের সঙ্গে তুলনা করে ফুলের সৌরভ ও স্নিগ্ধতার পরিবর্তে তাকে সংগ্রামের প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করেছেন। রক্ত, আগুন ও নিশানের মধ্যে কবির রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি –

রক্তের মতো লাল
আগুনের মতো উদ্‌গ্রীব
নিশানের মতো অশান্ত (গণনা/*যত দূরেই যাই*, ২/৮২)

কাল মধুমাস-এ সুভাষ উপমা ব্যবহারে খুব বেশি আগ্রহ না দেখালেও কয়েকটি কবিতায় উপমার অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। ষাটের দশকের শেষের দিকের রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব পড়েছে তাঁর কবিতায়। ফলে উপমেয় ও উপমানের ইঙ্গিতধর্মী সম্বন্ধের মধ্যেও সেই সময়ের ক্ষতচিহ্ন লক্ষ করা যায়। এই গ্রন্থের গুটিকয়েক উপমায় সুভাষের কবিকল্পনা পাঠকের বিস্ময়বোধকে জাগ্রত করে। কয়েকটি দৃষ্টান্তগুলো বিবেচনা করা যাক–

ক. চষা মাটির মতো এবড়ো খেবড়ো সময়; (ভুবনডাঙার বাউল এক/*কাল মধুমাস*, ২/১২৩)

খ. জলের পাম্পগুলো/থেকে থেকে হরবোলার মতো
কখনও ঝিঁঝির ডাক, কখনও সাইরেনের শব্দ
নকল ক'রে চলেছে। (বন্ধু/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৮)

গ. পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে/ছায়ার মতো মানুষ; (বন্ধু/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৮)

ঘ. নতুনের মতো করছে যা কিছু পুরোনো (খড়ির দাগে/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৯)

ঙ. বিকলাঙ্গ ভিখিরির মতো দুর্বিষহ মর্মন্তুদ কর্কশ আওয়াজ। (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৫৫)

চ. সে পেয়েছে শিবতুল্য বর (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৬৪)

উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে ঘ এবং ঙ-সংখ্যক উদাহরণেই কেবল উপমা সাধারণের কল্পনাপ্রতিভাকে অতিক্রম করে নি। এছাড়া প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতেই সুভাষের কবিদৃষ্টির অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই *ভাই* কাব্যগ্রন্থ 'গণ-বৈপ্লবিক শিবিরের অভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃঘাতী, আত্মঘাতী-আত্মহত্যা প্রবণতার বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার সংগ্রামের পটভূমিতে লেখা' (জমিল শরাফী ১৯৭৫ : ১০)। এই গ্রন্থে উপমার ব্যবহার খুবই কম এবং সৃষ্ট উপমায় কবির সৃজনপ্রতিভাও তেমন দৃপ্ত হয়ে ওঠে নি। কয়েকটি উদাহরণ দিই –

ক. সভায় কোনো বেআইনী দলের/অতর্কিতে ছুঁড়ে-দেওয়া/উত্তেজক ইস্তাহারের মতন
শূন্যে ভর দিয়ে নামছে/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। (জল আসুক/*এই ভাই*, ২/১৮৪)

খ. ঠিক/জলের মতন সহজ। (আমাদের হাতে/*এই ভাই*, ২/১৯৮)

গ. নেহাইতে রক্তের মতন লাল/গনগনে লোহা (জলদি জলদি/*এই ভাই*, ২/২০১)

উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে শুধু ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তই কবির প্রজ্ঞা ও সজ্ঞার স্বাক্ষর অত্যন্ত গভীরভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। উদ্ধৃতি খ আক্ষরিক অর্থেই জলের মতো সহজ এবং এখানে নেই কোন নতুনত্বের ছোঁয়া । উদ্ধৃতি গ-এ কবির রাজনৈতিক বিশ্বাস মূর্ত হলেও তা অভিনব নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কবির মানসিক সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে *ছেলে গেছে বনে* কাব্যগ্রন্থে। এই গ্রন্থে উপমা খুব বেশি না থাকলেও বেশ কয়েকটি উপমায় কবির জীবনবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কবিকল্পনার দূরসঞ্চারী অনুভবে উপমেয় ও উপমানের মধ্যকার রহস্যময় গোপন ইঙ্গিত পাঠকচেতনায় স্বপ্ন, স্মৃতি, অনুষঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সংবেদনা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্তগুলোতে আমরা লক্ষ করব, সুভাষের কবিত্ব উপমার আশ্রয়েই অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে –

ক. পুরোনো ভিতগুলো যখন বালির মতো ভাঙছে/আমরা ভাইবন্ধুরা
ঠিক তখনই/ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি। (সামনেওয়ালা ভাগো/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২১৯)

খ. ভোরের আজানের মতো/আমি গলা তুলে জানান দিচ্ছি
...আমি তোমারই জন্যে দাঁড়িয়ে (হাত বাড়িয়ে রেখেছি/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪০)

গ. লাল পিঁপড়ের মতো
আমাকে তুমি দেখছিলে। (ভিয়েতনামে শোনা একটি গান/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪০)

ঘ. কৃমিকীটের মতো তোমার মুখ
আমি নিচু হয়ে দেখছি। (ভিয়েতনামে শোনা একটি গান/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪০)

ঙ. গনগনে লোহার গায়ে জল লাগার মতো/পাড়া জুড়ে এক আচম্বিত শব্দে
সমস্ত আলো একেবারে ফস ক'রে নিবে গেল। (আলোয় অনালোয়/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫৬)

একটু পা চালিয়ে, ভাই কাব্যগ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপমা বিষয়ে নিবিড় নিরীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনাভিজ্ঞতার এমন এক প্রান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন, যেখানে বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি সূক্ষ্মতায়, তীক্ষ্ণতায় প্রোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দুয়েকটি উপমায় সাধারণ ভাবনার প্রকাশ থাকলেও অধিকাংশ উপমাই গভীরতর উপলব্ধির ধারক হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি যখন বলেন, 'আজ আমি ঠিক আমারই মতন/একজনকে খুঁজছি' (আজ আছি কাল নেই/একটু পা চালিয়ে, ভাই, ৩/১৯৭) কিংবা 'এ-দাদা সে-দাদার পায়ে আঠার মতো লেগে' (টুল/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*,

Dhaka University Institutional Repository

৩/২১২), তখন পাঠকের চিন্তা কোন দূরকল্পনায় অগ্রসর হয় না। কিন্তু অন্ধকার যখন জন্মাষ্টমীর সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তোলে কিংবা নিজের বিশ্বাসের দোদুল্যমানতাকে যখন ঝুলন্ত জলের ফোটার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন কবির উদ্ভাবনায় পাঠক উৎসাহ বোধ করেন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার/এই আলো নেভানো শহরে। (সাধ/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/১৯৬)

খ. হেমন্তে হলদে পাতার মতন/হায়, আমার/এই দিন-আনি দিন-খাই
লেখার আয়ু। (আজ আছি কাল নেই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/১৯৭)

গ. টেলিগ্রাফের তারে/বৃষ্টির শেষে জলের ফোঁটার মত
যখন আমি টলমল করি (ঝুলতে ঝুলতে/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২১২)

ঘ. সাপের মত বুকে-হাঁটা ট্যাঙ্কের সেই চাকা (বাঘের আঁচড়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২১২)

ঙ. আমি আমার ছেলেবেলার মতন
মাঝের আঙুলটা তর্জনীতে তুলে দিয়েছি, (বাঘের আঁচড়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২১২)

ছেলে গেছে বনে-র একটি উপমা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে। বেকারত্বের যন্ত্রণাকে পাঠকের উপলব্ধির সীমায় নিয়ে আসার জন্য তিনি চমৎকার কবিকল্পনার সৃষ্টি করেছেন। কাগজের ঠোঙার সাক্ষরতা এবং শালপাতার নিরক্ষরতা বেকারত্বের দুর্বিষহ জীবনকে মূর্ত করে তুলেছে। মালোপমাটি উদ্ধৃত করছি –

অক্ষরযুক্ত ঠোঙার কাগজের মত
আর নিরক্ষর শালপাতার মত
অসংখ্য বেকার (টুল/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২১২)

জল সইতে কাব্যগ্রন্থে তেমন কোন উজ্জ্বল উপমার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের ভাষা যদিও কথ্যভঙ্গির খুবই নিকটবর্তী, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথোপকথনে উপমা ব্যবহারের যে স্বাভাবিক প্রবণতা আমরা লক্ষ করি, সুভাষ তা অনুসরণ করেন নি। অবশ্য দুয়েকটি উপমায় কবির চিন্তা বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করে। মানুষের মতামত ও চিন্তা প্রতিনিয়ত দিক বদলে বদলে গন্তব্যের দিকে এগোয়। অক্ষর মূলত মানুষের ভাবনাকেই অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। তাই কবি পিঁপড়ের দিক বদলানোর সঙ্গে অক্ষরের বদলে যাওয়া তুলনা করেন। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক –

ক. পিঁপড়ের মতন/সার দিয়ে
অক্ষরগুলো মুখ বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে/আমাকে নিয়ে চলেছে (আগুন লাগলে/*জল সইতে*, ৩/৩৩৩)

খ. চুলের মুঠি ধরতেই
হাতের মুঠোয় উঠে এল শণনুড়ির মত মাথার জট। (ছেলে ধরা/*জল সইতে*, ৩/৩৩৬)

গ. হালফ্যাশানের ট্র্যানজিস্টরের মত/শুয়ে/বসে/হাঁটতে হাঁটতে (সুলভে গৃহশিক্ষক/*জল সইতে*, ৩/৩৪৪)

চইচই-চইচই কাব্যগ্রন্থে বেশ কিছু উপমা রয়েছে। উপমাগুলো সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরস্পর সুদূর এবং অপরিচিত বস্তুর মধ্যে। এখানে উপমা কবিভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লোকমুখে প্রচলিত নানাবিধ তুলনার আশ্রয় নিয়েছে। উপমা এখানে স্বতন্ত্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে না উঠলেও কবিতার কথ্যভঙ্গিকে শিল্পবিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। সেই বিবেচনায় এগুলোর আলাদা একটা গুরুত্ব আছে বলেই আমাদের মনে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিই –

Dhaka University Institutional Repository

ক. পাড়-ভাঙা নদীর মতন রাস্তায়/... যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল (সুখটান/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৪)

খ. বুনো শুয়োরের মতন/তেড়ে এসেছিল/দাঁত-বার-করা/ইঁটপাথর (সুখটান/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৪)

গ. পেঁজানো তুলোর মতো ওড়ে/ছিন্নভিন্ন গান/মূর্তি/ছবি। (অন্ধকার গিলে খাচ্ছে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৭)

ঘ. ড্রাগনের মতো/দাঁতে তার বিষ (গুরুভাই/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৮)

ঙ. ষাঁড়ের মতন তাড়া করে ফিরছে/ পেছনে সময়। (এই যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮০)

চ. মাটিতে লাগিয়ে মুখ খুঁটে খায় খুদ/পাখিদের মতন হুবহু (অগত্যা/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৪)

ছ. ভারী মোটা কম্বলের মতন কুয়াশা (অগত্যা/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৪)

জ. আমার বন্ধুরা/পাড়ের ওপর ছবির মতন দাঁড়িয়ে (ছবির মতো/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৯৬)

বাঘ ডেকেছিল গ্রন্থে উপমা নেই বললেই চলে। এই গ্রন্থে পদ্যের দিকে তাঁর আগ্রহ বেড়েছে। ভঙ্গির দিক থেকে পদ্য হলেও ভাবের দিক থেকে তা কলকাতার জনজীবনের নানাসমস্যার শিল্পরূপ। ছন্দের টানটান অবস্থাই হয়তো উপমার শিথিল ভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেয় নি। একটি উদাহরণ দেয়া যায় –

সামনের জিওল গাছে খালি চাপ চাপ
ঝুলত জমাট রক্ত
থুথুরে বুড়োর মত পাকাপোক্ত
কোঁচকানো বাকলে। (সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৬৩)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় *যা রে কাগজের নৌকো* গ্রন্থে চমৎকার কিছু উপমার সৃষ্টি করেছেন। অভিজ্ঞতার ঔজ্জ্বল্য উপমার প্রকাশক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। শোষণের নানা মাত্রাও উপমার সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন তিনি। কখনো কখনো উপমেয় এবং উপমানের ব্যবধান এত বেশি যে পাঠকের কল্পনাকেও তা একটু পরিশ্রম করিয়ে নেয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. কাগজের মতো সাদা হাড় নিয়ে/একটা পরিতৃপ্ত হায়েনা (হায়েনার হাসি/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/১৯)

খ. আমার নাকি চেহারা হয়ে যাচ্ছে/পোড়া কাঠের মতন। (ভয় দেখাই/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২১)

গ. মড়ার মতো পড়ে থাকে কই, (ভয় দেখাই/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২২)

ঘ. ফোকলা পুরুতের মতো/কেবলি ভুল উচ্চারণে/বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে
সমানে পড়ে চলেছে/তর্পণের মন্ত্র (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৬)

ঙ. লালনীল কাগজের টুকরোর মতো
গোধূলির আকাশ (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৭)

চ. মাথা খুঁড়ে মরা পতঙ্গের মতো/অগণিত চোখ (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৭)

উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে ঘ-সংখ্যক দৃষ্টান্তটি কবির গভীরতর জীবনবীক্ষার পরিচায়ক। অপচয়িত জলের শব্দের সঙ্গে পুরুতের ভ্রান্ত মন্ত্রপাঠের সম্বন্ধ বেশ দূরবর্তী হলেও পাঠকের ভাবনাকে তা বিলোড়িত করে। ফলে পুরো কবিতাটিই লাভ করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা।

ধর্মের কল কাব্যগ্রন্থে কিছু চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন সুভাষ। এই গ্রন্থের ভাষা যেমন প্রচলিত কথ্য উচ্চারণের কাছাকাছি, তেমনি উপমাগুলিও আটপৌরে উপাদানে সমৃদ্ধ। অত্যন্ত সরল ভঙ্গিতে তিনি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধির নির্যাসকে পাঠকের চিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি –

ক. উর্দি ছেড়ে পরবার মতন/আটপৌরে কাপড় (স্বর্গীয়/*ধর্মের কল*, ৫/২১৯)

খ. অবিকল তার মতো/অথচ সে নয় (স্বর্গীয়/*ধর্মের কল*, ৫/২১৯)

গ. কচি কচি গলায়/ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ছিল গান (এক মাঘে শীত যায় না/*ধর্মের কল*, ৫/২২০)

ঘ. হাতে তাবিজ, না পুরনো পয়সার মতো টিকের দাগ (ফেউ/*ধর্মের কল*, ৫/২৩১)

ঙ. ধূর্ত বাঘের মতো/আমি তাকে গন্ধ দিয়ে চেনবার চেষ্টা করি (ফেউ/*ধর্মের কল*, ৫/২৩২)

চ. হাম্বাগুলো শোনাচ্ছে ঠিক হালুমের মত (ধর্মের কল/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৭)

উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে ঙ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবির অনুভূতির তীক্ষ্ণতা খুবই নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে যারা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করে, তাদের ব্যাপারে কবির সতর্কতা একটি উপমাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষা শব্দটির অর্থ উৎকট জ্ঞান। কল্পনা বা মিথ্যা হলেও শক্তিশালী কবির নৈপুণ্যে এই অলঙ্কার পাঠকের রসানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়। 'শিল্পী যেমন তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধকে বস্তুরূপে প্রত্যয়যোগ্য করেন, কবিও তেমনি চিত্তের অনুভূতির নিগূঢ়তাকে উৎপ্রেক্ষারূপে প্রকাশমান করেন' (সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৯ : ৬৪)। কবি উৎপ্রেক্ষায় যে সংশয়ের প্রকাশ ঘটান, তা অনেকাংশেই নিঃসংশয়ের আবহ বা আবেদন সৃষ্টি করে। কবি অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ হলে উৎপ্রেক্ষাও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞানের স্পর্শে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই অলঙ্কার সৃজনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে উৎপ্রেক্ষার উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে না। বিশেষ করে *পদাতিক* এবং *অগ্নিকোণ*-এ উৎপ্রেক্ষা নেই বললেই চলে। *চিরকুট* এবং *ফুল ফুটুক* কাব্যগ্রন্থের দুয়েকটি কবিতায় এই অলঙ্কারের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে সুভাষের শিল্পদৃষ্টির বিচক্ষণতার পরিচয় ধরা পড়েছে। নিচের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করি –

ক. রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে/যেন কোনো কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ ! (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৩)

খ. নেভানো উনুনের ওপর পড়ন্ত আলোয়/যেন/ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে
কাল বিকেলে মাজা ভাতের হাঁড়ি। (একটি লড়াকু সংসার/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৮)

গ. আমরা যেন বাংলাদেশের/চোখের দুটি তারা। (পারাপার/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৮)

উদ্ধৃতি ক-এ নিপীড়িত জনতার জাগরণকে কবি মেঘের বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে চোখের তীক্ষ্ণ চাহনীর সঙ্গে সংশয়িত সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তে অভুক্ত মানুষের ঝুলিয়ে রাখা পরিষ্কার হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে কবির সন্দেহ জেগেছে হাঁড়িগুলোকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে কি-না। দৃষ্টান্ত গ-এ কবির বাংলাদেশ-প্রীতি উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে। প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে উৎপ্রেক্ষা বিরল হলেও তিনি এই অলঙ্কার প্রয়োগে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন ।

যত দূরেই যাই কাব্যগ্রন্থেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার নিয়ে নানা রকম নিরীক্ষার চেষ্টা করেন। কবির অভিজ্ঞতার নানা প্রান্তকে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনে উৎপ্রেক্ষা পালন করেছে দূরসঞ্চারী ভূমিকা। দৃশ্যমান জগতকে দেখার যে দৃষ্টি তিনি লাভ করেছেন, তাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে অদৃশ্যলোকের

Dhaka University Institutional Repository

সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি-প্রকৌশল উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে অভিনবত্ব লাভ করেছে। অস্তায়মান সূর্যের রঙিন আভায় তিনি সঞ্চারিত করেছেন দুর্ধর্ষ ডাকাতের চোখ-রাঙানি। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন 'যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো/রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে/নিজের ডেরায় ফিরে গেল/সূর্য।' (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)। আবার কালো বউয়ের প্রাণচঞ্চলতায় তিনি আরোপ করেন রণচণ্ডীর দুরন্ত গতি, যা তার দজ্জাল শাশুড়ির চোখে অসহ্য হয়ে ওঠে – 'বউ যেন মা-কালীর মতো রণরঙ্গিনী বেশে/কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে/চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো' (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০০)। এভাবেই সুভাষের শিল্পভাবনায় উৎপ্রেক্ষার প্রবল অবস্থিতি তাঁর অন্তর্ভূমির গাঢ়চেতনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আরো কিছু উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে –

ক. আর সিঁড়িগুলো সব/যেন স্বর্গে উঠে গেছে। (যেতে যেতে/*যত দূরেই যাই*, ২/৬৮)

খ. যেন পুলিশের/কালো গাড়িতে এল/সন্ধ্যা। (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)

গ. কালো কালো মানুষগুলো অদৃশ্য পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে
যেন আত্মসমর্পণের এক ভঙ্গিতে/হাত উঁচু করে আছে। (পোড়া শহরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)

ঘ. কারা যেন হেঁকে হেঁকে/সংখ্যাগুলো অবিকল মিলিয়ে মিলিয়ে/নিচ্ছে ॥ (গণনা/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৩)

ঙ. যেন কিছুতেই/তার পায়ের নীচে/রাস্তাটা না দেখা যায়। (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৪)

চ. পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকি-কুকুরের মতো (পা রাখার জায়গা/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৪)

ছ. দেখে সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল (পা রাখার জায়গা/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৪)

জ. যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে/শখ করে নতুন কেনা হয়েছে। (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৭)

ঝ. থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে /কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন। (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

ঞ. বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়/থমথম করছে (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

ট. যেন কোমরে ঘুনসি বেঁধে/দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে। (এই পথে/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৪)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় *কাল মধুমাস* কাব্যগ্রন্থেও অভিনব কিছু উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি করেছেন। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার অভিঘাতে প্রতিনিয়ত নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন তিনি। জীবন ও জগতের চিরন্তন সত্যকে তিনি যেমন খুঁজে পেতে চেয়েছেন, তেমনি অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেই নির্মাণ করেছেন এক কল্পিত সত্যের জগৎ, যা প্রচলিত সত্যের চেয়েও অধিক অর্থবহ হয়ে উঠেছে। উৎপ্রেক্ষার মূল শক্তিই হলো অকথিত ও অসমর্থিত সত্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা। *কাল মধুমাস*-এ এই উপলব্ধির অভিনব প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি হালকা হাওয়ায় দোদুল্যমান পর্দাকে দান করেন চিন্তাশক্তি, তাই অতিথির আগমন-ভাবনায় কেমন যেন উসখুস করতে দেখা যায় তাকে : 'পর্দাটা উসখুস করছে হাওয়ায়/যেন কেউ/আসবে কি আসবে না ভাবছে।' (কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ/*কাল মধুমাস*, ২/১২৪)। কখনো আবার ভোরের শিশির দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন নাকের নোলক, আর তা পরিয়ে দেন তারের বেড়ায় : 'সকালে শীতের ভোরে তারের বেড়ায়/ঝুলে থাকত যেন নাকের নোলক' (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৬০)। কেবল ভোরের শিশিরের প্রসঙ্গই নয়, শিশির-স্নাত একটি সুন্দর মুখের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি ভাবেন, ওষ্ঠ-অধরে যেন খণ্ডিত চাঁদের চমৎকার আভা ছড়িয়ে আছে : 'মুখখানি যেন ভোরের শেফালি/নেমে গেল এক্ষুনি/দু-অধরে চেপে চাঁদ একফালি' (কাছে দূরে/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৯)। এইভাবে কবির জীবনজিজ্ঞাসার সারাৎসার উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে নতুন মাত্রা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আরো কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি –

ক. যেন বাজি ফোটানোর আওয়াজে/কাল তোমার জন্মদিন গেল। (তোমাকে বলিনি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৫)

খ. যেন/উলানোভার মরালনৃত্যের ভঙ্গিতে/শিয়রে/শুভ্র ফুল(ভুবনডাঙার বাউল এক/*কাল মধুমাস*, ২/১২১)

গ. ইলেকট্রিক পাম্পে ঝিঝি-লাগা ফ্ল্যাটবাড়িটা।
যেন শূন্যে ঝুলছে। (কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ/*কাল মধুমাস*, ২/১২৪)

ঘ. উদয়াস্ত/দুই পারের যেন দু-হাতে/আপন মনে
নিরন্তর/ঢাল-উপুড়/ঢাল-উপুড় খেলা। (পারঘাটের ছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১২৬)

ঙ. মিছিল/যেন ফুরোতে চায় না (মর্সিয়ার পর/*কাল মধুমাস*, ২/১২৭)

চ. ঝুঁকে প'ড়ে চোখে চূর্ণ অলক/যেন চায় পড়ে নিতে
শ্বেতপাথরের স্মৃতির ফলক (কাছে দূরে/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৯)

ছ. গুপ্তকক্ষে ব'সে ব'সে নিজের অস্থিতে/বজ্র যেন বানাচ্ছে দধীচি। (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৬২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে অনেক বেশি মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য কবিতার বিষয়গত পরিবর্তন এর জন্য দায়ি হতে পারে। পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বিশেষ করে *এই ভাই* কাব্যগ্রন্থে কবি এমন এক সময়কে চারুকৃত করেছেন যেখানে বিশ্বাসহীনতা কেবল পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতেই নয়, আত্মবিশ্বাসেও আর মানুষ আস্থা রাখতে পারে নি। ষাটের দশকের শেষ সময়ের এই বিপন্ন অবস্থা সত্তরের শুরুতেও বহাল থেকেছে। কবি এই অস্থির সময়ের শিল্পরূপ দিতে গিয়ে কবিতার ভাষাকে কথ্যরূপের এতো নিকটবর্তী করে তুলেছেন যে, কোন রকম রহস্যময়তাকে প্রশ্রয় দেন নি তিনি। যদিও উৎপ্রেক্ষা একেবারে অনুপস্থিত নয়। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি –

ক. ভাবখানা/যেন বাইরে গেলেই/আমাকে একহাত দেখে নেবে (ছাই/*এই ভাই*, ২/১৮০)

খ. এবার/যেন একটা কঠিন সংকল্পে/মন বেঁধে নিয়েছে। (জল আসুক/*এই ভাই*, ২/১৮০)

গ. সারাটা দিন যেন কাদের চলেছে কুচকাওয়াজ। (ছত্রী/*এই ভাই*, ২/২০৩)

শেষের দিকে কবির উৎপ্রেক্ষায় কল্পনা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। উৎপ্রেক্ষার স্পর্শে সুভাষের কাণ্ডজ্ঞান যে প্রকাণ্ড শক্তিতে পাঠকের আকাঙ্ক্ষাকে আলোড়িত করেছে, শেষ পর্যায়ের কবিতায় সেই দীপ্তি কিছুটা অবসিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এই অলঙ্কার প্রয়োগের পরিমাণও সেখানে খুব বেশি নয়। নিচের উদ্ধৃতিগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে – 4299

ঘ. মেলাতে গিয়ে সময়ের জালে
যেন আরও বেশি জড়িয়ে পড়ছি ॥ (সময়ের জালে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৮)

ঙ. যাবার আগে যেন দেখে যাই/মেঘরাঙা রামধনু (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৮)

চ. ঢেলে সাজা পৃথিবীর বুকে/যেন শুনতে পাই/ভোরের আজান ॥ (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৮)

ছ. যেন কোনো পোড়-খাওয়া মানুষের/কপালের রেখা (মরুভূমির হাওয়ায়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০৭)

জ. যেন বন্ধ খাম/তার ওপর সমস্তই অন্য নামধাম (এই যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮০)

ঝ. আমি যেন/খেলাঘরে পড়ে থাকা/বালখিল্য (এই যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮০)

ঞ. চারদিকে চর্‌কির মতো/যেন ঘুরছে চোখ (চইচই-চইচই/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮০)

Dhaka University Institutional Repository

একজন কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করার অন্যতম অভিজ্ঞান হলো উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারের কুশলতা। উৎপ্রেক্ষায় কবির গভীরতম উপলব্ধির নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় উৎপ্রেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম হলেও সার্থক, শিল্পসম্মত উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত সৃষ্টিতে তাঁর সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার যুগল আলোক প্রক্ষেপে তাঁর কবিতার শরীরই কেবল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি, কবিকল্পনার হৃৎপিণ্ডেও সঞ্চারিত হয়েছে অভিনব ব্যঞ্জনা।

রূপক

কবিতার রূপ বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কবিরা রূপকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। শব্দপ্রয়োগে কবির সংযত-সংহত প্রকাশ চরম হলেই রূপকের সৃষ্টি হয়। রূপকে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোন ভেদ বা ব্যবধান স্বীকার করা হয় না। হার্বার্ড রীড রূপকের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে –

> We might define metaphor summarily as the discovery of an illuminating correspondence between two objects but that too is inadequate for the subtleties of the process (Herbert Read 1950 : 98).

রীড এখানে রূপক-সৃজনের ক্ষমতা এবং রূপকের মৌলিকত্বের আলোকে কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। প্রকৃত অর্থে রূপকের সাহায্যেই ভাষার ওপর কবির দখল অনুধাবন করা যায়। 'প্রকাশকলায় নৈপুণ্য অর্জন করতে হ'লে প্রথাবদ্ধ ভাষা-প্রয়োগরীতি অতিক্রম করা-ছাড়া কবির বিকল্প নেই। আধুনিক কবির ভাষা-প্রয়োগরীতি প্রথাগত কাব্যভাষাকে বার-বার অতিক্রম ক'রে যায়। প্রচলিত প্রকাশপদ্ধতি ও কাব্যভাষা অতিক্রম করতে গিয়ে কবি কখনো নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন, কখনো কাব্যে প্রচলিত শব্দের নতুন প্রয়োগরীতি উদ্ভাবন করেন, কখনো কবিতার ভাষাকে করেন রূপকাশ্রিত' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৩৮)। ফলে কোন কবির ভাষা-ব্যবহারের কৃতিত্ব অনেকাংশেই তাঁর রূপক-রচনার কৌশলের ওপর নির্ভর করে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক*-এ শব্দপ্রয়োগে বাহুল্যবর্জন করে আবেগকে এমন সংযতভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন মূলত রূপক সৃষ্টির বিস্ময়কর সাফল্যের কারণেই। তাঁর কবিতায় রূপক অনুসন্ধানে অগ্রসর হলে আমরা লক্ষ করব, উপমেয় ও উপমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের নিপুণ অস্বীকৃতির মাধ্যমে তিনি রচনা করেছেন বিপুল-সংখ্যক শিল্পসফল কাব্যপঙ্‌ক্তি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ/গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে (মে দিনে কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)
খ. দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য/চিনে নেবে যৌবন-আত্মা ॥ (মে দিনে কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)
গ. ধূলিসাৎ বটে, সে বালখিল্য স্বপ্নরা: (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৩)
ঘ. হৃদয়রাজ্যে অনাবশ্যক দলাদলি/... ভবঘুরে তাই ভালোবাসা (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৩)
ঙ. দ্বিধা-বিলম্বে হারাই লগ্ন ইহলোক (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৩)
চ. মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে/চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা (বিরোধ/*পদাতিক*, ১/২৬)
ছ. পাষাণ কায়া, হায় রে রাজধানী (বধূ /*পদাতিক*, ১/২৭)
জ. ভাংচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি ভাড়াটে: (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৩৯)
ঝ. মেঘেদের হাত ধরে আমার উধাও-যাত্রা গ্রহ হতে গ্রহে/গান নক্ষত্রবিরহ (পলাতক/*পদাতিক*, ১/২৯)
ঞ. বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধার দিই জনে জনে : (পলাতক/*পদাতিক*, ১/৩০)

Dhaka University Institutional Repository

ট. হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পার ? (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩২)

ঠ. হৃদয় হাঙর-যক্ষ্মাই ঠোকরাবে। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৩)

ড. মৌমাছির মতো বসে কতিপয় নক্ষত্র নাগর /নিশাচর ফূর্তির চূড়ায় (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

ঢ. বণিকপ্রভু চোখ রাঙায়, (পদাতিক /*পদাতিক*, ১/৩৫)

ণ. এতৎসত্ত্বেও হয়তো গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে অদৃষ্টের চাকা। (অতঃপর/*পদাতিক*, ১/৩৭)

ত. দিকে দিকে শ্যেনদৃষ্টিকে, দেখ, মেলে সাধু বক। (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৭)

থ. প্রাক্‌পুরাণিক গুহাকে ডাকল ক্ষুরধার নখ (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৮)

উদ্ধৃতিসমূহে ব্যবহৃত সাইরেন-শঙ্খ, যৌবন-আত্মা, বালখিল্য স্বপ্নরা, হৃদয়রাজ্য, দ্বিধা-বিলম্ব, মনের ঘোড়া, পাষাণ কায়া, শৃগালবুদ্ধি, উধাও-যাত্রা, নক্ষত্রবিরহ, কবিতাকন্যা, হরিণ সময়, হাঙর-যক্ষ্মা, নক্ষত্র-নাগর, বণিকপ্রভু, অদৃষ্টের চাকা, শ্যেনদৃষ্টি, ক্ষুরধার প্রভৃতি শব্দবন্ধ শিল্পসফল রূপকের উদাহরণ। *পদাতিক* থেকে আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব। এই গ্রন্থের ভাষা রূপকের গাঢ়বদ্ধতায় ঋদ্ধ বলেই বাংলা কবিতার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল *পদাতিক*। সুভাষের এই রূপকপ্রীতি তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও লক্ষ করা যায়।

চিরকুট কাব্যগ্রন্থেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় রূপক ব্যবহারে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থে সুভাষের কাব্যভাষা রূপকের সংযত প্রকাশে *পদাতিক*-এর মতোই সফল হয়েছে। কবিতার শরীরকে নির্মেদ এবং নির্ভার করার ফলে পাঠকের চৈতন্যকে তা প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তালিকা দীর্ঘ হলেও সুভাষের ভাষার শক্তিকে অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন –

ক. আমাদের মোমের টুপিতে/ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয় আকাশের সুনীল বিষয়, (কাব্যজিজ্ঞাসা/হ ১/৪৮)

খ. ঢেউয়ের ইশারা গিলি অন্ধকার গলির রোয়াকে, (কাব্যজিজ্ঞাসা/*ফুল ফুটুক*, ১/৪৮)

গ. ছড়ানো দৃশ্যের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ/রচনা করার ইচ্ছা (কাব্যজিজ্ঞাসা/*ফুল ফুটুক*, ১/৪৮)

ঘ. একদা আমারই এই একচক্ষু হৃদয়-হরিণী (কাব্যজিজ্ঞাসা/*ফুল ফুটুক*, ১/৪৮)

ঙ. বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে, (কাব্যজিজ্ঞাসা/*ফুল ফুটুক*, ১/৪৯)

চ. পতনে পথ করেছে ঢালু, গড়েছে বালুসৌধ। (কাব্যজিজ্ঞাসা/*ফুল ফুটুক*, ১/৫০)

ছ. স্তব্ধ জীবন তড়িৎগতির চমক চায়। (রোমন্থন/*ফুল ফুটুক*, ১/৫০)

জ. যমের দুয়োরে একে একে যায় আপনজন। (রোমন্থন/*ফুল ফুটুক*, ১/৫১)

ঝ. গোয়েন্দা চোখ ঘোরে সর্বদা লাল দলিলে ॥ (ভূতপূর্ব/*ফুল ফুটুক*, ১/৫২)

ঞ. চোখে আগ্নেয় বিশ্বাস, গ্রামে জাগছে চাষা। (মুখবন্ধ/*ফুল ফুটুক*, ১/৫৩)

ট. অগ্নিবাণ ছড়ানো চারপাশে। (চলচ্চিত্র/*ফুল ফুটুক*, ১/৫৩)

ঠ. অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রূকুটি। (আহ্বান/*ফুল ফুটুক*, ১/৫৬)

ড. শয়তান যদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন – (চীন : ১৯৪১/*ফুল ফুটুক*, ১/৫৮)

ঢ. বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ, /রুখবো দস্যুদলকে আজ (জনযুদ্ধের/*ফুল ফুটুক*, ১/৫৮)

ণ. অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*ফুল ফুটুক*, ১/৬০)

ত. ...তবু এই দধীচির হাড়/ধ্বংসের বন্যাকে রুধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার – (ঐ, ১/৬১)

থ. পর্বত দাঁড়ায় পাশে/অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ (সীমান্তের চিঠি/*চিরকুট*, ১/৬১)

দ. দশ হাতে ছোঁড়া তার মৃত্যুবাণে/নিয়তি নিহত। (স্বাক্ষর/*চিরকুট*, ১/৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

ধ. জীবন ছড়ায় মাঠে বীজমন্ত্র/অসংখ্য লাঙল/নবান্নকে ডাকে। (স্বাক্ষর/*চিরকুট*, ১/৬৬)

ন. অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাঁটি। (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)

প. রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে, (স্বাগত/*চিরকুট*, ১/৭০)

ফ. পর্বতের চোখে জাগে সাড়া (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)

ব. মুক্তিনিশান হাতে নিয়ে ওঠে চল্লিশ কোটি (দীক্ষিতের গান/*চিরকুট*, ১/৭২)

ভ. বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছোয় ডাক (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫)

উদ্ধৃতিসমূহে ব্যবহৃত মোমের টুপি, ঢেউয়ের ইশারা, কাব্যের জগৎ, হৃদয়-হরিণী, বজ্রমুঠি, বালুসৌধ, তড়িৎগতি, যমের দুয়োর, গোয়েন্দা চোখ, আগ্নেয় বিশ্বাস, অগ্নিবাণ, মৃত্যুর ভ্রূকুটি, দুঃখের প্লাবন, বজ্রকণ্ঠ, কুম্ভকর্ণ, দধীচির হাড়, মুক্তির দুয়ার, অগ্নিবর্ণ, মৃত্যুবাণ, বীজমন্ত্র, অগ্নিগর্ভ, গানের ঘাঁটি, রাস্তার শ্মশান, জনস্রোত, পর্বতের চোখ, মুক্তিনিশান, বজ্রনিনাদ প্রভৃতি রূপকে কবির জীবনদৃষ্টি এবং শিল্পভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থেই কম-বেশি রূপক ব্যবহার করেছেন। রূপকের ব্যঞ্জনায় কবির আকাঙ্ক্ষা প্রবল-প্রাঞ্জল-রসদৃপ্ত হয়ে পাঠকের সৃজনভাবনাকেও সজাগ করে তুলেছে। সুভাষের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কিছু রূপকের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি –

অগ্নিকোণ : ঢেউয়ের ক্ষুরধার তলোয়ার, প্রতিহিংসার পাখা, বজ্রের সুর, প্রাণ-ভোমরা, বংশের বাতি, কামানের মুখ, মৃত্যুর ঝড়, অন্ধকারের গলা, রক্তের নদী, বজ্রের কান (অগ্নিকোণ), মেঘের ধুম্রজটা, রক্তের লাল দর্পণ, অনাগত দিনের ফতোয়া (একটি কবিতার জন্যে), বজ্রের ফিসফাস, লোকে লোকারণ্য, জীবনের বরমাল্য (ঝড় আসছে), মুষ্ঠিবদ্ধ শাণিত হাত, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্র, সমুদ্রের স্বপ্ন (মিছিলের মুখ)।

ফুল ফুটুক : বিদ্যুতের চকিত কশাঘাত, বেগান্ধ পতন, বেদনার আকাশগঙ্গা (জয়মণি, স্থির হও), বাধার দেয়াল (আমি আসছি), স্বর্গের সিঁড়ি, প্রাণপক্ষী (রাস্তার গল্প), অন্ধকারের চোখ, শোকের সাগর (মা, তুমি কাঁদো), ফসলের সোনা, শকুনের চোখ (বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে), অলিগলির গোলক ধাঁধা (সালেমনের মা), অন্ধকারে মোড়া, পেটের আগুন (অগ্নিগর্ভ), অবগুণ্ঠনবতী পৃথিবী (গাছে গাছে), হাড়কালি মানুষ (যেতেই হবে), আগুনের ফুল (আগুনের ফুল), বুকের অশ্রুজমাট শিলা (লাল টুকটুকে দিন), চটের ফেঁসো জড়ানো সমুদ্র (সুন্দর), ইতিহাসের ডাল (গাজনের গান), মৃত্যুর থাবা (কমরেড স্তালিন), গলিতনখ রাত্রি, অন্ধভক্তের দল (শুধু ভাঙা নয়), আতঙ্কের ছায়া (কাণ্ড দেখ), গোবেচারা (সহজিয়া), সময়ের গলা, চোয়াড়ে অন্ধকার, জোয়ানমদ্দ অন্ধকার (সন্ধ্যামণি) গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেল (ফুল ফুটুক না ফুটুক), সিংহের কেশর ফুলিয়ে গর্জমান সমুদ্র (এখন ভাবনা)।

যত দূরেই যাই : সময়ের হাত (যেতে যেতে), উলঙ্গ মৃত্যু (পায়ে পায়ে), শহরের বুকের আঁচল (পোড়া শহরে), ভালোবাসার ফেনা (পাথরের ফুল), খুনখুনে অন্ধকার, জীবনের জল (যেন না দেখি), আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ তার হৃদয় (লোকটা জানলই না), ঢেউয়ের মালা গাঁথা নদী (যত দূরেই যাই), জলদগম্ভীর মহাহাঁক (কে জাগে), মরুভূমির কড়াই (ঘোড়ার চাল), ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্ষুধিত শপথ, ধোঁয়ার কালো গাড়ি (গণনা), পূজোর আকাশ, নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি, রাবণের চিতা (রাস্তার লোক), আকাশ রক্তচক্ষু (বারুদের মতো), আশার নতুন খোল,স্পর্ধা নাচায় ছড়ি, অন্ধকারের পর্দা (রংরুট), শপথের ইস্পাত, জীবনের হ্রদ (ছাপ), ঘোমটা দেওয়া আলো, হিংস্র অন্ধকার (আলো থেকে অন্ধকারে), ঘোমটা দেওয়া অরণ্য (ফলশ্রুতি),

Dhaka University Institutional Repository

দমকল পুরুত, পাকা গিন্নি পৃথিবী (ছেই), স্মৃতির জাল, চাবুক মারছে বিদ্যুৎ, গাছের চুলের মুঠি (দূর থেকে দেখা), মুঠোয় আকাশ, আফ্রিকার কোলে, লাগাম পরা ঘটনার গতি, নদীর ঘাড়, ইস্পাতের শহর (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)।

কাল মধুমাস : দজ্জাল ঘড়ি (তোমাকে বলিনি), নিরক্ষর হাওয়া (জলছবি), ধোঁয়াটে কথা (খোলা দরজার ফ্রেমে), শিশিরবিন্দুর শান্তি (শূন্য নয়), স্মৃতির কোল, বাউল হাওয়া (ভুবনডাঙার বাউল এক), সর্বনাশের কিনার, এবড়ো থেবড়ো সময় (লাল গোলাপের জন্যে), আশ্বিনের কানা মেঘ (কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ), জীবনের বীজমন্ত্র (মর্সিয়ার পর), হৃদয়বীণা (জননী জন্মভূমি), অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায় (এদিকে), অন্ধকারের সিংহাসন (ফোঁটা), ধুরন্ধর শেয়াল (ভুলে যাব না), ভাগ্যচক্রের ঘর্ঘর (খড়ির দাগে), আঁখি খঞ্জন পাখি, শ্বেতপাথরের স্মৃতি (কাছে দূরে), আকাশ মিশকালো, রাজরাজেশ্বরী সাজ (কাল মধুমাস)।

এই ভাই : প্রাণভোমরা (উত্তরপক্ষ), ঘৃণার বজ্র (গাও হে), মনের ঘুড়ি প্যাঁচ (এ ও তা), আগুন রঙের শাড়ি, মরচে-ধরা লতাপাতা, নষ্টনীড় (কে যায়), কলকল্লোলিত আবেগ (যা চাই), ফোঁস ফোঁস করছে আগুন (জলদি জলদি),

ছেলে গেছে বনে : অন্ধকারে চেরা জিভ, বিভেদের এক টুকরো মাংস (অদ্ভুত সময়), বিপন্ন চোখের আগুন (হাত বাড়িয়ে রেখেছি), অগ্নিগর্ভ কাল, রক্তনদী অহল্যা পাথর (নিয়ে যাব শহর দেখাতে), রাবণের চুল্লি (ফেরাই), রক্তবীজ (শব্দে আর নিঃশব্দে)।

তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রূপক-ভাবনার বৈচিত্র্য অনুধাবনের জন্য এর বেশি উদ্ধৃতি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কবিতার ভাষাকে ভারমুক্ত করার জন্য শব্দ প্রয়োগে সুভাষ বিস্ময়কর মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কৃপণতার অভিযোগ থেকে তিনি মুক্ত; কারণ অজস্র রূপকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি তাঁর ভাবকে বিস্তৃত করেছেন। তাঁর কাব্যভাষা পাঠককে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে, কবিকল্পনার সঙ্গে নিজের মনকে বেঁধে নিয়ে পাঠক সৃষ্টির আনন্দ লাভ করে। উপমা-প্রয়োগের অভিনবত্বই তাঁর এই প্রকাশ-নৈপুণ্যের অন্যতম কারণ।

সমাসোক্তি

সমাসোক্তিতে বিষয় বা উপমেয়ের ওপর বিষয়ীর বা উপমানের ব্যবহার বা বৈশিষ্ট্য বা কোন বিশেষ প্রবণতা আরোপিত হয়। 'বর্ণনীয় চেতন, অচেতন, মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী যাই হোক না কেন, তার ওপরে অন্য যে-কোন বস্তুর স্বভাব আরোপ করলেই সমাসোক্তি অলঙ্কার হতে পারে' (নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮ : ৯৯)। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিরা অপ্রাণীর ওপর প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের সংবেদনা বা অনুভব আরোপ করেই সমাসোক্তি সৃষ্টি করে থাকেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সমাসোক্তির ব্যবহার এত বেশি যে তাঁর যে কোন একটি গ্রন্থের সমাসোক্তি নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে সমাসোক্তি তুলনামূলকভাবে কম। তিনি ধীরে ধীরে সমাসোক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রচুর কবিতা রয়েছে যেগুলো পুরোপুরি সমাসোক্তি-নির্ভর। এ প্রসঙ্গে *ফুল ফুটুক* কাব্যগ্রন্থের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'; *যত দূরেই যাই*-এর 'যেতে যেতে', 'দিনান্তে', 'পোড়া শহরে', 'ফলশ্রুতি' এবং *কাল মধুমাস*-এর 'সান্ধ্য' প্রভৃতি কবিতার নাম করা যায়।[৫] কয়েকটি সমাসোক্তির উদাহরণ বিবেচনা করা যাক –

Dhaka University Institutional Repository

ক. জোয়ানমদ্দ অন্ধকার/তার কাঁধটা সরালেই দেখতে পাবো
সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান–/এক জায়গায় ব'সে
আমরা হাপুস-হুপুস ক'রে খাচ্ছি। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

খ. এক পায়ে/আজীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা
জটাধারী ঊর্ধ্ববাহু গাছটা/ঝুঁকে প'ড়ে
যত দেখে, তত অবাক হয় ॥ (ড্যাং ড্যাং ক'রে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬২)।

গ. পেছন থেকে/একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি
তার নাম ধরে/চিৎকার করে ডাকছে। (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৫)।

ঘ. যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে/চাবুক মারছে বিদ্যুৎ
যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে/মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া
যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আঁচড়াচ্ছে/হিংস্র বৃষ্টি। (দূর থেকে দেখো/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩–১০৪)

ঙ. সকালবেলায় জানলার গরাদ ঠেলে ভেতরে আসে
হাসপাতালের রুগীর পোশাকে রোদ্দুর। (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫২)

উদ্ধৃতিগুলো বর্ণনামূলক এবং প্রত্যেকটি বর্ণনা সমাসোক্তির জোরেই যেন ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যার কাজটি সমাসোক্তি সহজেই স্বল্প শব্দ-সমন্বয়ে সম্পন্ন করে নিয়েছে। উদ্ধৃতিগুচ্ছে অচেতন ও বিমূর্ত বস্তু বা বিষয় যেমন সপ্রাণ ও দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে, তেমনি দৃশ্যমান জীবন্ত বস্তুকেও তা মানবীয় সংবেদনায় ঋদ্ধ করে তুলেছে। উদ্ধৃতি ক-এ অন্ধকার একটি বিশেষ বয়সের মানুষের অবয়ব নিয়ে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টান্ত খ-এর একটি বয়স্ক গাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে কোন দৃশ্য দেখে মানুষেরই মতো বিস্মিত হচ্ছে। উদ্ধৃতি গ-এর স্মৃতি কেবল মানুষের বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে নি, কবি তাকে দজ্জাল রমণীর ঝগড়াটে স্বভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। উদ্ধৃতি ঘ-এ বিদ্যুৎ, গাছ, হাওয়া এবং বৃষ্টি – সবই মানুষের বিভিন্ন আচরণ লাভ করেছে, যা সমাসোক্তির একটি বিস্ময়কর সন্নিবেশ। দৃষ্টান্ত ঙ-এ সকাল বেলার রোদ হাসপাতালের রুগীর পোশাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত।

অন্যাসক্ত

জড় বস্তু বা কোন বিমূর্ত বিষয়ের ওপর সপ্রাণ বা চেতনের বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ আরোপিত হলে অন্যাসক্ত অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ, চেতনের ক্রিয়ার পরিবর্তে এখানে কেবল বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। সুভাষের কবিতায় অন্যাসক্তের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। মূলত প্রত্যেক কবিই অন্যাসক্তের প্রয়োগ করে নিজের অনুভবের রঙে বস্তুকে সাজিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় বলেছেন–

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে –
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর' –

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর হলো সে।

কবি বস্তুর মধ্যে সপ্রাণ সচেতনের গুণাবলি আরোপ তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পচেতনার সপ্রাণতা প্রমাণ করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'এক ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্ষুধিত শপথ' (গণনা/*যত দূরেই যাই*, ১/৮২) পঙ্‌ক্তিটিতে আমরা দেখতে পাই বিমূর্ত 'শপথ'-এর ওপর 'ভয়ঙ্কর', 'সুন্দর' এবং 'ক্ষুধিত' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। সুন্দর শব্দটি কেবল দৃশ্যমান ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করার কথা এবং ভয়ঙ্কর ও ক্ষুধিত শব্দদ্বয় সাধারণত প্রাণীর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি অন্যাসক্ত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. শহর বিস্বাদে ঢেকে, ডাকি, 'ঝাউ-ঝুমঝুমির ছায়া এসো হে, (পলাতক/*পদাতিক*, ১/২৯)
খ. বিকৃতমস্তিস্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী। (নির্বাচনিক/*পদাতিক*, ১/৩০)
গ. বিষণ্ন বাজার কাঁদে : 'নিমাই নিমাই !' (চলচ্চিত্র/*চিরকুট*, ১/৫৪)
ঘ. মুমূর্ষু গ্রাম; বর্গীর ভয় ক্ষুদ কুঁড়োয়, (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)
ঙ. ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের/ ক্ষুরধার তলোয়ারে। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)
চ. কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে/কোনো মৃত উজ্জ্বল নক্ষত্র। (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩১)
ছ. চনচনে ক্ষিধের দুরন্ত রাত্রিকে রুখছে (অগ্নিগর্ভ/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৭)
জ. বারবার নড়েচড়ে বসছে/ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার। (একটি অসহ্য দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৬)
ঝ. এক চোয়াড়ে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৭)
ঞ. যৌবনে পা দিয়ে রয়েছে/একটি উলঙ্গ মৃত্যু – (পায়ে পায়ে/*যত দূরেই যাই*, ১/৬৯)
ট. একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ১/৬৯)
ঠ. দিব্যি চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে ডাকাবুকো রাস্তাটা। (ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ১/১০১)
ড. দূরের এক ঘোমটা দেওয়া অরণ্য। (ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ১/১০১)

বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দের বিসঙ্গত স্থানান্তর কবিতায় যোগ করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। পাঠকের চেতনাকে তা আলোড়িত করে, তার কল্পনাপ্রতিভা সচকিত হয়ে ওঠে। সুভাষের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও অন্যাসক্ত অলঙ্কারের বিস্তর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা যেতে পারে –

> দজ্জাল ঘড়ি, নিরক্ষর হাওয়া, পুলকিত পত্রগুচ্ছ, পুলকিত পদচিহ্ন, ঘুঙুর-পায়ে বাউল হাওয়া, ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময়, ঝিঁঝি-লাগা ফ্ল্যাটবাড়ি, কানা মেঘ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঝাঁঝরি, নীল ব্যথার মোচড়, মারমুখো মেঘ, সুন্দর গন্ধ (*কাল মধুমাস*); ছিন্নভিন্ন ছায়া, ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগা শব্দ (*এই ভাই*); হাঁ-করা আকাশ, ক্লান্ত রাত জাগা দূরাগত ট্রেন, নারীমাংসলোভী বইপুঁথি, ধৃষ্ট সিগন্যালের আলো, শোয়ানো আর দাঁড় করানো অক্ষর, গা-ঢাকা দেওয়া অন্ধকার (*ছেলে গেছে বনে*); ক্ষিধেয় কঁকিয়ে ওঠা চিৎকার, নিরক্ষর শালপাতা, মাইনে-করা কলম, সেয়ানা গাছ (*একটু পা চালিয়ে, ভাই*); ভীরু কবিতার খাতা (*জল সইতে*); রাক্ষুসী সময় (*চইচই-চইচই*), মৃত শহর (*বাঘ ডেকেছিল*); রক্তাক্ত সময়, চোখ টাটানো হিংসে, মুখ লুকোনো মেঘ, নিষ্ঠুরতার জবরদস্ত স্মৃতি (*যা রে কাগজের নৌকো*); শশব্যস্ত পদশব্দ (*ধর্মের কল*)।

অন্যাসক্ত অলঙ্কার কবিতায় স্বতন্ত্র অলঙ্কার হিসেবে প্রযুক্ত হয় না। কবি তাঁর ভাবনাকে প্রকাশের প্রয়োজনে অন্যাসক্ত অলঙ্কারের সহায়তায় নিষ্প্রাণ বস্তুকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও আমরা লক্ষ করেছি, বিশেষণরাশির স্থান-পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে বিসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আপাত অসঙ্গতির আড়ালে কবি অনুভূতির গভীরতর কোন সত্য বা গূঢ়ার্থকে মূর্ত করে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত অলঙ্কার কোন রকম অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় না দিয়ে তা কবির ভাবকে পাঠকের বোধের সীমায় পৌঁছে দেয়। কবিতার ভাষায় অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি পরিচিত শব্দের শরীরে জুড়ে দেন এক অনাস্বাদিত দীপ্তি, যা অনায়াসে আমাদের আলোড়িত করে, পরিতৃপ্ত করে। কবির অভিজ্ঞতার জগৎ অন্তর্ভূমির গাঢ় চেতনার স্পর্শে অভিষিক্ত হয়ে কাব্যভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। অলঙ্কারের সাহায্যে তিনি কবিতায় অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিতের উদ্ভাসন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন বলেই অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর পারঙ্গমতা স্বীকার করে নিতে হয়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. অলঙ্কার সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৮ : ২০১) বলেছেন, 'আসল কথা এই যে, অলংকার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার অলঙ্কার আলোচনায় উপরিউক্ত মন্তব্য বিবেচনায় থাকা জরুরি। কারণ, তিনি এমন এক কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের আটপৌরে ভাষা থেকে খুব দূরবর্তী না হয়েও পাঠকের রসানুভূতি জাগাতে সক্ষম ।

২. এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা কবিতায় অনুপ্রাসের অভিনবত্ব সৃষ্টিতে এঁরা দুজনই উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রকবিতার যে সঙ্গীতময়তা পাঠককে সম্মোহিত করে, তা-ও অনেকাংশেই অনুপ্রাসের অবদান। তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথের হাতে শিক্ষা নিলেও অনুপ্রাসের সেই শক্তিতে সমর্পিত হয়েছেন বলে মনে হয় না।

৩. স্তেফান মালার্মে, *সাহিত্য ও সঙ্গীত*, দ্র. *তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ*, অনুবাদ : মোহাম্মদ হারুণ-উর-রশীদ, ১৯৮৪, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ২৫।

৪. এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর (১৯৯৯ : ৫২) মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> রোমান্টিকতার দাবি এই যে কবিতা হবে সন্ধানধর্মী; আবিষ্কারপ্রবণ; বিশ্বের আপাতবিদৃশ্য বস্তুরাশি – আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিরকাল যারা পরস্পরের সুদূর ও অপরিচিত হ'য়ে থাকে – তাদের মধ্যে স্থাপন করবে একটি ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ।

৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' (১/১৬২-১৬৩) কবিতায় একটি গাছের ওপর মানবিক সংবেদনা সৃষ্টি করেছেন : 'পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ/কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে/হাসছে'। 'যেতে যেতে' (২/৬৭–৬৯) কবিতায় নদী ও সময়কে দিয়ে মানুষের মতো কাজ করিয়ে নেয়া হয়েছে। 'দিনান্তে (২/৭১) কবিতায় সূর্য, সন্ধ্যা, অন্ধকার ও হাওয়া লাভ করেছে মানুষ ও অন্য প্রাণীর আচরণ। 'পোড়া শহরে' ২/৭২–৭৩) কবিতায় ঘাস, শহর, ট্রাম, নদী ইত্যাদি সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। 'ফলশ্রুতি' (১০১–১০২) কবিতায় একটি হরিণ মানবিক অনুভবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যা' (২/১৪৩–১৪৫) কবিতায় মেঘ, হাওয়া, মালগাড়ি, জাহাজ ইত্যাদিতে কবি মানুষের আচরণ আরোপ করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. জমিল শরাফী (সম্পাদক), ১৯৭৫, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন*, প্রথম বাংলাদেশী সংস্করণ, লালন প্রকাশনী, ঢাকা।

২. প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৩. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৯, *কালিদাসের মেঘদূত*, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৪. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মোহাম্মদ হারুণ-উর-রশীদ, ১৯৮৪, *তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৪, *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৭. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৬৩, *উপমা কালিদাসস্য*, নব সংস্করণ, কলকাতা।

৮. সৈকত আসগর, ১৯৯৩, *বাংলাদেশের কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯. সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৮৯, *কবিতার রূপকল্প*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০. Herbert Read, 1950, *Collected Essays in Literary Criticism*, second edition, Reprinted, MCMLiv and MCMLxii, Faber & Faber Ltd. London.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিত্রকল্প

কবিতার মর্মে প্রবেশ করে কবির অনুভব-আবেগ-অভিজ্ঞতাকে আস্বাদনের আনন্দ এনে দেয় চিত্রকল্প। শব্দই কবির চৈতন্যের নানা প্রান্তকে প্রাণবন্ত করে তোলে। একজন কবি শব্দের সন্নিবেশে নতুনত্ব এনে, তাঁর বোধের বর্ণিল প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হলেই তিনি পাঠকের চিন্তাকে উদ্দীপিত করতে পারেন। কবির প্রকরণ-কৌশল পরিচিত শব্দের ভেতর দিয়ে যে মানস-প্রতিবিম্ব নির্মাণ করে, তার প্রগাঢ় অনুভব পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকেও আলোড়িত করে। কবি-প্রাণের উষ্ণতায় তাঁর শব্দ-প্রতিমা সজীব হয়ে ওঠে। কবির অভিজ্ঞতার শৈল্পিক সংহতি অপূর্ব দীপ্তি লাভ করলে তা অন্যের আনন্দেও যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা। চিত্রকল্প কবির উপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে কবিতার হৃদ্‌স্পন্দনে পাঠককে জাগ্রত করে। কবিকল্পনার সঙ্গে পাঠকের অনুভূতির যোগেই চিত্রকল্প সার্থকতা লাভ করে।

চিত্রকল্পে কবির জীবনদর্শন শৈল্পিক ঋদ্ধি লাভ করে। তাই কবিতার সজীবতা বা সপ্রাণতা চিত্রকল্পে প্রতিফলিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন স্টিফেন জে. ব্রাউন।[১] সি. ডি. লুইস বলেছেন, 'What the moderns look for in imagery, I suggest, is freshness, intensity, and evocative power (C. Day Lewis 1968 : 40). চিত্রকল্পে কবির তাৎক্ষণিক আবেগ মেধার স্পর্শেই অন্য মাত্রা লাভ করে বলে এজরা পাউন্ড উল্লেখ করেছেন।[২] স্টিফেন স্পেন্ডারের বিবেচনায় চিত্রকল্পই কবিতার মূল উপাদান, 'The image is the basic unit of poetry...' (Stephen Spender 1965 : 120)। চিত্রকল্প শব্দনির্মিত চিত্রের মধ্যেই তার অর্থকে সীমাবদ্ধ রাখে না, পাঠকের চেতনার রঙ তাতে যুক্ত করে অধিকতর ব্যঞ্জনা। দৃশ্যমান ছবির সঙ্গে মনের ছবি যুক্ত হয়ে তা অর্জন করে তৃতীয় মাত্রা।[৩] চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতাকে অনুধাবনের বিচিত্র পথে পাঠককে অনুপ্রাণিত করে। 'অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ৯)। কবিতার রহস্যময়তা ও জটিল স্বপ্নময়তার পাঠ নির্ণয় করে চিত্রকল্প। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে–

> ...একটি শব্দ বা চিত্রকল্প তখনই, 'প্রতীকী' হয়, যখন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এমন কিছু, যা তার স্পষ্ট, প্রকট, তাৎক্ষণিক অর্থের চেয়েও আরো কিছু বেশি (কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ ১৪০৬ : ৩–৪)।

চিত্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমালোচকের মতামতের ভিত্তিতে একজন গবেষক চিত্রকল্পের মৌল প্রবণতাকে নিম্নরূপে সূত্রাবদ্ধ করেছেন–

ক. কবিতায় ব্যবহৃত শব্দচিত্র বা উপমানচিত্রকে চিত্রকল্পে উন্নীত হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়, তা হলো – উপমানচিত্রটিকে হতে হবে (১) সজীব বা প্রাণময়, (২) প্রগাঢ় অনুভবযুক্ত ও (৩) মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এই তিনটি শর্ত যখন একটি উপমানচিত্রে রূপায়িত হয় তখনই রচিত হয় পরিপূর্ণ চিত্রকল্প।

খ. চিত্রকল্পে কবি-মনের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অংশে লুকিয়ে থাকা অভিজ্ঞতার বর্ণাঢ্য প্রতিফলন ঘটে।

গ. কবির দার্শনিক অভিপ্রায়কে চিত্রকল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত প্রবণতার আলোকে চিত্রকল্পের শক্তি, সৌন্দর্য ও ঋদ্ধি অনুধাবন করা সম্ভব। চিত্রকল্পই কবির কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ, যেখানে সম্ভাবনার প্রায় সবটুকুই সম্ভব হয়ে উঠতে চায়।

এজরা পাউন্ডের নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯১২-১৯১৭) ইংল্যান্ডে যে চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনের জন্ম হয়, তা উইন্ডহ্যাম লুইস, এমি লাউয়েল ও হ্যারিয়েট মনরোর সমর্থনে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে হিলডা ডোলিটন, ডি. এইচ. লরেন্স, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস, জন গোল্ড ফ্লেচার এবং রিচার্ড এলডিংটন এই কাব্যান্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিরিশের কবিরা ইউরোপীয় কাব্যান্দোলনের নানা প্রকরণ-প্রকৌশলে বাংলা কবিতাকে ঋদ্ধ করলেও চিত্রকল্পবাদীদের দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের কবিতায় চিত্রকল্প সৃজনের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা গেলেও তাতে কবিচৈতন্যের যে পরিচয় বিধৃত, তা স্বকীয় শিল্পভাবনায় ঋদ্ধ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বক্তব্য-নির্ভরতা থেকে ক্রমশ চিত্রনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সমাজ-সম্পৃক্ত যে শিল্পাদর্শকে তিনি ধারণ করেছেন, তাঁর চিত্রকল্প সেই শিল্পসত্যকেই মূর্ত করে তুলেছে। তাঁর শব্দকল্প কোন জটিলতা ও অস্পষ্টতাকে প্রশ্রয় দেয় নি, সেখানে সহজ-স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই নির্মিত হয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। কারণ 'চিত্রকল্পে মসৃণ ও সমাজবীক্ষার তীব্র অভীপ্সা বস্তুর বাস্তবরূপের ভেতর রহস্যময় ভিন্নরূপের সন্ধান দেয় – যেন চিরচেনা জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্যজগৎ'।[৫] পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় বিপর্যস্ত মানবমনের নানা প্রান্তে আলোক প্রক্ষেপণের প্রয়োজনেই কবিতার অন্তর্ভূমিতে কবি বাস্তব ও স্বপ্নের আলো-আঁধারিকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। ফলে আধুনিক কবিতায় মানুষের মগ্নচেতনার অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যয় এবং সামূহিক নির্জ্ঞান মিথ আকারে চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে (বার্ণিক রায় ১৩৩৮ : ৩৪)। সুভাষের কবিতায় মিথিক আবহে নির্মিত নতুন বাস্তবতাও পাঠককে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান করে। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প হিসেবে অন্ধকারের অবস্থিতি হয়তো কম নয়, কিন্তু কবির উত্তরণ-অন্বেষায় অন্ধকারের বিপরীত প্রান্তই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

চিত্রকল্প-সৃজনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক*-এ চিত্রকল্প নেই বললেই চলে। তাঁর শাণিত কাব্যভাষা পরিশীলনের মধ্য দিয়ে যতই মৌখিক উচ্চারণের নিকটবর্তী হয়েছে, ততই তা অর্জন করেছে চিত্রময়তা। সুভাষের ভাবনা বিচিত্র বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং তাঁর স্নেহজ শব্দ অনুভবের সততায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

চিত্রকল্প-বিষয়ক আলোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে একই বিষয়ে একাধিক চিত্রকল্পের বিশ্লেষণ করতে হয়, যাতে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই আমরা তাঁর কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পসমূহ অনুসন্ধান করে সেগুলোকে বিষয় ও মোটিফ অনুযায়ী সন্নিবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমরা লক্ষ করব, সুভাষের বাকপ্রতিমা তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে নি, বরং বিশ্বাসের উত্তাপ তাতে যুক্ত করেছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। নিম্নোক্ত চিত্রকল্পসমূহে তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার বর্ণিল প্রান্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে –

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য

আলোর উৎস হিসেবে সূর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সূর্যের অনুপস্থিতি পৃথিবীকে রহস্যাবৃত করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সূর্যকে দিনের প্রহরায় নিয়োজিত দেখতে পান। ফলে সন্ধ্যায় কর্তব্য শেষ করে সূর্য যেন রাত্রির কালো পাহাড়ে হেলান দিয়ে ক্লান্ত চোখে অতিক্রান্ত সময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে –

দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে
সূর্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো
পাহাড় থেকে
ক্লান্ত চোখে। (এখানে/*পদাতিক*, ১/৩৮)

শব্দচিত্রটিতে সূর্যের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপিত হওয়ায় তা অন্যমাত্রা লাভ করেছে। রাত্রির অন্ধকারে সূর্য তার বিশাল পাখা মেলে দিয়ে উড়ে যায় না, দিনের ক্লান্তিতে সে পাহাড়ে হেলান দেয়, আর নিমজ্জিত হয় গভীর ভাবনায়। কবি তাঁর দিন-যাপনের ক্লান্তিকেই যেন সূর্যের শরীরে অর্পণ করেন, যা পাঠকের চৈতন্যকেও আবেশিত করে ।

কখনো-বা অস্তগামী সূর্যের লাল আভা কবির চোখে রক্তগঙ্গা হয়ে যায়। রক্তিম চোখের ইশারা শাসনের ভঙ্গিতে পথচারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সময় মতো গন্তব্যে পৌছানো কত জরুরি –

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল
সূর্য। (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)

চিত্রকল্পটিতে উপমেয় সূর্যের সঙ্গে উপমান দুর্ধর্ষ ডাকাতের হিংস্রতাকে উৎপ্রেক্ষা সূত্রে গেঁথে দিয়ে কবি মূলত সময়ের অনিবার্য গতিকেই চিত্রিত করেছেন। ডাকাতের আস্তানায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে অস্তগামী সূর্যের প্রবল প্রস্থানের তুলনায় চমৎকার বাকপ্রতিমা সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের চলে যাওয়ার এই দৃশ্যকল্প কবি-হৃদয়ের অনুভবে জারিত হয়ে পাঠকের চোখেও সতর্কতার ইঙ্গিত হয়ে যায়।

কালচেতনা : সময়-ঘড়ি-ঘড়ির কাটা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কালচেতনা একটি কাব্যপঙ্‌ক্তিতে চমৎকারভাবে ধৃত হয়েছে। কবি সহজ ভঙ্গিতে কালের গায়ে পরিয়ে দিয়েছেন সিপাহীর উর্দি। কাল বা সময়ের চলে যাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে সিপাহীর কুচকাওয়াজের সাদৃশ্য যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি সিপাহীর শাসন বা নির্দেশের ধরনটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

ক. কালের সেপাই এসে ঘাড় ধ'রে তুলে দিয়ে বলল : যা– হট্ ! (যা হট্ /*কাল মধুমাস*, ২/১৪৬)

খ. কালের সেপাই বসে খেলা দেখে।
এবার বড়ের চালে কিস্তি পড়বে ?
নাকি হবে মন্ত্রীর পালট ॥ (যা হট্ /*কাল মধুমাস*, ২/১৪৭)

কাল বা সময়ের শাসন উপেক্ষা করা অসম্ভব বলেই তিনি ঘাড়ে হাত দেয়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন। কালের সেপাই

Dhaka University Institutional Repository

যখন খেলা দেখতে বসে, তখন দাবার চাল অনায়াসেই রাজনৈতিক পালা-বদলের প্রসঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর রাজা-মন্ত্রীর পতন বা কিস্তির ভরাডুবির মতো এর প্রত্যক্ষদর্শী কালও পাঠকের দৃষ্টিসীমায় পৌঁছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। রূপকধর্মী এই চিত্রকল্পে উপমেয় কাল দৃশ্যরূপময়তার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শরূপময়তাও লাভ করেছে।

স্বকালের নানা চিহ্নকে ধারণ করেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। ফলে সময়ের অনুষঙ্গ তাঁর চৈতন্যে বিভিন্ন রূপে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। সময়-কেন্দ্রিক চিত্রকল্পে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে কবির কথোপকথনে বোঝা যায়, কী নিবিড় আত্মীয়তায় পরস্পর আবদ্ধ, 'আমার কাঁধে ওপর হাত রাখল/সময়।/তারপর কানের কাছে/ফিসফিস ক'রে বলল—/দেখলে !/কাণ্ডটা দেখলে !/আমি কিন্তু কক্ষনো/তোমাকে ছেড়ে থাকি না।' (*যেতে যেতে/যত দূরেই যাই*, ২/৬৭)। উদ্ধৃত শব্দকল্পে রূপকথার ঢঙে সময়কে সজীব করে তোলা হয়েছে। কবির পায়ে পায়ে সময়ের এই এগিয়ে যাওয়ায় সময় দৃশ্যরূপময় হয়ে ওঠে। সময়-সম্পর্কিত আরো কিছু চিত্রকল্পের উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. চষা মাটির মতো এবড়ো থেবড়ো সময়;
চলতে কষ্ট হলেও জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
(লাল গোলাপের জন্যে/*কাল মধুমাস*, ২/১২২)

খ. একটুও না দাঁড়িয়ে
তার ওপর দিয়ে
লাফাতে লাফাতে চলে গেল
সময়। (আনন্দ/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/১৯৫)

গ. থাকা আর না থাকার মধ্যে
এখন
দোল খাচ্ছে সময়। (রাস্তা/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২৭)

ঘ. আমাদের আগাপাশতলায়
এ বড় বাহারে খেলা আমার চারদিকে আল দিয়ে রেখেছে
সময় (বুড়ি বসন্ত/*ধর্মের কল*, ৫/২২৮)

উদ্ধৃতি ক-তে উপমান চষা মাটির এবড়ো থেবড়ো অবস্থার সঙ্গে উপমেয় সময়কে গ্রথিত করে যে বাকপ্রতিমা নির্মিত হয়েছে, তাতে বৈরি সময়ের ক্ষতবিক্ষত বাস্তবতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রতিকূলতার গর্ভেই কবি সম্ভাবনার বীজকে সুপ্ত অবস্থায় দেখতে পান। ফলে পথের ক্লান্তি ভুলে বিপন্ন সময়ের বিপরীত প্রান্তে পৌঁছানোর বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে প্রগতিশিবির। উদ্ধৃতি খ-এ দেখানো হয়েছে লাফিয়ে চলা সময়ের বিরামহীন গতি, যা অতীতকে বিস্মৃতির ধুলোয় বিলীন করে দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেয়। সময়ের দ্বিধাকে দোল খাওয়ার রূপকে চিত্রায়িত করে চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে উদ্ধৃতি গ-এ। কবি-অস্তিত্বের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির মধ্যবর্তী সময়কে দোলনায় চড়িয়ে দেওয়ার ফলে সময় দৃশ্যরূপময়তা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি ঘ-এ সময় কবিকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে গ্রাম্য হাট-বাজার-মেলায় খেলা দেখতে জড়ো হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ যেমন চারদিকে আল দিয়ে দাঁড়ায়, সময়ের বন্ধনও তাঁর কাছে সেই রকম মনে হয়েছে। এভাবেই সময় কবির শব্দবন্ধে অবয়বপ্রাপ্ত হয়ে চিত্রকল্পে উন্নীত হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু কবিতায় অস্থির ও অশুভ জীবনযাত্রার অশান্ত ও অকল্যাণকর বাস্তবতার রূপকল্প সময়-অনুষঙ্গে নির্মিত হয়েছে। সমূহ ক্ষত ও ক্ষতির প্রত্যক্ষদর্শী সময় কেবল সাক্ষিগোপাল হিসেবেই থাকে নি, অপশক্তিকে ইন্ধন জোগাতে সময় যেন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে নিষ্ঠুর কুঠার। তাই কবি যখন বলেন, 'রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে/ নিষ্ঠুর সময়, সারা পৃথিবীকে টানছে/ রসাতলে /এখনও আকাশচুম্বী ভয়।' (হাত বাড়ালে/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৬) – তখন হন্তারক সময়ের হাতে পায়ে রক্তের দাগ সময়কে কেবল দৃশ্যময়ই করে তোলে না, সময়ের হিংস্র প্রবৃত্তি পাঠকের বিবেককেও বিচলিত করে। নিচের উদ্ধৃতিসমূহেও কবির মানস-প্রতিবিম্ব অসুস্থ সময়কে অবলম্বন করে কেমন প্রাণময় হয়ে উঠেছে –

ক. রাস্তার গর্তগুলো
ছোট থেকে বড় করতে করতে
এগিয়ে চলেছে সময় ॥ (সময়ের জালে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৭)

খ. ষাঁড়ের মতন তাড়া করে ফিরছে
পেছনে সময়। (এই যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮০)

গ. যখনই তাকাই বাইরে
দেখি ফুটপাথে
সময় দাঁড়িয়ে আছে
ভর দিয়ে ক্রাচে। (অন্ধকার গিলে খাচ্ছে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৭)

ঘ. এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে আসছে সময়
দেখে একদল ছ্যা ছ্যা করছে
একদল দিচ্ছে দুয়ো... (লাফ দেওয়ার গল্প/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৮)

উদ্ধৃতি ক-এ সময়ের অত্যাচার অমসৃণ পথের ছোট গর্তগুলোকে আরো বড় করে তুলেছে। তারই ওপর দিয়ে সময় যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। সময়ের এই ধ্বংসাত্মক চেহারা ভাঙা রাস্তার মতোই পাঠকের বিবেককে বিচলিত করে। উদ্ধৃতি খ-এ সময়ের উপমা হিসেবে ষাঁড়ের ব্যবহার চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। দুঃসময়ের তাড়া করে ফেরার সঙ্গে দুরন্ত এবং ধ্বংসাত্মক ষাঁড়ের গতির তুলনায় সময়ও দৃশ্যরূপময়তা লাভ করেছে। সাদৃশ্যধর্মিতার ভিত্তিতে নির্মিত এই চিত্রকল্পে কবি-কল্পনা হয়ে উঠেছে দূরসঞ্চারী। উদ্ধৃতি গ-এ কবি সময়কে ক্রাচে ভর দিয়ে ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সময়ের এই পঙ্গুত্ব প্রকৃত অর্থে প্রগতিচিন্তার খুড়িয়ে চলাকেই চিহ্নিত করেছে। রূপকধর্মী এই চিত্রকল্পে কবির কল্পনাপ্রতিভা বিস্ময়কর সক্রিয়তা লাভ করেছে। সময়কে পিছিয়ে আসতে দেখে একদলের তিরস্কার ও অন্যদলের বাহবা ধ্বনির প্রাণময় দৃশ্যকে ধারণ করেছে উদ্ধৃতি ঘ। কবির শব্দকল্প সময়কে কেবল দৃশ্যময়ই করে নি, পাঠকের শ্রবণেন্দ্রিয়কেও সচকিত করে তুলেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘড়ি বা ঘড়ির কাঁটা অভিনব ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। সময়কে চিহ্নিত করার এই যন্ত্র কবিকল্পনায় অনায়াসেই তার যান্ত্রিকতা অতিক্রম করে অন্যমাত্রায় উদ্ভাসিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সময়ের হাতে মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশের প্রয়োজনে ঘড়ির কাঁটা সুভাষের চিন্তায় প্রতীকী চরিত্র লাভ করেছে। নিচের উদ্ধৃতিগুলো বিবেচনা করা যাক –

ক. সময়ের গলায়
এখনও আড় হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

খ. দজ্জাল ঘড়িটা
একদিন আমাকে বাজিয়ে দেখে নেবে ব'লে
টিকটিক শব্দে শাসিয়েছে। (তোমাকে বলিনি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৫)

গ. দেয়ালে ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময়;
সমস্ত ভার হারিয়ে আমি যেন ভাসছি। (কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ/*কাল মধুমাস*, ২/১২৪)

ঘ. ঘড়ির কাঁটায় ছিন্নভিন্ন
এক রক্তাক্ত সময়। (যদি বলি/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৫)

উদ্ধৃতি ক-এ সময়কে সজীবতা দেয়া হয়েছে এবং সময়ের গলায় ঘড়ির কাঁটা আটকে যাওয়ার রূপকে কবি মূলত দুঃসময়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। বেড়ালের পায়ে ধরে গলায় আটকে যাওয়া কাঁটা বের করার লোকগল্পকে কবি চমৎকার রূপকল্পে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সুসময়ের জন্মদান কবিকল্পনায় সন্ধ্যামণি ফুল হয়ে ফোটে, 'উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার/এই তো সময়'। দৃষ্টান্ত খ-এর ঘড়ি ঝগড়াটে মহিলার রূপকল্পে কবির শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে। অস্থির সময়ের অশালীন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিকে 'দজ্জাল' শব্দটি মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। দুঃসময়ের শাসন কবির প্রগতিচেতনার পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে চিত্রিত করেছে বলে মনে হয়। এই রূপকল্পের সঙ্গেও কবি জুড়ে দিয়েছেন বেড়ালের প্রসঙ্গ– 'আমার ফেলে যাওয়া লেখার কাগজটা নিয়ে/শয়তান বেড়ালটা/কাল সারা রাত খেলেছে'। বেড়ালের উপস্থিতি যে পরাবাস্তবতাকে চিহ্নিত করে, তার আবেদন ঘড়ির টিকটিক শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলে। উদ্ধৃতি গ ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময়কে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে। কবিচৈতন্যে সময় যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। এছাড়া কাঁটায় বিদ্ধ সময় ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের অন্তিম মুহূর্তকেও মনে করিয়ে দেয়। প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের দৌরাত্ম্যে কবির বিরক্তিও অপ্রকাশিত থাকে নি। কবির ভারহীনতা মগ্নমুহূর্তের শেকড়-উন্মুল বোধের স্মারক হয়ে উঠেছে। ঘড়ির কাঁটায় ছিন্নভিন্ন সময়ের রূপকল্পে কবির বিপন্নতা ইন্দ্রিয়বেদ্যতা লাভ করেছে উদ্ধৃতি ঘ-এ। সময়কে রক্তাক্ত করার রূপকে কবির দাহ পাঠককেও যন্ত্রণাদগ্ধ করে এবং রক্তের প্রসঙ্গ এক ধরনের দ্রোহের জন্মও যেন সম্ভব করে তোলে। ঘড়ি ও ঘড়ির কাঁটায় কবি-কল্পনা যে বাকপ্রতিমা গড়ে তুলেছে তাতে বিক্ষুব্ধ ও বিপন্ন পরিস্থিতি দৃশ্যরূপময়তা লাভ করেছে। কবির হৃৎস্পন্দন ও ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ একাকার হয়ে যে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে তা-ই তাঁর চিন্তাকে চিত্রকল্পে উন্নীত করেছে।

দিনরাত্রি বিষয়ক : সকাল-দিন-সন্ধ্যা-রাত্রি

Dhaka University Institutional Repository

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেতনায় সকাল বিস্ময়ের, রহস্যের, আগ্রহের, আশ্চর্যের অনুভূতি সঞ্চার করেছে। সকালের আয়নায় সারা দিনের একটি সম্ভাব্য অবয়ব নির্মাণ করে নিয়েছেন তিনি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি –

ক. রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল। (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৩)

খ. এখুনি
বাসন-ধোয়া জলে
নিজের মুখ দেখবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরও একটি সকাল। (আমরা যাব/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৭)

গ. দেখা দেয় ছিঁড়ে
কুয়াশার জাল
রাতের শিশিরে
গা ধোয়া সকাল। (বাঘ ডেকেছিল/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৬১)

উদ্ধৃতি ক-এর সকাল রোমাঞ্চকর এবং বিস্ময়কর। আশ্বিনের সকাল কবির চোখে বিজয়ের আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি অতিক্রম করে জনতার জাগরণ যে নতুন দিনের সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছে, এই সকাল সেই উদ্দীপনায় পুলকিত, প্রণোদিত। আশ্বিনের আরো একটি সকাল আমরা দেখেছি, যা কবির চেতনার শহরে বেআব্রু হয়ে শুয়ে আছে। পোড়া শহরের যে বাস্তবতায় এই সকালের আগমন, তাতে কবির বিস্ময়বোধ কোন ইতিবাচক আনন্দের স্মারক হয়ে ওঠে নি –'কেমন করে এ পোড়া শহরে/বুকের আঁচল খসিয়ে দিয়ে/কী আগ্রহে শুয়ে আছে/আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল/রং যার/ঠিক চাঁপাফুলের মতো' (পোড়া শহরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)। চিত্রকল্প হিসেবে এটিও মনন-দ্যোতনায় ঋদ্ধ। উদ্ধৃতি খ-এ কারখানার শ্রমিকের চোখে বিষণ্ন, বিবর্ণ সকালকে চিত্রিত করেছেন কবি। চিত্রকল্পটিতে বাসন-ধোয়া নোংরা জলের দর্পণে ধোঁয়াচ্ছন্ন একটি সকালের মুখ দেখার বর্ণনা কবি-হৃদয়ের অনুভববেদ্যতায় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। এই চিত্রকল্পটিকে শ্রমশোষণে নিষ্পেষিত শ্রমিকের জীবনচিত্রও বলা যেতে পারে। উদ্ধৃতি গ-এ সকাল অবশ্য যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, পবিত্র এবং রহস্য-উদ্দীপক। কুয়াশার জাল ছিঁড়ে রাতের শিশিরে স্নান শেষ করে যে সকাল এখানে হেসে উঠেছে তার উচ্ছলতা উজ্জ্বলতা দৃশ্যময়তা লাভ করেছে বলেই চিত্রকল্প হিসেবে এর সার্থকতা স্বীকার করতে হয়।

দিনের আলোয় সব কিছু দেখার ইচ্ছে যতই তীব্র হোক না কেন, দিনের কথা ভাবতে ভাবতেই দেখা যায়, তার চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে। সুন্দর দিনের স্বপ্ন কবিকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই মিছিলের বিশেষ কোন মুখের অবয়বে কবির স্বপ্নালোক ঝলমল করে ওঠে, তাঁকে অন্ধকার অতিক্রমণের পথে প্রেরণা জোগায়। কারণ তিনি সব মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার মতো রঙিন দিনের অপেক্ষায় – 'তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে/আনতে চলেছি/লাল টুকুটুকে দিন ॥' (লাল টুকুটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৩)। এই 'লাল টুকটুকে দিন'-এর জন্য কবির প্রস্তুতিই দিনকে দৃশ্যময়তা দিয়েছে। লাল রং দিনকে ইন্দ্রিয়বেদ্যতা দান

Dhaka University Institutional Repository

করায় চিত্রকল্প হিসেবে এটি চমৎকার। দিনের চলে যাওয়ার বর্ণনায় কবির বেদনার ছাপ খুবই স্পষ্ট। নিচের উদ্ধৃতি দুটো বিবেচনা করা যাক –

ক. দুপায়ে রাস্তার কাদা ঘুঁটে ঘুঁটে
ধ'রে ধ'রে পার হয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটা
এই মাত্র চলে গেল
আরও একটা দিন। (আরও একটা দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৩)

খ. হাতে চাবুক, ঘোড়ায় দেওয়া জিন
তর সয় না
আমাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছে দিন (ফিরি/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২০)

যে পথ দিয়ে দিন চলে যায় ,তা মোটেও মসৃণ নয়। কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, ভাঙা, বিশ্রী পথে কবি দিনকে বিদায় দিয়েছেন উদ্ধৃতি ক-এ। বিশেষ করে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকোটা ধরে ধরে পার হওয়ার সময় দিনকে যেন আমরাও একটু ছুঁয়ে দিতে পারি। চিত্রকল্প হিসেবে এই উদ্ধৃতিটি কবির কল্পনাপ্রতিভার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। উদ্ধৃতি খ-এ কবি দিনকে তুলে দিয়েছেন ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে ধাবমান দিনের অদৃশ্য হওয়ার তুলনা চিত্রকল্পটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। দিনের হাতে চাবুক ঘোড়ায় পিঠকে স্পর্শ করার আগেই পাঠকের কল্পনা দ্রুতগতিতে দিনের সহযাত্রী হয়ে সামনে এগিয়ে যায়। অবশ্য দিনের প্রতি কবির দরদও বিস্ময়কর বাকপ্রতিমা নির্মাণ করেছে *ফুল ফুটুক* কাব্যগ্রন্থে। সুভাষ যখন বলেন, 'এখন একটু চোখে চোখে রাখো –/দিনগুলো ভারি দামালো;/দেখো,/যেন আমাদের অসাবধানে/এই দামালো দিনগুলো/গড়াতে গড়াতে/গড়াতে গড়াতে/আগুনের মধ্যে না পড়ে।' (এখন ভাবনা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৪), তখন দিনকে তিনি একটি ছোট্ট শিশুর মতো কোলে তুলে নিতে চান, সারাক্ষণ তিনি দিনকে চোখে চোখে রাখতে চান। কিন্তু যে আগুনের ভয়ে বিচলিত তিনি, সেই আগুনই তো একদা কাঙ্ক্ষিত ছিল তাঁর। কবির বিশ্বাসকে বিবেচনায় না এনে শিল্পসত্যের আলোকে একথা অনায়াসে বলা যায় যে, চিত্রকল্প হিসেবে এটি চমৎকার।

সন্ধ্যা দিনের ক্লান্তি দূর করে মানুষকে পৌঁছে দেয় রাত্রির কোলে। সন্ধ্যার বাঁশি বাজতেই সবাই ঘরে ফিরে যায়। শহুরে শ্রমজীবী মানুষের সন্ধ্যা চিত্রিত হয়েছে, যেখানে সমবেত কণ্ঠস্বরের প্রস্তুতি সকল 'আমি'কে 'আমরা'য় রূপান্তরিত করে। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি –

তারপর সন্ধ্যা এসে
খুঁটে খুঁটে তুলে
এক জায়গায় আবার আমাদের
মিলিয়ে দিয়ে গেল। (কে জাগে /*যত দূরেই যাই*, ২/৭৯-৮০)

এখানে সন্ধ্যার সজীবতা ও সক্রিয়তা শব্দচিত্রটিকে রূপকল্পে উন্নীত করেছে।

রাত্রির রহস্যময়তা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতিবন্ধকতার প্রতীকী অর্থমাত্রায় উদ্ভাসিত হলেও শ্বাপদের হিংস্রতা সপ্রাণ হয়ে ওঠায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি চিত্রকল্পের প্রগাঢ়তা লাভ করেছে বলে মনে হয় –

শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে

Dhaka University Institutional Repository

গলিতনখ এ রাত্রি। (শুধু ভাঙা নয়/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৩)

রাত্রির বিস্তৃত থাবায় বিপন্ন মানুষের হাহাকার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মর্মে মর্মে ছড়িয়ে পড়ায় কবির বাকপ্রতিমা উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

অগ্নিকোণ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পভাবনার একটি উজ্জ্বল প্রান্ত অগ্নিকোণ-এর রূপকে সপ্রাণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিশ্বের বিপন্ন মানুষের বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানানোর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ অগ্নিকোণ কবিকল্পনায় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত জনতার জাগরণে কবির বিশ্বাসের জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, অগ্নিকোণ সেই বিশ্বাসেরই শিল্প-স্মারক। উদ্ধৃতি দুটো বিবেচনা করা যাক –

ক. অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি
খুন হয়ে যায় সাদা সাদা ফেনা
ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের
ক্ষুরধার তলোয়ারে। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)

খ. মৃত্যুর ঝড় ঠেলে
অন্ধকারের গলা টিপে ধ'রে
রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়
অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭)

উদ্ধৃতি ক-এ অগ্নিকোণ ঔপনিবেশিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হলেও দলবদ্ধ জনতার জাগরণ যখন ক্ষুরধার তরবারির উপমা হয়ে ওঠে, তখন তা প্রবল, প্রখর শক্তির ধারক হিসেবে দৃশ্যময়তা লাভ করে বলে তা বাকপ্রতিমায় পরিণত হয়। উদ্ধৃতি খ অগ্নিকোণের মানুষগুলোর উজ্জীবনকে নানা উপমায় চিত্রিত করেছে। পরীক্ষিত মানুষগুলোর দীর্ঘ পথপরিক্রমাকে বাণীরূপ দিতে গিয়ে কবির আন্তরিক উচ্চারণ হয়ে উঠেছে প্রগাঢ় জীবনবোধে উজ্জ্বল। অনুভববেদ্যতার সপ্রাণতাই উদ্ধৃতিটিকে চিত্রকল্পে পরিণত করেছে। অগ্নিকোণ-এর মানুষকে মৃত্যুর সঙ্গে যেমন লড়াই করতে দেখি, তেমনি প্রতিরোধ-প্রতিবাদের মশাল হাতেও তারা এগিয়ে যায় অত্যাচারীর কণ্ঠ রোধ করার জন্য। তাই কবি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ হাতে/অন্ধকারকে দু টুকরো ক'রে /অগ্নিকোণের মানুষ/সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।/কোটি কণ্ঠের হুংকারে লাগে/বজ্রের কানে তালা' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭)। সমবেত কণ্ঠস্বর ও হাতের শক্তি নানা রূপকে চিত্রিত হয়ে অগ্নিকোণ কবির প্রগাঢ় জীবনবোধের স্মারক হয়ে ওঠায় চিত্রকল্প হিসেবে এটি সার্থক।

মিছিল-মিছিলের মুখ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মিছিল মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত জনতার বিজয় তাঁর চেতনার স্পর্শে স্বাস্থ্যকর কবিতা হয়ে উঠেছে। একটি সুন্দর কবিতার জন্ম দিতে কবির যেমন বিনিদ্র প্রয়াস প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতার জন্যও চাই প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান। স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য রক্তস্রোতে ভাসতে হয় মেহনতি মানুষকে, মৃত্যুকে পরোয়া করে না বলেই তারা লাভ করে মৃত্যুহীন প্রাণ –

Dhaka University Institutional Repository

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া
মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

কবি মিছিলের এগিয়ে যাওয়ার অনুষঙ্গে দেয়ালের লেখাকে অনাগত দিনের ফতোয়ার রূপকে চিত্রিত করেন। শঙ্কা, সংশয়, ভয়ের ফাঁসিতে ঝুলে থাকার দৃশ্য মিছিলকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। ফলে চিত্রকল্প হিসেবে এটি সার্থক হয়ে উঠেছে। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন সামনে এগোবার প্রেরণা জোগায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর দিন আনার অঙ্গীকারে মিছিলের মানুষগুলো তাদের বর্তমানকে বিলিয়ে দেয়। রক্তপাতের নেশায় তারা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। কোটি কোটি কণ্ঠের হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে শোষকের সিংহাসন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মিছিলের পরিচিত মুখে সম্ভাবনার দীপ্তি দেখে আন্দোলিত হয়েছেন। মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের মধ্যে বজ্রের শক্তি আবিষ্কার করেছেন তিনি। মিছিল মানেই অগ্নি-উত্তাপ। উদ্ধৃতি দুটো বিবেচনা করা যাক –

ক. ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফস্‌ফরাসের মতো জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ। (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)

খ. তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মতো
জেগে উঠে আমাকে জাগায় । (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটিতে মিছিলের মুখের উপমা হিসেবে ফসফরাসের দীপ্তি কবির প্রেরণা-প্রদায়ক মুখটিকে দৃশ্যের সীমায় পৌঁছে দেয়। উদ্ধৃতি খ-এর শব্দচিত্রটিও উপমার কারণে প্রগাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়েছে। উলঙ্গ তরবারির মতো ধারালো দীপ্তিতে জেগে ওঠে যে মুখ, তা কেবল কবিকেই নয়, পাঠকের ভাবনাকেও আন্দোলিত করে। এভাবেই মিছিলের মুখ সার্থক চিত্রকল্প হয়ে ওঠে।

আলো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আলো অভিনব ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে শিল্পসফল রূপকল্প সৃষ্টি করেছে। আলোকে তিনি যেমন সংসারের নানাবিধ ভাবনায় নিযুক্ত করেন, তেমনি অন্ধকারের প্রতিপক্ষ হিসেবেও দাঁড় করিয়ে দেন। আবার ট্রাফিক সিগনালের কৃত্রিম আলোর মধ্যে তিনি লক্ষ করেন হিংস্র আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া যাক –

ক. সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভালো মন্দ ইত্যাকার
নানান বিষয়ে
ভাবনায় নিগূঢ় হয়ে
নখ খুঁটছে
মাথায় ঘোমটা দেওয়া আলো (আলো থেকে অন্ধকারে/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

খ. চোখে হাত চাপা দিয়ে
আলোগুলো
আঙুল দিয়ে অন্ধকারকে দেখাচ্ছে। (বন্ধু/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৮)

গ. সামনে দেখি নৃশংস আমোদে
পথ আটকে হ্যা হ্যা ক'রে হাসছে ধৃষ্ট সিগন্যালের আলো (কে বা কারা/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪২)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটিতে আলো ঘোমটা দেয়া বউয়ের দ্বিধান্বিত শিহরণকে ধারণ করেছে। উদ্ধৃতি খ-এর আলো বিপদজনক সময়কে চিহ্নিত করেছে। আলোর চোখে হাত চাপা দেয়ার অনুষঙ্গ অন্ধকারের দৌরাত্ম্যকে দুর্দমনীয় করে তোলে। বিশেষ করে কবি যখন বলেন, 'নদীর ওপারে/রাস্তার আলোগুলো /অন্ধকারের গলায় সদ্য মালা পরিয়ে দিয়েছে ॥' (সান্ধ্য/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৫), তখন দুঃসময় আরো ঘনীভূত রূপে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। উদ্ধৃতি গ-এ অন্ধকার ধ্বংসপ্রবণ, নৃশংস। আলোর হাসি এখানে হায়েনার হিংস্রতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্ধকারে গাড়ির আলোতেও ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ করেন কবি– 'মাটি থেকে একটু উঠে/গাড়ির আলোগুলো/সারাক্ষণ উর্ধ্বশ্বাসে/নিজের মধ্যে কাটাকুটি খেলছিল।' (মরুভূমির হাওয়ায়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০৬)। আলোর অভিনব রূপকল্প নির্মাণে সুভাষ অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

অন্ধকার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অন্ধকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীকী অর্থমাত্রা লাভ করেছে। আলোর জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই অন্ধকারের উপস্থিতিতে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। অন্ধকার সব কিছুর ওপর আড়াল টেনে দেয়। আধুনিক কবিতায় অন্ধকার যে জটিল-মনস্তাত্ত্বিক-পরাবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে, সুভাষের কবিতায় তা ঘটে নি। তাঁর কবিচৈতন্যে অন্ধকার প্রতিবন্ধকতারই স্মারক। এই প্রতিবন্ধকতার নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চারের প্রয়োজনে অন্ধকারকে নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন কবি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত –

ক. আমি আসছি–
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি। (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

খ. অন্ধকারকে আছড়াতে আছড়াতে
ছোট্ট বউটা ভাবে–
তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না ? (বাসি মুখে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৪)

গ. ততক্ষণে শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক (আমরা যাব/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৭)

উদ্ধৃতি ক-এর অন্ধকারকে কবি দুই হাতে ঠেলে স্পর্শরূপময়তার সীমায় নিয়ে এসেছেন। শব্দকল্প হিসেবে কবির অভিজ্ঞতার সংহতি এখানে বিস্ময়কর শিল্পরূপ পেয়েছে। উদ্ধৃতি খ-এর অন্ধকার ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের জোলাদের ছোট্ট বউটার হাতে নাজেহাল হলেও তা ক্ষুধার তীব্রতাকে ভয়ানক করে তোলে। বউদের সঙ্গে অন্ধকার জুড়ে দিয়ে কবি অন্ধকারকেও দৃশ্যমান করে তোলেন– 'বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে/এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে/সারাটা উঠোন জুড়ে/অন্ধকার নাচাতে নাচাতে' (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৪)। উদ্ধৃতি গ-এর অন্ধকারকে আমরা শানবাঁধানো দেয়ালে মাথা খুঁড়তে দেখি। বাধার প্রাচীর হিসেবে এই

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারের আর্তনাদে হয়তো আলোকিত আগামীর পথই সুগম হয়ে ওঠে। আলো-আঁধারিতে সুভাষ দেখেন, অন্ধকার জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে– 'আলোটা জ্বালতেই/জানলা দিয়ে বাইরে/লাফিয়ে পড়ল/ অন্ধকার' (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)। অন্ধকার এখানে মূর্ত, প্রাণবন্ত এবং মননদ্যোতক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ।

সুভাষের বেশ কিছু কবিতায় অন্ধকার মানবমূর্তি ধারণ করে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। কবি এই অন্ধকারের বয়সকেও মূর্ত করে তুলেছেন। তাই কবি-কল্পনায় কখনো 'চোয়ারে অন্ধকার', কখনো 'জোয়ানমদ্দ অন্ধকার', আবার কখনো-বা 'লাঠি হাতে খুনখুনে অন্ধকার' কবির দার্শনিক অভিপ্রায়কে প্রাণবন্ত করে তোলে। কয়েকটি উদাহরণ দিই –

ক. হাতের কব্জিতে কালো কার বেঁধে
আমার চেয়েও ঢ্যাঙা
এক চোয়ারে অন্ধকার কাঁধ উচু ক'রে দাঁড়িয়ে। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

খ. জোয়ানমদ্দ অন্ধকার
তার কাঁধটা সরালেই দেখতে পাবো
সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান–
এক জায়গায় ব'সে
আমরা হাপুস-হুপুস ক'রে খাচ্ছি। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

গ. যেখানে আকাশের ছানিপড়া চোখের নীচে
তিন মাথা এক ক'রে আছে
লাঠি হাতে
খুনখুনে অন্ধকার (যেন না দেখি/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৬)

কবি অন্ধকারের হিংস্রতাকেও বাকপ্রতিমায় মূর্ত করে তোলেন– এমনকি তার হাত-পায়ের নড়াচড়া পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। কবি যখন বলেন– 'একবার এ-আলোর নিচে, একবার ও-আলোর নিচে/গাছের পাতায়/বারবার নড়েচড়ে বসছে ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার' (এক অসহ্য রাত্রি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৬), তখন আলোর খুব কাছে অন্ধকারের অপ্রতিভতা দৃশ্যরূপময়তা লাভ করে। নিচের দৃষ্টান্ত দুটোতেও লক্ষ করব, সভ্যতাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়া অন্ধকার কখনো ভয়ানক, আবার কখনো গুপ্তঘাতক হিসেবে আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় –

ক. যেখানে সভ্যতা ভুলে
খালি পেটে
নখে দাঁতে জিভে দিয়ে ধার
দু পাশে দাঁড়িয়ে উঠে
হিংস্র অন্ধকার
টান মেরে খুলে দেবে নরকের দ্বার ॥ (আলো থেকে অন্ধকারে/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৪)

খ. কোণাঘুপ্‌চিটিতে গা-ঢাকা দেওয়া অন্ধকার
আমাদের কারো পাশে
কারো পেছনে
উঠে এসে গা ছুঁয়ে দাঁড়াল। (আলোয় অনালোয়/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃতি ক-এ অন্ধকার নখে দাঁতে ধার দেয়ায় তার হিংস্রতা চরম হয়ে ওঠে, যে হিংস্রতা নরকের দ্বার পর্যন্ত খুলে দিতে চায়। উদ্ধৃতি খ-এ অন্ধকার কোণাঘুপ্‌চিতে গা–ঢাকা দিয়ে অন্ধকার যেন চোরাগুপ্তা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গা ছুঁয়ে দাঁড়ানোর অনুষঙ্গে অন্ধকার স্পর্শরূপময়তা লাভ করেছে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে আমরা লক্ষ করব, অন্ধকার কেবল প্রতিবন্ধকতার প্রতীক হিসেবেই নয়, আলোর জন্মদাতা হিসেবেও দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে –

ক. অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন। (মা, তুমি কাঁদো/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪)

খ. ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায় ॥ (এদিকে/*কাল মধুমাস*, ২/১৩১)

অন্ধকারের চোখের আগুন এবং বুকের যন্ত্রণা সৃজনশীলতার অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে তা অনুভবগ্রাহী নান্দনিক সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছে।

হাওয়া

হাওয়ার হাহাকার কিংবা লুকোচুরি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চমৎকার শব্দকল্প নির্মাণ করেছে। কখনো-বা শঠতারও আশ্রয় নিয়েছে হাওয়া। হাওয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের বা গলাগলির দৃশ্যকল্পও নির্মাণ করেছেন তিনি। 'পর্দাটা সরাতেই/ভয়চকিত হরিণীর মতো/আমাকে জড়িয়ে ধরল/হাওয়া' (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১) – এই উদ্ধৃতিতে সময় স্পর্শরূপময়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উপমানচিত্রটিতে হরিণের অনুষঙ্গ প্রকৃতির রহস্যময়তাকে হাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। এই হাওয়াই যখন কবিকে ভালোবেসে দেয়া পুষ্পগুচ্ছকে নড়িয়ে দিয়ে যায়, তখন তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ময় শব্দকল্প হয়ে ওঠে – 'আর মাঝে মাঝে/হাওয়া এসে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল/তোমাকে ভালোবেসে দেওয়া/গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল' (তোমাকে বলিনি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৫)। আবার যে বার্ধক্যের প্রতি কবির অনাগ্রহ এবং যা অনিবার্য, একদিন নিরুত্তাপ হাওয়া এসে কবিকে সেই দিকে ঠেলে নেবে– 'আমি জানি/শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া/একদিন আমাকেও সেই দিকে ঠেলবে' (যেন না দেখি/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৬)। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতেও আমরা লক্ষ করব, হাওয়া কত সজীব ও সক্রিয় হয়ে কবির দার্শনিক সজ্ঞাকে শিল্পোত্তীর্ণ করেছে –

ক. শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া। (মা, তুমি কাঁদো/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪)

খ. যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে
মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া (দূর থেকে দেখো/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩–১০৪)

গ. আকাশের চোখে ধুলো দিচ্ছিল
বাইরে
মরুভূমির হাওয়া। (মরুভূমির হাওয়ায়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০৬)

ঘ. মুখ লুকোনো ভীরু কবিতার খাতায়
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শ্বাস ফেলছে
হাওয়া... (হটাবাহার/*জল সইতে*, ৩/৩২২)

প্রতিটি উদাহরণে হাওয়া স্পর্শময় কিংবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ায় এবং বোধের বিশেষ প্রান্তকে দ্যোতিত করায় তা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকল্পে উন্নীত হয়েছে। মেঘের সঙ্গে হাওয়ার সম্পর্ক আলিঙ্গনের নয়, আঘাত করার, তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার, যা কবির চিন্তাকেও তাড়িত করেছে বলে মনে হয়– 'একটু আগে হাওয়ার একটা হল্লা এসে/মারমুখো মেঘগুলোকে/তাড়িয়ে নিয়ে গেছে' (সান্ধ্য/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৩)। এই হাওয়াই কখনো-বা ফুরফুরে মেজাজে নক্ষত্রখচিত রাতের স্বপ্নময়তায় পৃথিবীকে নিয়ে বাসর রচনা করতে চায়। কবি কল্পনায় এই পৃথিবীও অবগুণ্ঠনবতী রমণীর লাজুক চাহনীতে পাঠকের কল্পনাপ্রতিভাকে আলোড়িত করে –

নক্ষত্রখচিত স্বপ্ন।
ফুরফুরে হাওয়ায় কার ওড়না ?
অবগুণ্ঠনবতী পৃথিবীর। (গাছে গাছে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৯)

উদ্ধৃতিটিতে হাওয়ার আনন্দ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে, তেমনি পৃথিবীও নববধূর মতো স্পর্শরূপময়তা লাভ করে। হাওয়া-অনুষঙ্গে নির্মিত আরো কয়েকটি চিত্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে –

ক. ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া। (ছেই/যত দূরেই যাই, ২/১০১)

খ. নিরক্ষর হাওয়া
বারে বারে একই বইয়ের
ওলটাচ্ছে পাতা। (জলছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৬)

গ. বেকার হাওয়া আহা গায় বেঁধে। (রাস্তা/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২৭)

উদ্ধৃতি ক-এর হাওয়ার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা ভাজা ইলিশের অনুষঙ্গে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃতি খ ও উদ্ধৃতি গ-এর হাওয়া যথাক্রমে অক্ষরজ্ঞানহীন ও বেকার হওয়ায় তা অর্জন করেছে মানবীয় বৈশিষ্ট্য । চিত্রকল্প হিসেবে তিনটি দৃষ্টান্তই চমৎকার শিল্পসৌকর্য লাভ করেছে।

আকাশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আকাশ রোমান্টিক ভাবকল্পের বদলে নিষ্প্রভ, নির্মম, কর্কশ, কঠিন বাস্তবস্তার প্রতিবিম্বকে ধারণ করেছে। জীবনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার অপমৃত্যু যেমন তাঁর মর্মে আঘাত করেছে, তেমনি আকাশের বুককেও ক্ষতাক্ত করেছেন তিনি। তাই রাস্তার গর্তে জমে থাকা চোখের জলে তিনি আকাশকে স্নান করিয়ে নেন। চোখের জলে বিম্বিত আকাশকে এক মনে নিরীক্ষণ করছিল রমণী– 'আর ঠিক তখনই/তার সিঁথি থেকে ঠিক্‌রে/আকাশের গায়ে/আনন্দের রঙ লাগে' (আনন্দ/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/১৯৫)। এতে তার একাকিত্ব যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি আকাশের গায়ে লেগে থাকা আনন্দের রঙে কবি ওই রমণীর কষ্টকেও রমণীয় করে তুলেছেন। আরো কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি –

ক. পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ। (সালেমনের মা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৬)

খ. ওপরে আকাশ নীল ব্যথায় মোচড়ে (খড়ির দাগে/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৯)

গ. সারবন্দী ছাদের ফাঁকফোকরে
আঠা দিয়ে সাঁটা
লালনীল কাগজের টুকরোর মতো
গোধূলির আকাশ (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৭)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পাগল বাবরালির সমস্ত কষ্টকে ধারণ করে আছে। 'বাবরালির

Dhaka University Institutional Repository

চোখের মতো এলোমেলো/এ আকাশের নীচে কোথায়/ বেঁধেছ ঘর তুমি, কোথায়/সালেমনের মা?' – এই প্রশ্নের ভেতরে কবির জীবনবীক্ষার মৌল প্রবণতার উত্তাপ যেমন পাই, তেমনি আকাশকেও কবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেখি। উদ্ধৃতি খ-এ দুঃসময়ের দাহ আকাশকেও ব্যথায় নীল করে তুলেছে। উদ্ধৃতি গ-এর উপমানচিত্রটিতে কলকাতার যান্ত্রিকতায় আকাশকে কৃত্রিম করে তুলেছে। আঁঠা দিয়ে সাঁটা রঙিন কাগজের রঙে গোধূলির আকাশ হয়ে উঠেছে নকল, বানিয়ে তোলা।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ-মোটিফ ব্যবহার করে চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এক ঝলক দেখা বিদ্যুৎকে তিনি নেড়েচেড়ে দেখার মতো স্পর্শের সীমায় নিয়ে এসেছেন। প্রসঙ্গত দুটো উদ্ধৃতি বিবেচনা করা যাক –

ক. মাথার ওপর গোল কালো পাথরটায়
শান দিচ্ছে নখ
বিদ্যুৎ
অন্ধ রাগে। (আরও গভীরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৮০)

খ. যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ (দূর থেকে দেখে/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩)

উদ্ধৃতি ক-এ আকাশকে কালো পাথরের রূপকে চিত্রিত করে তার গায়ে বিদ্যুতের নখে শান দেয়ার রূপকল্পটি চমৎকার শিল্প-সংহতি লাভ করেছে। অন্ধকারে বাড়িগুলোর গায়ে আছড়ে পড়া বিদ্যুতের ঝলক কবি-কল্পনায় চাবুকের রূপ পেয়েছে যা, কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্যতাই নয়, স্পর্শরূপময়তাও লাভ করেছে।

জীবন-মৃত্যু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি এবং এ বিষয়ক দার্শনিক অভিপ্রায় তাঁর কবিতায় শিল্পসফল শব্দচিত্র নির্মাণ করেছে। জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ব এবং জীবনকে অর্থময় করে তোলার আন্তরিক আগ্রহই নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে বাণীবদ্ধ হয়েছে –

ক. তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন (লোকটা জানলই না/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৮)

খ. তারপর জীবন যখন খুব ক'রে সাধবে
তখন ভেবে দেখব
যাব কি যাব না ॥ (এখন যাব না/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৯)

কবি জীবনের একটি সংজ্ঞার্থ নিরূপণেরও চেষ্টা করেছেন। অস্থির, অশোভন, অসুস্থ পৃথিবীটাকে তিনি প্রভুহীন পথের কুকুরের রূপকে চিত্রিত করেছেন, যা নষ্ট মানুষরূপী পোকার কামড়ে আত্মঘাতী হচ্ছে – 'পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকি কুকুরের মতো/পোকার জ্বালায়/নিজের ল্যাজ কামড়ে ধ'রে/কেবলি পাক খাচ্ছে'–

আর একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা প'ড়ো বাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

তার বিকট আর্তনাদই হল

জীবন (পা রাখার জায়গা/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৪)

কবির সংবেদনশীলতা জীবনের গূঢ়ার্থকে ইন্দ্রিয়সমূহের নিকটবর্তী করে তুলেছে। সুভাষের জীবন-ভাবনার এই শিল্পরূপ প্রগাঢ় অনুভববেদ্যতা লাভ করায় তা চিত্রকল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

যে হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তায় জীবনের প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে, তাও সুভাষের কবিতায় বিস্ময়কর অনুভববেদ্য চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে –

চটের অদৃশ্য ফেঁসোগুলো

বুকের গহ্বরে দড়ি পাকিয়ে

বুঝি হৃৎপিণ্ডগুলোকে বিষম জোরে টানছে ॥ (এক অসহ্য রাত্রি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৬)

চিত্রকল্পটিতে কঙ্কালসার শ্রমিকের অসুস্থ হৃৎযন্ত্রের কোন রকমে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর বিষয়টি বিধৃত হয়েছে। কবির অসাধারণ কল্পনাপ্রতিভা হৃৎপিণ্ডকেও দৃশ্যময় করে তুলেছে।

মানুষের জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। কবিকল্পনায় মৃত্যুর মতো অদৃশ্য, স্পর্শ-অযোগ্য বিষয়ও যৌবনদীপ্ত হয়ে উঠেছে এবং তা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসে তার পরবর্তী শিকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি –

গাছের গুড়িতে বুক-পিঠ এক ক'রে

যৌবনে পা দিয়ে রয়েছে

একটি উলঙ্গ মৃত্যু–

আমি এখুনি দেখে আসছি : (পায়ে পায়ে/*যত দূরেই যাই*, ২/৬৯)

দৃশ্যকল্পটিতে নগ্নতা মৃত্যুকে আরো বিভীষিকাময় করে তুলেছে। সদ্য যৌবনে পা দেয়ার অনুষঙ্গে মূলত মৃত্যুর ধ্বংসাত্মক অভিব্যক্তিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মৃত্যু মানবিক অবয়বে উপস্থিত হয়ে পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়কে সচকিত করে তুলেছে।

ভালোবাসা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভালোবাসার মতো অনুভবসম্ভব মহৎ মানবিক বৃত্তিকে অসাধারণ শব্দপ্রতিমায় দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। কবির অনাবিল ভালোবাসা কখনো কাঙ্ক্ষিত প্রহরের মতো স্নিগ্ধ, আবার কখনো-বা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো বাঁধনহারা। নিচের উদ্ধৃতি দুটি বিবেচনা করা যাক –

ক. স্নিগ্ধ স্নাত গোধূলির মতো

বিলম্বিত

আমাদের ভালোবাসা। (গাছে গাছে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৯)

খ. ভালোবাসার ফেনাগুলো একদিন উথলে উঠবে

এ আমি জানতাম। (পাথরের ফুল/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৫)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটিতে ভালোবাসা গোধূলি লগ্নের সৌরভকে ধারণ করে স্নিগ্ধ-সজীব-স্নাত হয়ে উঠেছে। প্রাহরিক প্রবণতায় সম্পৃক্ত হয়ে অনুভবের প্রগাঢ়তায় ভালোবাসা যোগ করেছে ভিন্নমাত্রা। উদ্ধৃতি খ-

Dhaka University Institutional Repository

এ ভালোবাসাকে সমুদ্রের ফেনার রূপকে চিত্রিত করায় তা যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে, তেমনি সমুদ্রের অনুষঙ্গ ভালোবাসার উদার-বিস্তৃত ভাবকে বর্ণিল করে তুলেছে। 'যে-বুকের/যে আঁধারেই ভ'রে রাখি না কেন/ ভালোবাসাগুলো আমার–/আমারই থাকবে।' (পাথরের ফুল/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৫)– এই বাক্‌চিত্রও কবির প্রেমকে প্রাঞ্জলতা দিয়েছে।

গাছ

গাছের নিশ্চলতা অতিক্রম করে তা যখন প্রাণবন্ত মানুষের নানা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তখন তা চেতনার অনালোকিত প্রান্তের উন্মোচনে পালন করে উজ্জ্বল ভূমিকা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় গাছকে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষি হিসেবে যেমন উপস্থিত করেন, তেমনি গাছের প্রতিক্রিয়ারও শব্দচিত্র আঁকেন তিনি। স্বামী-পরিত্যক্তা কোন-এক-কাজের-মেয়ের আবার বাচ্চা হওয়ার ঘটনা 'এক পায়ে/আজীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা/জটাধারী ঊর্ধ্ববাহু গাছটা/ঝুঁকে প'ড়ে/যত দেখে, তত অবাক হয়' (ড্যাং ড্যাং ক'রে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬২)। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতেও আমরা লক্ষ করব, গাছের অনুভূতিপ্রবণ প্রতিক্রিয়া কীভাবে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে –

ক. শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে। (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬২)

খ. বুড়ো ধাড়ি গাছ
যেন কোমড়ে ঘুনসি বেঁধে
দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে। (এইপথ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৪)

গ. গঙ্গার ধারে গাছগুলো
কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল
বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা। (সান্ধ্য/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৩)

উদ্ধৃতি ক বসন্তের আগমনে গাছের প্রতিক্রিয়ার শব্দচিত্র নির্মাণ করেছে। কলকাতা শহরের ইট-পাথরের অনাদরে বেড়ে ওঠা গাছের পাঁজর ফাটানো হাসি কেবল শ্রুতিগ্রাহ্যই নয়, দৃষ্টিকেও মোহিত করে। এই গাছই কোন 'এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'র লজ্জা ও অপমানে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে–'অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে/দড়িপাকানো সেই গাছ/তখনও হাসছে॥' (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৩)। উদ্ধৃতি খ বয়স্ক গাছের কোমড়ে ঘুনসি বেঁধে অনাব্রু নৃত্যকে চিত্রিত করেছে। উদ্ধৃতি গ বৃষ্টিস্নাত একটি গাছের মানুষসুলভ কাঁধ নাড়ার ভঙ্গিতে গা থেকে বৃষ্টি ফোটা ঝেড়ে ফেলার ছবি তুলে ধরে। আবার কবি যখন বলেন, 'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে/দাঁড়িয়ে/ডালগুলো সব নাড়িয়ে/নাড়িয়ে/সেয়ানা গাছ বুঝে/নিচ্ছে হাওয়ার গতিবেগ' (বদলায়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫৭), তখনও গাছ অনুভূতির নিবিড়তায় পাঠকের একাধিক ইন্দিয়কে সজাগ করে তোলে। গাছের চিত্রকল্প নির্মাণে কবির কল্পনাপ্রতিভা বিস্ময়কর সার্থকতা লাভ করেছে।

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ

Dhaka University Institutional Repository

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মেঘের অনুষঙ্গে একটি চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। ভাসমান মেঘের পৃথিবীপ্রীতি এবং রোদ ও বৃষ্টির দ্বিধায় তাকে স্থাপন করে কবি মেঘকে চিন্তাশীল প্রাণীর সমকক্ষ করে তুলেছেন –

আশ্বিনের কানা মেঘ
এই পৃথিবী ছেড়ে আর কোথাও
যাবে কি যাবে না এই দ্বিধায়
রোদ আর বৃষ্টি দিয়ে
নিজেকে দু-ভাগ করছে ॥ (কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ/*কাল মধুমাস*, ২/১১৫)

উদ্ধৃতিটিতে আশ্বিনের মেঘ দৃষ্টিশক্তিহীন হলেও অনুভূতির সক্রিয়তায় মননদ্যোতক ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়েছে।

বৃষ্টির রয়েছে এক বিস্ময়কর সম্মোহন ক্ষমতা। বৃষ্টির স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শ মানবমনের কল্পনাপ্রবণতাকে প্রলম্বিত করে। সুভাষের কল্পনাপ্রতিভাও বৃষ্টিকে নানা ভাবে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত –

ক. সজনে গাছে ডাল ধ'রে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোটা। (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৩)

খ. যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আঁচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি। (দূর থেকে দেখো/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৪)

গ. হঠাৎ একটা সময়,
পুরো রাস্তাটা ফাকা ক'রে দিয়ে
মাথার উপরে ভেঙে পড়েছিল
আহা, কী মিষ্টি
কুকুর তাড়ানো বৃষ্টি। (কখনও কখনও/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮০)

উদ্ধৃতি ক-এ বৃষ্টির আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে গাছের ডাল ধরে দোল খাওয়ার অনুষঙ্গে। কবি যখন বলেন– 'শূন্যে/ভর দিয়ে দিয়ে/নামছে/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি' (জল আসুক/*এই ভাই*, ২/১৭০), তখনও বৃষ্টির প্রাণময় উদ্ভাসনই পাঠকের কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। রোমান্টিক ভাবকল্পের পরিবর্তে বৃষ্টির হিংস্রতাকে মূর্ত করে তুলেছে উদ্ধৃতি খ। বিশেষ করে জানলায় নখের আঁচড় বৃষ্টির বন্য চারিত্র্যকে চিহ্নিত করে। আবার 'বৃষ্টির বেবাক জল/এখন সেই বন্ধ জানলার শার্সিতে/কেবল তড়পাচ্ছে/ভাবখানা/যেন বাইরে গেলেই/আমাকে একহাত দেখে নেবে' (ছাই/*এই ভাই*, ২/১৮০) এই শব্দচিত্রেও বৃষ্টির ভয়ঙ্কর রূপই প্রতিভাত হয়। উদ্ধৃতি গ-এ আমরা দেখি বৃষ্টির আগমনে কবি পথের সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে দেন, আর আকাশ-ভেঙে-পড়া-বৃষ্টিকে তিনি লেলিয়ে দেন কুকুরের পেছনে। বৃষ্টির অনুষঙ্গে নির্মিত চিত্রকল্পগুলোতে কবির অবচেতন মনের লুপ্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

রোদ কেবল বাইরের জগতকেই আলোকিত-উদ্দীপ্ত-প্রাণবন্ত করে না, মানুষের চেতনাকে সৃজন-উদ্দীপক দ্যোতনাসঞ্চারেও তা পালন করে উজ্জ্বল ভূমিকা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় যে সমাজ-প্রতিবেশের প্রতিবিম্ব ধারণ করেছেন, সেখানে জীবন কখনো অস্থির–অসুস্থ, আবার কখনো বা শোষণে নিষ্পেষণে জর্জরিত। এ কারণেই তাঁর কবিতায় রোদ কোন সুস্থ অনুষঙ্গে প্রযুক্ত হয় নি। দৃষ্টান্ত দুটি লক্ষ করি –

Dhaka University Institutional Repository

ক. গরাদের এপারে দেখো–
কয়েদির ডোরাকাটা পোশাকে
এক টুকরো রোদ
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে
হাঁটু মুড়ে
যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে। (বারুদের মতো/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৮)

খ. সকালবেলায় জানলার গরাদ ঠেলে ভেতরে আসে
হাসপাতালের রুগীর পোশাকে রোদ্দুর। (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫২)

উদ্ধৃতি ক-এ রোদকে তিনি কয়েদির ডোরা কাটা পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে মগরেবের নামাজরত রোদ কবির দার্শনিক অভিপ্রায়কে প্রাঞ্জল করে তোলে। উৎপ্রেক্ষার অবয়বে নির্মিত চিত্রকল্পটিতে কবির কারাজীবনের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে। উদ্ধৃতি খ-এর রোদ পরে আছে হাসপাতালের রুগীর পোশাক। কবির অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত যুগযন্ত্রণার শব্দচিত্র হিসেবে উদ্ধৃতিটি চমৎকার। এই রোদের অনুষঙ্গে সুভাষ একটি কবিতায় অনেক দিনের পুরোনো হলদে-হয়ে-যাওয়া ফটোর ভেতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি ইমেজ পরস্পরের মধ্যে ভাব ও অভিজ্ঞতার অনাবিল বিনিময় ঘটিয়েছে বলে দুটোই লাভ করে চেতনাসঞ্চারী মাত্রা –

আর
জানলা দিয়ে ঘরের মেঝেয় লাফিয়ে-পড়া
রোদ্দুরে
দেয়ালে চমকে উঠল
সেই কবেকার হল্‌দে হয়ে যাওয়া
ফটো। (আগুন লাগলে/*জল সইতে*, ৩/৩৩৪)

নদী ও জাহাজ

নদীর স্রোতের সঙ্গে নিজের মনকে বেঁধে দেওয়ায় কবির কল্পনা যেমন গতিশীলতা লাভ করে, তেমনি তাঁর জীবনবীক্ষার একটা দার্শনিক প্রান্তও উন্মোচিত হয়ে যায়। সুভাষের কবিতায় নদী-অনুষঙ্গে নির্মিত চিত্রকল্প পাঠকের নন্দনভাবনায় যোগ করে নতুন ব্যঞ্জনা। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় –

ক. তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।
পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগড়া। (যেতে যেতে/*যত দূরেই যাই*, ২/৬৭)

খ. আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ– (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৮

উদ্ধৃতি ক-এর নদী রূপকথার একটি প্রাণবান চরিত্র হয়ে উঠেছে। নীল ঘাগড়া পরা নৃত্যরতা নদীর ঘুঙুরের

Dhaka University Institutional Repository

শব্দও যেন পাঠক শুনতে পায়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে নদীর প্রায়োগিক দিক চমৎকার রূপকল্প সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুতের জন্মদাতা এই নদীর ঘাড়ে হাত রেখে আমাদেরও আলোকিত হতে ইচ্ছে করে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি কবিতায় জাহাজ-এর অনুষঙ্গে একটি অসাধারণ ইমেজ সৃষ্টি করেছেন। অভিন্ন রূপকল্পে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সন্নিবেশ ঘটায় কবির পরবাস্তব ভাবনাও পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। ভাসমান জাহাজ কখনো ভাবনাহীন কালাতিক্রমণের রূপক, আবার কখনো-বা শেকড়-উন্মুল মানুষের নিঃসঙ্গতার প্রতীক। নিষ্প্রাণ জাহাজে চেতনাসঞ্চারক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে কবি শব্দকল্পটিকে মননদ্যোতক সমৃদ্ধি দিয়েছেন –

আমাদের নাকের ডগায় একটা জাহাজ
জলের ওপর থেবড়ে ব'সে
মেয়েদের মতো হাঁটুদুটো দু-পাশে এলিয়ে দিয়ে
কাঁটা হাতে
যেন বুনতে বসেছে। (সান্ধ্য/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৪)

মেয়েদের বসার একটি বিশেষ ভঙ্গি এবং বুননকর্মের নিবিষ্টতা যুক্ত হয়ে জাহাজের ভাবকল্পটি বিস্ময়কর শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে।

ভয়-বিষাদ-বেকারত্ব

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভীতি-অনুষঙ্গে নির্মাণ করেছেন চমৎকার চিত্রকল্প যা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে এবং কবিকল্পনার প্রগাঢ়তায় তা লাভ করেছে ভিন্নমাত্রা। ভয় মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়, এগিয়ে যাওয়ার পথে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। সুভাষের কবিতায় ভয়কে জয় করার প্রেরণা যেমন আছে, তেমনি আছে ভয়কে বিধ্বস্ত করার প্রসঙ্গও। উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করি –

ক. পৃথিবীতে গাঁক গাঁক ক'রে ফিরছে
যে দাঁত-খিঁচোনো ভয়,
আমি তার গায়ের চামড়াটা
খুলে নিতে চাই। (পায়ে পায়ে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭০)

খ. মাথার ওপর থমথম করছে ভয় (আরও গভীরে /*যত দূরেই যাই*, ২/৮০)

উদ্ধৃতি ক-এ পৃথিবীকে শাসিয়ে বেড়ানো ভয়ের দাঁত খিঁচানোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন কবি। ভয়ের গা থেকে চামড়া খুলে নেয়ার অনুষঙ্গে ভয় স্পর্শরূপময়তা লাভ করেছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির থমথমে ভয়ও কবিকল্পনার দূরসঞ্চারী প্রভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

বিষাদের সঙ্গে কবির বোঝাপড়ার ইচ্ছে একটি চমৎকার বাকপ্রতিমায় শিল্পিতা লাভ করেছে। অনুভবের প্রগাঢ়তায় অদৃশ্য বিষাদকে তিনি আমাদের দৃষ্টিসীমায় নিয়ে আসেন। কবির পায়ের কাছে ঘুরে বেড়ানো বিষাদকে ইচ্ছে করলেই যেন অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু কবির বিষাদের অনুষঙ্গে অচরিতার্থ স্বপ্ন-কল্পনার সম্পর্ক প্রমাণ করে, যে দার্শনিক সজ্ঞার রূপকল্প এই বিষাদ, তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় –

ক. বিষাদ তবু যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

সারাক্ষণ আমার পায়ে পায়ে
সারাক্ষণ
পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে। (পায়ে পায়ে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭০)

খ. চেয়ে দেখি
দূরে ব'সে সেই আমার বিষাদ
আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে
আমার অপূর্ণ বাসনাগুলোকে নিয়ে খেলছে। (পায়ে পায়ে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)

দুটি উদ্ধৃতিতেই বিষাদকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে। যে বিষাদ সারাক্ষণ মানুষকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে তা হয়তো সৃজনশীলতার প্রেরণা হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। আর অতৃপ্ত বাসনার সঙ্গে খেলতে বসা বিষাদের প্রতি কবির মানসিক দুর্বলতাও বিষাদকে শব্দকল্পে উন্নীত করেছে।

সুভাষের কবিতায় বেকারত্বের যন্ত্রণা একটি প্রাণবন্ত চিত্রকল্পে বিধৃত হয়েছে। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি –

টিফিনের সময়কার
অক্ষরযুক্ত ঠোঙার কাগজের মত
আর নিরক্ষর শালপাতার মত
অসংখ্য বেকার (*টুল/একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২১২)

উপমানচিত্রটিতে বেকারের বাণীরূপ নির্মিত হয়েছে দুটি উপমায়। অক্ষরযুক্ত কাগজের ঠোঙা এবং শালপাতার নিরক্ষরতা অসংখ্য বেকারের জীবনের অর্থহীনতাকেই মূর্ত করে তুলেছে।

যানবাহন : ট্রাম-বাস-মালগাড়ি

কলকাতা শহরের দৈনন্দিন জীবনপরিক্রমায় ট্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মন্থর গতিসম্পন্ন এই ট্রামের অনুষঙ্গে গতিহীন মানুষের কোন রকমে বেঁচে থাকার চিত্রটি ধরতে চেয়েছেন। কবিকল্পনায় ট্রামের গতি ও শব্দ সৃষ্টি করেছে একাধিক চিত্রকল্প। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে –

ক. দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা করে
তুলে নিয়ে
বেলা দশটার ট্রাম
ঝুলতে ঝুলতে চলে গেল। (পোড়া শহরে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)

খ. অন্ধকারকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে
সকালের প্রথম ট্রামও
এক্ষুনি যাবে। (সকালের ভাবনা/*কাল মধুমাস*, ২/১২৫)

গ. ঘেঁষটে ঘেঁষটে যাচ্ছে ট্রাম।
আমাদের গলি দিয়ে যাওয়া এক
বিকলাঙ্গ ভিখিরির মতো
দুর্বিষহ মর্মন্তুদ কর্কশ আওয়াজ। (কাল মধুমাস/*কাল মধুমাস*, ২/১৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃতি ক-এর কর্মমুখী মানুষগুলোকে বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়া ট্রামকে বিশেষ ভাবকল্প দিয়েছে। ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া মানুষের মতো ট্রামও যেন ক্লান্ত, ক্ষয়িষ্ণু মানুষের রূপকল্প তৈরি করেছে। প্রায় একই ধরনের শব্দকল্প নির্মিত হয়েছে অন্য একটি কবিতায় –'মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে/ছড় টেনে/ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল/একটা মন্থর ট্রাম' (এই পথ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০১)। উদ্ধৃতি খ সকালের ট্রামকে অন্ধকার বিদীর্ণকারী হিসেবে চিত্রিত করেছে। ট্রামের জান্তবতা এখানে শ্রমজীবী মানুষের অনুষঙ্গে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি গ-এর উপমানচিত্রটিতে ট্রামের গতির চেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে এর সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ। বিকলাঙ্গ ভিখিরির রূপকে ট্রামের ক্লান্তিকর আওয়াজ চমৎকার ধ্বনিরূপময়তা লাভ করেছে।

একটি কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাস-মোটিফ ব্যবহার করে মনোজ্ঞ রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। যান্ত্রিক বাসের কল্পিত মুখে মিষ্টি হাসির ঝলক শব্দচিত্রটিতে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাসের এই চকিত হাসিই নিম্নোক্ত দৃশ্যকল্পটির কেন্দ্রীয় শক্তি –

একটা দোতলা বাস
একটু দাঁড়িয়ে
জানলায় একটা মিষ্টি মুখ দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল (খোলা দরজার ফ্রেমে/*কাল মধুমাস*, ২/১১৫)

মাঝরাতের মালগাড়ি কবিকল্পনাকে মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বিশেষ করে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের বিকলাঙ্গ হৃৎযন্ত্রের উপমায় মালগাড়ি শ্রমশোষণের পরিণতিকে নির্দেশ করেছে বলে মনে হয়। অসুস্থ জীবনযাত্রার মতোই কোন রকমে পা টেনে টেনে পথচলার প্রতীকী তাৎপর্যে মালগাড়ি কবির প্রগাঢ় অনুভবের বাকপ্রতিমা হয়ে উঠেছে। নিচের উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করা যাক –

ক. একটু আগে অবিরাম কাশতে কাশতে
বজবজের তেল, বাটার জুতো
ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গেছে
মাঝরাতের মালগাড়ি। (হালুম/*কাল মধুমাস*, ২/১৪১)

খ. আর আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়ে
লাইনে পা টেনে টেনে
বুড়োর মতো কাশতে কাশতে চলে গেল
একটা মালগাড়ি। (সান্ধ্য/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৩)

উদ্ধৃতি ক-এ বজবজের কারখানার শ্রমিকদের জীবনচিত্র দৃশ্যময়তা পেয়েছে 'ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে' চলা মালগাড়ির অনুষঙ্গে। উদ্ধৃতি খ-এর উপমানচিত্রটিও বৃদ্ধ মানুষের কাশি এবং মালগাড়ির পা টেনে চলার শব্দকল্পে নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্বিষহ জীবনের চালচিত্র তুলে ধরেছে। উভয় চিত্রকল্পেই ঘাড়ের অনুষঙ্গ রয়েছে। মালগাড়ির ঘাড় এবং মানুষের ঘাড় একই অভিব্যক্তির শিল্পভাষ্য বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তা ও রাস্তার গর্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রাস্তা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। তাঁর কবিতায় রাস্তার দায়িত্ব যোগাযোগের প্রয়োজন মিটিয়েই শেষ হয় নি, কবিকল্পনার সঙ্গে তা পাঠকের ভাবনারও সেতুবন্ধ রচনা করেছে। কলকাতার ভাঙা বিপজ্জনক রাস্তার গর্তগুলো কবিকল্পনায় পরাবাস্তব ভাবকল্পের জন্ম দিয়েছে, যা চেতন-অবচেতনের আলো-আঁধারিতে অবগাহনের প্রণোদনা সৃষ্টি করে। শ্রমশোষণের শিকার সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে বিধ্বস্ত রাস্তার রূপকাশ্রিত অর্থমাত্রাই নিচের চিত্রকল্পত্রয়ে প্রাণময় হয়ে উঠেছে –

ক. কী এক গভীর চিন্তায়
কপাল কুঁচকে আছে
চড়িয়ালের রাস্তা। (এক অসহ্য রাত্রি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৬)

খ. মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে-যাওয়া
গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মতো
রাস্তাটা
একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে– (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৯)

গ. আমাদের এদিককার রাস্তাঘাটে, মশাই
আর বলবেন না,
বছরে বারোমাস ভোঁচকানি লাগা ক্ষিধে –
বেরোলেই পা জড়িয়ে ধরে। (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫১)

উদ্ধৃতি ক-এর পাথরের কঙ্কাল বের হওয়া রাস্তাটি ভাবনাবিহ্বল বয়স্ক পুরুষের কপালের ভাঁজগুলোর রূপকে চিত্রায়িত হয়ে চমৎকার চিত্রকল্প রচনা করেছে। খ-সংখ্যক উপমানচিত্রটিতেও হাড় জিরজিরে বৃদ্ধের উপমায় রোগগ্রস্ত রাস্তার শব্দচিত্র নির্মিত হয়েছে। এই রাস্তাই আবার শূন্যপানে চেয়ে নিজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের ভাবনায় ডুবে যায়– 'কোনোরকম আড়াল না নিয়ে,/কোথাও মাথা না গুঁজে–/সরাসরি আকাশের দিকে মুখ রেখে/দিব্যি চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে ডাকাবুকো রাস্তাটা' (ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ২/১০১)। উদ্ধৃতি গ-এ ভাঙা, কর্দমাক্ত রাস্তা ভোঁচকানি লাগা ক্ষুধা নিয়ে পথচারির পা জড়িয়ে ধরে। চিত্রকল্পটি কেবল দৃশ্যময়ই নয়, পা জড়ানোর অনুষঙ্গে তা স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে। পায়ে চলার রাস্তার এই ক্ষতগুলো অপরিবর্তিত থাকলেও উচ্চবিত্ত মানুষের গাড়িগুলোকে পথ ছেড়ে দেয় ফুটপাথ – 'ফুটপাথগুলোকে কোণঠাসা ক'রে/দুনিয়ার পায়ে দেশ বাঁধা দিয়ে/দুপাশে হাতপা ছড়াচ্ছে গাড়ির রাস্তা' (হটাবাহার/*জল সইতে*, ৩/৩২২)। শব্দচিত্র হিসেবে এই রাস্তাটিও অনন্য, কারণ এর হাত-পায়ের স্পর্শ পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

সুভাষের একটি কবিতায় রাস্তার গর্ত রাক্ষুসী মূর্তিতে পাঠকের চৈতন্যকে গ্রাস করে। ওৎ পেতে বসে থাকা এই গর্ত যে কোন পথচারির সর্বস্ব হরণ করবে বলে কবির মনে হয়েছে। রসাতলে যাওয়ার এই গর্ত কেবল কবির রসবোধকেই চিত্রিত করে না, এই গর্তে আলো ফেলে তা পাঠককে নেড়েচেড়ে দেখতেও উদ্বুদ্ধ করে –

হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ব'লে
বিকট হাঁ ক'রে
সামনে ওৎ পেতে বসেছিল
রসাতলে যাওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

গর্ত (মাঝ রাস্তায়/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৬)

স্মৃতি ও স্বপ্ন

স্মৃতি যে কোন সৃজনশীল মানুষকেই অনুপ্রাণিত করে। ভবিষ্যতের পথযাত্রায় অভিজ্ঞতার আলোক সঞ্চারে স্মৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশ্ন হলো, স্মৃতির প্রেরণা কোন ভাষায় কবিকল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে? কবি যখন বলেন– 'তখন আমার নজরে পড়ে/একরাশ স্মৃতি বুকে নিয়ে/আমার পা দুটো ধ'রে রয়েছে/তিন পুরুষের চেনা মেঝে' (আজ আছি কাল নেই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২০০), তখন কবিকল্পনায় বদ্ধমূল স্মৃতির স্পর্শে আমাদের পা দুটোও যেন অবশ হয়ে আসে। সুভাষের কবিতায় স্মৃতি কোন মৃত অনুষঙ্গ নয়, তা যেন পাঠকের ইন্দ্রিয়ে অমৃতের স্বাদ এনে দেয়। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. যেখানে স্টিমারের খালাসির মতো
স্মৃতি
শুধু রশি ফেলে ফেলে
জীবনের জল মাপে– (যেন না দেখি/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৭)

খ. জীবনের হ্রদে স্মৃতি
চোখ বুজে দিল ঝাঁপ; (ছাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৩)

গ. সামনেই
ভেসে যাচ্ছে রক্তে-জমাট
নিষ্ঠুরতার জবরদস্ত স্মৃতি। (বদলাচ্ছে দিন/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৩৫)

ঘ. বসে রয়েছি পা ছড়িয়ে
খরায়
স্মৃতির নৌকো আটকে আছে
হাঁটুজলের চড়ায় (উড়ো চিঠি/*ধর্মের কল*, ৫/২৩২)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটিতে স্মৃতি স্টিমারের খালাসির উপমায় চিত্রিত হওয়ায় তা কেবল মনের অতলান্তেই আলো ফেলে না, যাপিত জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অর্জিত অভিজ্ঞতাকেও দৃষ্টি ও স্পর্শের সীমায় নিয়ে আসে। উদ্ধৃতি খ-এর স্মৃতির সঙ্গেও জলের প্রসঙ্গ জড়িত। স্মৃতির এই ঝাঁপিয়ে পড়া কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্যই নয়, আমরা যেন জলের ঢেউয়ের শব্দও শুনতে পাই। গ-সংখ্যক দৃষ্টান্তটিতে স্মৃতি নিষ্ঠুরতার স্মারক হয়ে উঠেছে। স্মৃতির সঙ্গে জমাট-রক্তের উল্লেখ কবি-হৃদয়ের ক্ষতকে যেমন দৃশ্যমান করে তোলে, তেমনি নিষ্ঠুর নির্মম স্মৃতি একটি অবয়ব ধারণ করে পাঠককে মননদ্যোতক ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ করে। কবিকল্পনায় স্মৃতি কেবল নিষ্ঠুরই নয়, তা দজ্জাল রমণীর রূপকল্পে আমাদের ডেকে নিয়ে যায় চেতনার আলোক থেকে অবচেতনার অন্ধকারে– 'পেছন থেকে/একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি/তার নাম ধরে/চিৎকার করে ডাকছে' (রাস্তার লোক/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৫)। কখনো-বা স্মৃতি মাতৃক্রোড়ের মতো সুখ দুঃখকে আগলে রাখে– 'জনাকীর্ণ ঘরে উঠোনে রাস্তায়/স্নেহ প্রেম প্রীতি সখ্য/চোখের শূন্যতাকে/সযত্নে স্মৃতির কোলে তুলে দিল' (ভুবনভাঙার বাউল এক/*কাল মধুমাস*, ২/১২১)।

স্মৃতির মতো স্বপ্নও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শব্দচিত্র রচনা করেছে। স্বপ্ন-কল্পনায় কবির অচেতন ও

Dhaka University Institutional Repository

অবচেতন অংশের সুপ্ত বোধ বিশেষ ভাবকল্প নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। যদিও এই স্বপ্ন সারাদিন কবির চেতনাকে আলোড়িত করেছে, তবুও যে স্বপ্ন মানুষকে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, তাতে ব্যাখ্যাতীত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন থাকে বলেই আমাদের মনে হয়। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি –

কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে
এক স্বপ্ন।
কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শিখরে উঠে
আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম
আকাশ। (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩১–১৩২)

কবিকল্পিত স্বপ্ন কেবল কোটালের স্রোতে ঢেউয়ের শীর্ষে উঠে আকাশ ছুঁতেই উদ্বুদ্ধ করে না, পাঠক এই স্বপ্নকেও যেন ছুঁয়ে দেখতে পারে।

হিংসা-ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত

হিংসার মতো ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তির শব্দচিত্র নির্মাণে সুভাষ চমৎকার শিল্পসিদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন। হিংসার অবয়ব নির্মাণকালে তাঁর মনে পড়েছে সাপের প্রসঙ্গ। তাই হিস হিস শব্দের সঙ্গে চোখ টাটানোর হিংস্রতা দৃশ্যময়তা লাভ করেছে –

কথার আড়ালে আবডালে
চেরা জিভে
হিস হিস করছে চোখটাটানো
হিংসে। (যদি বলি/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৫)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ষড়যন্ত্রের মতো বোধগম্য বিষয়কেও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলেন তাঁর অসাধারণ শব্দচিত্রের মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে হিংস্রতার যোগ নিবিড় বলেই তিনি এর অবয়ব নির্মাণ করেন অনেকটা দানবের মতো করে। দু'টি উদাহরণ –

ক. বাল্‌ব-চুরি করা রাস্তায়
জোনাকিদের চোখে
চম্‌কে চম্‌কে ওঠে কী এক ষড়যন্ত্র। (বাসি মুখে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৪)

খ. তারপর শেষ রাত্রে
রাস্তায় ভারী বুটের শব্দে
গায়েবী টুপি প'রে
উঠোনে পা নামাবে ষড়যন্ত্র– (বারুদের মতো/*যত দূরেই যাই*, ২/৮৯)

উদ্ধৃতি ক-এ ষড়যন্ত্রের ধ্বংসাত্মক চেহারা মূর্ত করতে কবি নিরীহ জোনাকির চোখের আলোর শরণ নিয়েছেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে ঔপনিবেশিক শক্তি যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, কবি তার গায়ে সিপাহীর পোশাক পরিয়ে মাথায় তুলে দেন গায়েবী টুপি। বুটের শব্দ, টুপি প্রভৃতি অনুষঙ্গ ষড়যন্ত্রকে কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্যই করে না, তা চিত্রকল্পটিকে শ্রবণেন্দ্রিয়তাও দান করে।

চক্রান্ত ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তাই যে চক্রান্ত দাঁত নখ বিস্তার করে মানুষকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, তাকে অভিনব

Dhaka University Institutional Repository

কৌশলে হত্যা করতে চান কবি। এই হত্যাকাণ্ডের শব্দকেও বাকপ্রতিমায় ধারণ করেছেন তিনি –

যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় রেখে
পট ক'রে একটা শব্দ তোলো ॥ (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১১০)

সুভাষের একটি কবিতায় হিংসা-বিদ্বেষ-চক্রান্তের ফলে সৃষ্ট বিভেদ বিস্ময়কর বাকপ্রতিমা সৃষ্টি করেছে। চক্রান্ত কারীরা মানুষের ঐক্য নষ্ট করার জন্য লোভ দেখায়। এই লোভই মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে, পারস্পরিক বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে সুবিধাবাদীরা সর্বস্ব লুট করে নেয় –

বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে ॥ (সামনেওয়ালা ভাগো/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২০)

উদ্ধৃতিটিতে বিভেদ এক টুকরা মাংসের রূপকে চিত্রিত হওয়ায় চিত্রকল্পটি সচল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অরণ্য-খাঁচা-পাখি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অরণ্যের ইমেজ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি খাঁচা এবং পাখির অনুষঙ্গেও রচনা করেছেন অসাধারণ কিছু বাকপ্রতিমা। অরণ্যের চোখ দিয়ে শহরকে দেখতে চাওয়ার মধ্যে কবির গভীরতর জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। অরণ্যের প্রাণিকুল যে বন্য-বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, শহরের মানুষগুলোর মধ্যে তারই প্রকাশ দেখে কবি বিহ্বল হয়েছেন, যার শব্দচিত্র অঙ্কিত হয়েছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে –

মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে আসত বিড়ির পাতা–
তাতে নানা মাপের জানলা-দরজা ফোটানো;
তার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এ শহরকে দেখতে চাইত
দূরের এক ঘোমটা দেওয়া অরণ্য। (ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ২/১০১)

অরণ্যের মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়ায় যেমন রহস্যময়তার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি লাজুক বউয়ের অনুষঙ্গ অরণ্যের অকৃত্রিমতাকেও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

বনের সৌন্দর্যকে জীবন্ত করে তোলে যে পাখি, সেই পাখি অরণ্যের আনন্দকে বুকে ধারণ করে অজানার উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়– 'পুলকিত অরণ্যের/ মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত/পাখি নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে মেলে পাখা' (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৪)। দুটি ফিঙে অবশ্য ডালে ডালে নাচানাচি করে বেড়ায়, যা সুভাষের কবিকল্পনায় চমৎকার খেলায় রূপ নিয়েছে –

এ-ডাল ও-ডাল
লেগে থেকে সারাক্ষণ এ ওর পিছনে
চোর-পুলিশ
খেলছে দুটো ফিঙে। (ছিন্নভিন্ন ছায়া/*এই ভাই*, ২/১৯৭)

ফিঙের অনুষঙ্গে কবি যদিও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুবিধাবাদী শ্রেণীর পারস্পরিক লেনদেনের দৃশ্যকে ধারণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছেন, তবু নিছক খেলা হিসেবেও ছবিটি আলোচ্য চিত্রকল্পে সজীবতা ও প্রগাঢ়তা লাভ করেছে।

পাখিহীন একটি খাঁচার অভিমান সুভাষের কবিতায় উজ্জ্বল চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছে–

উড়ে গেছে আলোর নীল পাখিটা।
তাই মুখ কালো ক'রে
অভিমানে
দেয়ালে ঠিকরে আছে
মরচে-পড়া লতাপাতায় লোহার বাসরে শূন্য খাঁচা। (কে যায়/*এই ভাই*, ২/১৮১)

উদ্ধৃতিটিতে খাঁচা বন্দিত্বের প্রতীক হলেও একে অভিমানী হিসেবে চিত্রিত করায় তা প্রাণবন্ত রমণীয়তা লাভ করেছে বলে মনে হয়। কবিকল্পনার প্রগাঢ়তায় মুখ কালো করে দেয়ালে ঝুলতে থাকা খাঁচাটির জন্যও পাঠকের মায়া হয়।

খবরের কাগজ ও বিজ্ঞপ্তি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে দুঃসময়ের শব্দচিত্র নির্মাণ করেছেন, খবরের কাগজও সেই সময়েরই দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত। খবরের কাগজ যেন 'দৈনিক দীর্ঘশ্বাস' নাম ধারণ করে প্রত্যেহ সকালে নানা ঘরের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি চমৎকার ফুটেছে সুভাষের ভাষায় – 'তারপরই চলন্ত সাইকেলে/দু-পাশের গাড়িবারান্দায়, রেলিঙে, ফুলের টবে,/ঘরের মেঝেয়,/গালে চড় মারবার শব্দে/সকালের কাগজগুলো/ঠাস্ ঠাস্ ক'রে পড়তে থাকবে।' (সকালের ভাবনা/*কাল মধুমাস*, ২/১২৫)। চপেটাঘাতের ভঙ্গিতে পত্রিকার ছড়িয়ে পড়া এবং তার ঠাস্ ঠাস্ শব্দ চিত্রকল্পটিকে শিল্পসফল করে তুলেছে। আরো দুটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে –

ক. পাশ ফিরে দেখি
মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সকালের কাগজ।
(একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫২)

খ. কালি মেখে
মুখ চুন ক'রে থাকা
ভগ্নদূতের মতো
আজকের কাগজ (ভগ্নদূত/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪২)

দু'টি উদ্ধৃতিতেই সকালের কাগজ পাঠকের বোধের কাছে সজীব ও প্রগাঢ় অনুভব সৃষ্টি করে বলে চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে।

সুভাষের একটি কবিতায় একটা জ্বলন্ত কাগজ চমৎকার শব্দচিত্র সৃষ্টি করেছে। কাগজটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তা এমন চমৎকার ভঙ্গিতে স্রোতের ওপর ভেসেছে যে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে দেখতে পাঠকের করতালি দিতে ইচ্ছে করে –

একটা জ্বলন্ত কাগজ
হাত ছেড়ে দিয়ে
স্রোতের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

বেশ ক্ষানিকক্ষণ মজা করে ভাসল। (সান্ধ্য/*কাল মধুমাস*, ২/১৪৪)

ল্যাম্পপোস্টে চাটাইয়ের সঙ্গে সেঁটে দেয়া একটি বিজ্ঞপ্তির কাগজ হারিয়ে গেলেও ছেঁড়া চাটাইটি এখনো ঝুলছে। এই দৃশ্য সুভাষের কবিতায় সৃষ্টি করেছে গভীরতর ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ চিত্রকল্প। ঝুলে থাকা পুরোনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাইটি কবিকল্পনায় ফাঁসির রূপ নিয়েছে। দৃশ্যকল্পটি পাঠকের অনুভূতিকে আলোড়িত করে বলেই চিত্রকল্প হিসেবে এটি সার্থক–

ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাচ্ছে দেখ,
ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাচ্ছে
পুরোনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই (খোলা দরজার ফ্রেমে/*কাল মধুমাস*, ২/১১৫)

জল ও শিশির

জলের অনুষঙ্গে চিত্রিত দুইটি শব্দকল্পে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনভাবনা অসাধারণ শিল্প-সংহতি লাভ করেছে। জলের শরীরে তিনি এঁকে দিয়েছেন স্বকালের নানা স্মৃতিচিহ্ন। কবির বোধের গভীরতর স্তরে ছড়িয়ে যাওয়া এই জল পাঠকের অনুভূতিকেও জড়িয়ে ধরে –

ক. এখন যে যতই সাফাই গাক্
হাত-ধোয়া নোংরা জল আমাদের চোখের ওপর দিয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। (উত্তরপক্ষ/*এই ভাই*, ২/১৭০)

খ. যেখানে হাইড্রান্ট-উপচানো
গঙ্গার জল
ফোকলা পুরুতের মতো
কেবলি ভুল উচ্চারণে
বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে
সমানে পড়ে চলেছে
তর্পণের মন্ত্র (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৬)

উদ্ধৃতি ক-এর জল নোংরা, অপবিত্র। হাত ধোয়া নোংরা জলকে তিনি গড়িয়ে দিয়েছেন চোখের ওপর দিয়ে। এই শব্দকল্পে সুভাষ মূলত চোখের জলে জেগে ওঠা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। উদ্ধৃতি খ-এর হাইড্রান্ট উপচানো জলকে গঙ্গা অনুষঙ্গে পবিত্র করে তোলার চেষ্টা আমরা লক্ষ করি। অপচয়িত জলের অস্পষ্ট শব্দকে ফোকলা পুরুতের ভুল উচ্চারণে পড়া মন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করায় জল এখানে দৃশ্যময়তা ও শ্রুতিগ্রাহ্যতা লাভ করেছে। কলকাতার পথের ধারে জলের কলের শব্দকে কবি খরস্রোতা নদীর কলতানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন – 'আর আমরা জলের কলে শুনি–/চোখ বড়ো বড়ো করা আকাশের নীচে/পাথরের নুড়িতে লাফিয়ে-পড়া/এক দিগ্‌ভ্রান্ত দামাল নদীর/কলতান' (আমরা যাব/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৭)। কবি-কল্পনা এখানে মননদ্যোতনা-সমৃদ্ধ এবং সুদূরসঞ্চারী বলেই তা চিত্রকল্পে উন্নীত।

কুয়াশার জমাটবদ্ধ অভিমান যখন শিশিরের স্তব্ধতা হয়ে ওঠে, তখন সকালের ঘাসের ডগায় মুক্তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ দৃশ্য কেবল স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লী প্রকৃতিকেই অপরূপ করে তোলে। সুভাষের কলকাতায় শীতের

Dhaka University Institutional Repository

শিশির জমে ওঠে তারের বেড়ায়। ঝুলন্ত শিশিরের ফোটা চমৎকার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে –

সকালে শীতের ভোরে তারের বেড়ায়
ঝুলে ঝুলে থাকত যেন নাকের নোলক। (কাল মধুমাস/ *কাল মধুমাস*, ২/১৬০)

উদ্ধৃতিটিতে শিশির নাকের নোলকের উৎপ্রেক্ষায় চিত্রিত হয়েছে। নোলকের অনুষঙ্গে ছবিটিতে যে রমণীয়ত্ব ফুটে ওঠে, তাই এই শব্দচিত্রটিকে সজীবতা ও প্রগাঢ়তা দিয়েছে। শিশিরের জলের মতোই ঝুলে থাকা বৃষ্টির পানিতে কবির শেকড়-উন্মুল বিপন্নবোধের প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিতে –

টেলিগ্রাফের তারে
বৃষ্টির শেষে জলের ফোঁটার মত
যখন আমি টলমল করি (হিকোরি চিকোরি/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২১২)

উপমানচিত্রটিতে জলের ফোঁটার দোদুল্যমানতায় কবির দ্বিধান্বিত অবস্থা বিস্ময়কর বাকমূর্তি লাভ করেছে।

পর্দা-পোশাক

দরজা-জানালায় ঝুলে থাকা পর্দার দুলে ওঠার দৃশ্যে কবি কারো অপেক্ষায় অস্থির মানুষের পায়চারির বাকচিত্র নির্মাণ করেছেন। কখনো-বা রোদে দেওয়া জামা-কাপড়কে তিনি দুপুরের অলস ঘুমে গড়াগড়ি দিতে দেখেছেন। নিচের উদ্ধৃতি দুটি লক্ষ করি –

ক. যেন কিছুর অপেক্ষায়
পর্দাটা
সেই কখন থেকে
কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছে ॥ (জল আসুক/*এই ভাই*, ২/১৮৫)

খ. কাঠের স্লিপারে শুয়ে সারবন্দী
দুপুরে গড়ায়
রোদে-দেওয়া গেঞ্জি গামছা জাঙিয়া মেরজাই। (ছিন্নভিন্ন ছায়া/*এই ভাই*, ২/১৯৭)

উদ্ধৃতি ক-এ পর্দার নড়াচড়াকে তিনি কারো অপেক্ষায় ঘর-বার করা মানুষের উৎপ্রেক্ষায় চিত্রিত করেছেন। মানুষের একটি বিশেষ গতিবিধির অনুষঙ্গে শব্দচিত্রটি বিস্ময়কর বাকস্ফূর্তি লাভ করেছে। উদ্ধৃতি খ-এ ব্যবহৃত বস্ত্রের মধ্যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করায় তা বোধসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

শব্দ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দকে (sound) এমন ভাবরূপচিত্রে নির্মাণ করেন যে, শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ সজীবতা ও প্রাণবন্ততা লাভ করে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তিনি যেমন বলেছেন– 'যা বলবার আমরা জোর গলায় বলি,/শব্দ আমাদের ব্রহ্ম' (উত্তরপক্ষ/*এই ভাই*, ২/১৭১), তেমনি শব্দকে দৃশ্যমান করতেও তিনি যত্নের স্বাক্ষর রেখেছেন –

ক. তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ উঠল। (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৮)

খ. ডানায় ভর দিয়ে
আমার ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগা
শব্দগুলো
গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসুক একবার
মাঠের নবান্নে (জলদি জলদি/*এই ভাই*, ২/১৯৭)

গ. পেছন থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে
এক শশব্যস্ত পদশব্দ (ফেউ/*ধর্মের কল*, ৫/২৩২)

উদ্ধৃত ক-এ কোন এক 'কালো কুচ্ছিত' গৃহবধূর গতিবিধি ও গৃহস্থালি কাজের শব্দকে চোখের সীমায় নিয়ে এসেছেন কবি। শব্দের নানা ধরনে তা ধ্বনিময়তা অতিক্রম করে দৃশ্যময়তা লাভ করেছে। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিটিও শব্দকে সপ্রাণ করে তুলেছে। এখানে শব্দ একই সঙ্গে দৃশ্যরূপময়তা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ময়তা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি গ-এর শব্দটি ভয়ঙ্কর কোন অবস্থাকে চিত্রময়তা দিয়েছে। শশকের রূপকে শব্দের ছুটে আসায় শব্দ যেন জীবনীশক্তি লাভ করেছে। একইভাবে কামানের শব্দ গলাঝাড়ার রূপকে জান্তবতাকে অতিক্রম করে দানবীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে নিচের চিত্রকল্পে –

যখন আকাশে ছাই,
গলা ঝাড়ে কামানের মুখ,
সবুজে ও নীলে কাঁপে আতঙ্কের ছায়া (কাণ্ড দেখ! /*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৬)

চোখ ও কান্না

সুভাষ মুখোপাধ্যায় চোখের ভাব ও ভাষাকে যেমন শব্দচিত্রে মূর্ত করে তোলেন, তেমনি কান্নাও উত্তীর্ণ হয় তীব্র চেতনা-সঞ্চারক বাকপ্রতিমায়। মানুষের লোভ ও হিংস্রতার প্রকাশ চোখকে ভিন্ন মূর্তি দান করে। নিচের উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করলে সুভাষের শব্দচিত্রের সক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যাবে –

শো-কেসের স্বচ্ছ কাঁচে
মাথা-খুঁড়ে-মরা পতঙ্গের মতো
অগণিত চোখ (পাতালপ্রবেশের আগে/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৭)

উপমানচিত্রটি মানুষের লোভের তীব্রতাকে প্রকটিত করেছে। 'ভেতরে নজরবন্দী বাসনার/ওস্কানো আগুনে/ঝাঁপ দেবে ব'লে' যে চোখ শো-কেসের দেয়ালে আছড়ে পড়ে, তা অনায়াসে মাথা খুঁড়ে-মরা পতঙ্গের উপমায় চিত্রিত করা যায়। চোখের অনুষঙ্গে ইমেজটি বিস্ময়কর শিল্পসফলতা লাভ করেছে।

সুভাষ কান্নার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার এমন বিবরণ প্রদান করেন যে, তা শাণিত অস্ত্রের মতো দিন আর রাত্রিকে বিদীর্ণ করে। এখানে কান্না ধ্বনিরূপময়তার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যরূপময়তাও লাভ করেছে –

কচি কচি কণ্ঠে দিন আর রাত্রিকে টুকরো টুকরো ক'রে
কারা কাঁদছে
মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনকে জড়িয়ে ধরে
কারা কাঁদছে (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষর ও লেখার আয়ু

অক্ষরের সম্মোহন কবিকে অন্য জগতের অধিবাসী করে তোলে, যে জগতে কবি-মনের অবচেতন ও অচেতন অংশের অভিজ্ঞতাকেও ভাবরূপচিত্রে বিবৃত করা যায়। আবার যে লেখার জন্য কবি নিবিড় তপস্যায় মগ্ন হন, তার আয়ু সম্পর্কেও সুভাষের সংশয় কাটে না। উদ্ধৃতি দুটি বিবেচনা করা যাক –

ক. পিঁপড়ের মতন
সার দিয়ে
অক্ষরগুলো মুখ বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে
আমাকে নিয়ে চলেছে (আগুন লাগলে/*জল সইতে*, ৩/৩২২)

খ. হেমন্তে হলদে পাতার মতন
হায়, আমার
এই দিন-আনি দিন-খাই
লেখার আয়ু। (আজ আছি কাল নেই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/১৯৭)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটিতে কবির লেখনীর নানা বাঁক-পরিবর্তনকে পিঁপড়ের দিক বদলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সারিবদ্ধ পিঁপড়ার সঙ্গে অক্ষরের সাদৃশ্য-কল্পনায় তা গতিশক্তি অর্জন করেছে এবং এই গতি পাঠকের দৃষ্টিকেও প্রণোদিত করে বলে ইমেজটি সার্থকতা লাভ করেছে। খ-সংখ্যক দৃষ্টান্তটিতে উপমেয় লেখার আয়ুকে উপমান হেমন্তের হলুদ পাতা দৃশ্যমানতা দান করেছে। সাদৃশ্যধর্মিতায় চিত্রকল্পটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

গন্ধ ও গান

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তুলেছেন। গন্ধের মতো অদৃশ্য অনুভবকেও তিনি দৃশ্যময়তা দিয়েছেন। আবার তিনি যখন বিশাল ময়দানে গান ছড়িয়ে দেন, তাও চেতনার চোখে ছবির মত ভেসে ওঠে। নিচের উদাহরণ দুটি লক্ষ করি –

ক. ধূর্ত বাঘের মতো
আমি তাকে গন্ধ দিয়ে চেনবার চেষ্টা করি (ফেউ/*ধর্মের কল*, ৫/২৩২)

খ. ময়দানের এ-কোণ থেকে ও-কোণ
কচি কচি গলায়
ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ছিল গান : (এক মাঘে শীত যায় না/*ধর্মের কল*, ৫/২২০)

উদ্ধৃতি ক-এর উপমানচিত্রটি কবির ঘ্রাণশক্তির তীব্রতাকে চিত্রিত করেছে। মূর্ত উপমানচিত্রের সঙ্গে অমূর্ত উপমেয়ের সংশ্লেষণ চিত্রকল্পটিকে অনুভববেদ্য নান্দনিকতা দিয়েছে। তিনি ফুলের গন্ধ এবং খাঁড়ার ধারকে ব্যবহার করে বিপরীত অভিপ্রায়কেও সিদ্ধ করেছেন, যা তাঁর শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে –'ফুল তুলে কেউ যেন আমাকে কাটতে/খাঁড়া তুলে কেউ আমাকে/যেন গন্ধ শোঁকাতে না আসে' (বুড়ি বসন্ত/*ধর্মের কল*, ৫/২২৭)। উদ্ধৃতি খ-এর গান দৃশ্যমান ঢেউয়ের উপমায় দর্শনেন্দ্রিয়কে কেবল আমোদিত করে না, অনুপ্রাণিতও করে। কচি কচি গলার গান ঢেউ হয়ে ওঠায় তা কবিকল্পনার প্রগাঢ়তায় প্রাণবন্ত চিত্রকল্প।

Dhaka University Institutional Repository

শহর-বাড়ি-ভাতের হাঁড়ি

কলকাতা শহরের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, সম্ভাবনা-সমস্যা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। শহরের ব্যস্ততাকে চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি শহর কলকাতাকে একটি দানবের অবয়ব দিয়েছেন, যার বিশাল হাতের মুঠোয় সবাই যেন বন্দি হয়ে আছে। হাত মুঠো করলেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, আর মুঠোটা খুললেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো কলকাতা –

সেই কোন্ সকালে
এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে দূরে
দূরে দূরে
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিল (কে জাগে /*যত দূরেই যাই*, ২/৭৯)

উদ্ধৃতিটি কেবল কলকাতা শহরের সজীবতাকেই চিহ্নিত করে না, তার হিংস্রতাকেও মূর্ত করে তোলে। সুভাষ অবশ্য কলকাতার অন্ধকারকেও বাণীরূপ দিয়েছেন – 'বাইরে/আলোগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে/দরজা দেবার শব্দে/এখুনি ঘর অন্ধকার করবে/এই শহর' (কে জাগে/*যত দূরেই যাই*, ২/৮০)। শহরের এই অন্ধকার কবিচৈতন্যের অবচেতন ও অচেতন স্তরের আলো-আঁধারির অভিজ্ঞতাকেও প্রতিফলিত করে। এই শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে ইলেকট্রিক পাম্পের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কবিকল্পনায় অভিনব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। বাড়িটিকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি যে পরাবাস্তব রূপকল্প নির্মাণ করেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর –

ইলেকট্রিক পাম্পে ঝিঁঝি-লাগা ফ্ল্যাট-বাড়িটা।
যেন মহাশূন্যে ঝুলছে। (কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ/*কাল মধুমাস*, ২/১২৪)

উৎপ্রেক্ষার সংশয়িত উচ্চারণ যে বিহ্বলতা সৃষ্টি করে, তাই এই শব্দচিত্রটিকে সজীবতা ও প্রগাঢ়তা দিয়েছে। এ রকম কোন একটি বাড়িতেই হয়তো কবি লক্ষ করেছেন– 'পায়ের শব্দে নেমে যাচ্ছে/অন্ধকার সিঁড়ি' (জলছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৭)। অন্ধকার সিঁড়ি গতিপ্রাপ্ত হওয়ায় তা লাভ করে অভিনব ব্যঞ্জনা।

ভাতের হাঁড়ি অনুষঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা শহরেরই একটি পরিবারের উপবাসের শব্দচিত্র নির্মাণ করেছেন। মানবেতর জীবনযাপনের এই দৃশ্যকল্প কবির জীবননিষ্ঠ শিল্প-বিশ্বাসেরই স্মারক –

নেভানো উনুনের ওপর পড়ন্ত আলোয়
যেন
ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে
কাল বিকেলে মাজা ভাতের হাঁড়ি। (একটি লড়াকু সংসার/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৮)

নেভানো উনুনের ওপর ঝুলে থাকা গতকালের মাজা ভাতের হাঁড়ি অনশনে মৃত্যুর আশঙ্কা সৃষ্টি করে বলেই কবির মনে পড়েছে ফাঁসির প্রসঙ্গ। ঝুলন্ত হাঁড়িকে ফাঁসির উৎপ্রেক্ষায় চিত্রিত করে তিনি যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে, তা কবির অনুভবের প্রগাঢ়তায় সমৃদ্ধ হয়ে চমৎকার চিত্রকল্পে উন্নীত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ চিত্রকল্পেই তাঁর প্রগতিশীল

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববীক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনের অনেক উপেক্ষিত বিষয়কে তিনি ব্যঞ্জনাধর্মী প্রগাঢ়তায় চিত্রিত করেছেন। কবিতাকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন বলেই মানুষের কাছের জিনিসকে তিনি কবিতার উপকরণ ও প্রেরণা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সরল ভাষায় অনুভবের নিবিড় পরিচর্যায় তিনি তাঁর ভাবনাকে গ্রথিত করেছেন। সুভাষের কবিতায় শব্দের শক্তি নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দিয়ে ঝর্ণার মতো গান গেয়ে উঠেছে। প্রতীকী অর্থমাত্রায় ঋদ্ধ কিছু শব্দ, চরিত্র এবং ঘটনা তাঁর চিত্রকল্পে নতুন মাত্রা এনেছে। অন্যাসক্ত এবং সমাসোক্তির সাবলীল ব্যবহার সুভাষের কবিতার প্রধান প্রবণতা হলেও, তাঁর অধিকাংশ শিল্পসফল চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং রূপকের সাহায্যে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের জগতই কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার তাঁর শিল্পদৃষ্টির নিয়ামক, কবিতায় চিত্রকল্প সৃজনেও তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। কবিতাকে দিন বদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে তিনি যে কাব্যভাষা নির্মাণ করেছেন, তা যেমন সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তেমনি অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শিল্পোত্তীর্ণ করার প্রয়াসে বক্তব্যে এনেছেন সজীবতা এবং সংহতি। তাঁর চিত্রকল্পে ব্যক্তিগত বিশ্বাসই সামষ্টিক চেতনার উদ্দীপক হয়ে উঠেছে। ফলে বাংলা কবিতার মূল স্রোত থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়। চিন্তাকে চিত্রে রূপায়িত করে বাক-প্রতিমা নির্মাণের সফল শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. Stephen J. Brown (1927 : 7) বলেছেন, 'This must surely be obvious as regards poetry : imagery is its very life.'

২. Ezra Pound, "A Few Don'ts by an Imagiste", প্রবন্ধে বলেছেন, "An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time." An essay in the book 'Twentieth Century Criticism : The Major Statements' [ed.] William J. Handy & Max Westbrook, Indian Edition, Life & Light Publishers, New Delhi, 1976. p.18.

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'মানুষ তো শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটা দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ, একথা মানা চলিবে না। চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয়, তবে সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৯ : ১২৩)। চিত্রশিল্পের মতো চিত্রকল্পও পাঠকের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে তাতে নতুন অর্থমাত্রা যুক্ত করে।

৪. সরকার আমিন (২০০৬ : ১৩) তাঁর চিত্রকল্প-বিষয়ক আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবনাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে কবিচৈতন্যের দার্শনিক সজ্ঞার সঙ্গে মানব-মনের ত্রি-স্তর অস্তিত্বকেও বিবেচনায় আনায় চিত্রকল্পের ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

৫. প্রদীপন দাশগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ : মেরু অন্বয়ের সূত্র, *অমৃতলোক*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

১. বার্ণিক রায়, ১৩৭৮, *কবিতা : চিত্রিত ছায়া*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

২. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৯, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, তৃতীয় সংস্করণ,পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৪. সরকার আমিন, ২০০৬, *বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, আলো-আধাঁরের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬. C. D. Lewis, 1968, *The Poetic Image*, Jonathan Cape, London.

৭. Stephen J. Brown, 1927, *The Word of Imagery*, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd, London.

৮. Stephen Spender, 1965, *The Struggle of the Modern*, University Paperbacks, London.

৯. William J. Handy & Max Westbrook [Ed.], 1976, *Twentieth Century Criticism : The Major Statements*, Indian Edition. Life & Light Publishers, New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতীক

কবিতা জীবনেরই শিল্পভাষ্য। একজন আধুনিক কবি তাঁর সমগ্র জীবনকেই কবিতায় চিত্রিত করতে চান। এই চিত্রায়ণের প্রকরণ-প্রকৌশলে তিনি যেমন ঐতিহ্যের স্বীকরণ করেন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনবীক্ষার আলোকে নির্মাণ করেন নিজস্ব শিল্পভাষা। যে কোন সংবেদনশীল মানুষই বিশ্বনাগরিক। তাই তাঁর শিল্প-ঐতিহ্যে বিশ্ব-ঐতিহ্যেরই প্রতিবিম্ব লক্ষ করা যায়। আধুনিক কবিতার প্রকরণ আলোচনায় তাই কেবল বাংলা কবিতা নয়, বিশ্বকবিতাকেই বিবেচনায় আনতে হয়। বাংলা কাব্য-প্রকরণে প্রতীক সৃষ্টি বাঙালি কবিদের সৃজনভুবনকেই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি ফরাসি প্রতীকী কাব্যপ্রকরণের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় প্রতীক সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধিতে বোদলেয়ারের ভূমিকা তো বেশ জোরের সঙ্গেই স্বীকার করেছেন কেউ কেউ।[১] প্রতীকী কাব্যান্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন বোদলেয়ার কিন্তু এর প্রধান পুরুষ মালার্মে। এছাড়া র‍্যাঁবো, ভারলিন, ভালেরি প্রমুখের কবিকীর্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এডগার এলান পো, হথর্ন, মেলভিন, এমার্সন প্রমুখ কবির কবিতায় প্রতীক সৃষ্টির প্রয়াস এই আন্দোলনকে পুষ্টি জুগিয়েছে। রোমান্টিক কবিতার প্রাকরণিক শৈথিল্য ও অন্তঃসারশূন্যতা পরিহার করে প্রতীকবাদীরা কবিতাকে সংহত করতে গিয়ে জটিলতার জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু আধুনিক জটিল জীবনের সকল প্রান্তকে স্পর্শ করার প্রয়োজনে এই জটিলতা সাদরে গৃহীত হয়েছে।

প্রতীকবাদী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শব্দের সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে তাকে বাস্তব-অতিরিক্ত ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করা। ফলে সাধারণ প্রতীকের সঙ্গে প্রতীকী কবিদের শব্দ-সংযোজনায় স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। প্রতীকবাদীরা প্রায় প্রতিটি শব্দের শরীরে এমন ভাব-অনুষঙ্গ জুড়ে দেন, যা তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণিলতাকে দূরসঞ্চারী করে তোলে। ফলে শব্দ আর প্রতীক প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে। বাঙালি কবিদের রচনায় প্রতীকী কাব্যপ্রকৌশলের প্রভাব স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে, প্রচলিত শিল্পঐতিহ্যের আলোকেই তাঁরা বিশ্বসাহিত্যের বাঁক-বদলকে স্বাগত জানিয়েছেন। ফলে প্রতীকবাদীদের প্রতীক-সর্বস্বতায় অবগাহন না করে বাঙালির মানস-সংবেদনার আলোকেই আমাদের কবিরা আধুনিক বিশ্ববীক্ষার শিল্পরূপ দিয়েছেন।

প্রতীকের সাহায্যে অরূপ ও অতীন্দ্রিয় জগতকে চিত্রিত করা হয়। প্রতীক জাগতিক রূপময় ভাষার এমন এক অবয়ব নির্মাণ করে নেয় যা শব্দের প্রচলিত অর্থের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। চিন্তা ও কল্পনাকে দূরসঞ্চারী করতে ব্যর্থ হলে প্রতীকের প্রতীয়মান অর্থের উপলব্ধি অসম্ভব। প্রতীক যে ভাবকে ব্যঞ্জিত করে, তা অনেকটা পাঠকের অনুভববেদ্যতার মুখাপেক্ষী। 'প্রতীক সম্বন্ধে যা বলা চলে তা হলো এই, প্রতীকে ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা লাভ করা যায়। ...আসলে প্রতীক বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শন শুধু নয়, প্রতীক হচ্ছে কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি, সম্মিলন, একটি গভীর রহস্য, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিচিত্র ব্যঞ্জনা। শুধু একটি অর্থ উদ্ধার করে প্রতীক বিশ্লেষণ চলে না।' (আহমদ কবির ১৯৯৫ : ৯৯–১০০)। প্রতীক, যা নিরাবরণ-নিরাভরণ প্রগাঢ় অভিব্যক্তির ধারক, পাঠকের অনুসন্ধিৎসাকে রহস্যাবৃত করে। কবির ভাষা ও

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যের সরলরৈখিকতাকে অতিক্রম করে প্রতীক তাতে নিবিড়তা ও সঙ্কেতময়তা দান করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জগন্নাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে –

> প্রতীক এক বিশেষ অর্থের প্রতিনিধি নয়। প্রতীকের মধ্যে অনেক অকথিত, অপ্রকাশিত অর্থ যোগরূঢ় হয়ে থাকে। নর্তকী যেমন নাচের মানে কি বলতে পারে না; তা বলা যায় না বলে কষ্ট করে দেখাতে হয়; তেমনি প্রতীকও ব্যাখ্যার মধ্যে পেতে চেষ্টা করা ভুল। তাকে প্রতীকের মধ্যে প্রতীক হিসেবেই পেতে হয়। প্রতীক বলে না, বলতে চায়। কোন বক্তব্য নয়, বলার আগ্রহই তার ভাষা।[২]

প্রতীক সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে কবির প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সুগভীর উপলব্ধির বর্ণিল প্রান্তর। প্রেরণার সঙ্গে অনুভবের লীন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই তা প্রকাশের পথ করে নেয়। তাই প্রতীক সৃষ্টির মাধ্যমে কবির জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার স্বরূপ যেমন নির্দেশিত হয়, তেমনি প্রতীকের দূরপ্রসারী আলোক প্রক্ষেপে কোন কবির সৃজনভুবন হতে পারে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। উপরিউক্ত বিবেচনা সামনে রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শৈলী-বিচারে তাঁর প্রতীকী-তাৎপর্য মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রতীক-প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পবিশ্বাসের মৌল প্রান্ত সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। কবিতা ও জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন তিনি। মানুষের সমস্যাকে চিহ্নিত করার ভাষা যেমন তাঁর কবিতা, তেমনি সম্ভাবনার চিত্রল উপস্থাপনার কাজেও তাঁর কবিতা দৃপ্ত বাক্‌ভঙ্গি অর্জন করে নিয়েছে। দিন-বদলের জন্য প্রয়োজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তাঁর কবিতা সেই পরিবর্তনের পথে আহ্বান করেছে মানুষকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান প্রতীকসমূহের স্বতন্ত্র আলোচনায় আমরা লক্ষ করব, প্রতীক তাঁর শিল্পবোধ ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিতকেই প্রোজ্জ্বল করে তোলে।

লাল

সুভাষ মুখোপাধ্যায় রঙের ভেতর রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারে যেমন সফল হয়েছেন, তেমনি রঙের ভাষায় মানব-মনের বর্ণিল ভাব প্রকাশে তাঁর কবিতা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে লাল রঙের উজ্জ্বলতায় তাঁর কবিতা বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। সাম্যবাদী চেতনার ধারক হিসেবে তিনি লাল রঙের শক্তিতে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষকে। উজ্জ্বল আগামীর প্রতিশ্রুতি হিসেবে লাল রঙ-এর পতাকাতলে সকলকে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সাম্যবাদ যে সুদিন উপহার দেবে বলে মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন, তার জন্য যে সংঘবদ্ধ শক্তির সুদৃঢ় অবস্থান প্রয়োজন, সেই অবস্থানকে তিনি লাল রঙের প্রতীকে চিত্রিত করেছেন। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা– (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. যে-পথে আসবে লাল প্রত্যূষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে। (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৪)

গ. নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা; (নারদের ডায়রি/*পদাতিক*, ১/৩১)

ঘ. লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিল মিছিলে মেলাও যদি, (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩২)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. লাল নিশানের নীচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক। (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৭)

চ. মোড়ে মোড়ে লাল ফতোয়ায় দেখি নব আশা! (ঘরে বাইরে/*পদাতিক*, ১/৪২)

ছ. পালাবার পথে ধুলো-ওড়াবার দঙ্গলে, ভাই
আমিও ছিলাম একজন; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই ॥ (দীক্ষিতের গান/*চিরকুট*, ১/৭২)

জ. আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে
লাল ঝাণ্ডাকে? (জবাব চাই/চিরকুট, ১/৭৫)

ঝ. চলো
দুহাতে উপড়ে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙিন সকাল। (বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৫–১৩৬)

ঞ. তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন ॥ (লাল টুকটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৩)

প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন-নির্যাতনের ছবিও লাল রঙের উল্লেখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন– 'মোতায়েন আজ সাঙ্গুভ্যালির গোলটেবিলে/গোয়েন্দা চোখ ঘোরে সর্বদা লাল দলিলে' (ভূতপূর্ব/*চিরকুট*, ১/৪৮)। এছাড়া আরো কিছু কবিতায় তিনি সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের চোখে বিপ্লবের শক্তিকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গাত্মক ভাষায়। যারা কোন রকমে গা-বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে পেটে লাথি ও পিঠে কিল খায়, তাদের ভবিষ্যৎ কবির চোখে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুভাষের শাণিত ব্যঙ্গ সম্ভাবনার মৃত্যুকে রোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে –

ক. পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে,
হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল সুর দীর্ঘমান তারে ॥ (পলাতক/*পদাতিক*, ১/৩০)

খ. চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন
নিবিড় নির্বাণবিদ্যা বীক্ষণ করে বেঅনেট? (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

গ. রোখো বিপ্লব, লাল ঝাণ্ডার করো নিপাত;
হে দীনবন্ধু নইলে সমূহ কড়ি বেহাত। (শ্রেষ্ঠীবিলাপ/*পদাতিক*, ১/৩৬)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লাল-এর উল্লেখে কখনো কখনো মানুষের মুক্তির জন্য আত্মদানকারী বীরদের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিকে স্মরণীয় করে তুলেছেন। তিনি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক আলোড়ন ও আন্দোলনকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর লাল-প্রতীক প্রয়োগ করে। নিচের উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করি –

ক. সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুন
মুক্তির পদাঙ্ক রাখে। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬০)

খ. লাল অক্ষরে লিখে রাখলাম
যেন কিছুতেই না ভুলি
পনেরোই আগস্ট ফের আসব। (ফের আসব/*চিরকুট*, ১/৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

লাল কেবল সম্ভাবনার প্রতীক হয়েই থাকে নি, সুভাষের কবিতায় এই লাল-এর ব্যবহার সর্বস্বান্ত করার প্রতীকী তাৎপর্যেও প্রোজ্জ্বল হয়েছে। লাল-এর সঙ্গে শকুন-প্রতীক প্রযুক্ত হওয়ায় কবিতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভোটের রাজনীতি মানুষকে শোষণ করে কীভাবে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করে, তারই স্মারক হয়ে উঠেছে নিচের উদ্ধৃতিটি –

রাস্তার মোড়ে মোড়ে লালবাতি জ্বেলে
শকুনেরা দেয় সন্ধ্যে
জোড়াবলদকে দেয়ালে লটকে
ঠোঁট চেটে বলে,
ভোট দে। (রাস্তার গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

লাল-এর উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতার সঙ্গে কালো'র দ্বিধাকে যুক্ত করে মানব-মনের মিশ্র অনুভূতি প্রকাশের চমৎকার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি কালো মেয়ের ভাবনার আকাশকে এমন মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন কবি, যেখানে লাল সম্ভাবনার সংশয়াচ্ছন্নতার প্রতীকী প্রাচুর্য লাভ করেছে–

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল – (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৩)

এভাবেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় লাল বহুমাত্রিক তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়ে প্রতীকী মর্যাদা লাভ করেছে। বর্ণের শক্তির সঙ্গে বুকের বিশ্বাস ও ভালোবাসা যুক্ত করে অনুভূতির ভিন্ন এক দিগন্তে দৃষ্টি দেন তিনি। কবির চিন্তা-জগতের নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চারে এই প্রতীকের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে, কারণ সুভাষ যে সম্ভাবনার দিকে আমাদের আহ্বান করেন, তা এই লাল-পথেই দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে বলে কবির বিশ্বাস।

হাতুড়ি ও কাস্তে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হাতুড়ি ও কাস্তে প্রতীক ব্যবহারে নির্দ্বিধ হয়ে উঠেছে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবিকার হাতিয়ারকে যেদিন যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত করবে, সেদিন মেহনতি মানুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী– এই মার্কসবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শই আলোচ্য প্রতীকে প্রাণবন্ত হয়েছে। কখনো মুক্তির নিশান হিসেবে কাস্তে ও হাতুড়ির প্রসঙ্গ এসেছে, আবার কখনো হাতিয়ার হিসেবে এতে ঝলসে উঠেছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের আগুন। ফসল কাটার গান গাইতে গাইতে কৃষক যখন হাতের কাস্তের দিকে তাকান, তখন জীবনের যাবতীয় অর্জন কিংবা সঞ্চয়ের কথাও আমাদের মনে আসে। কামারের হাতে শাণ দেয়া কাস্তে যুদ্ধের প্রস্তুতিকেই চিত্রিত করে। বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কাস্তে-হাতুড়ি স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের দুশো বছরের শোষণের ইতিহাস। নিচের উদ্ধৃতিসমূহে হাতুড়ি ও কাস্তের প্রয়োগ-নৈপুণ্য লক্ষ করা যেতে পারে –

Dhaka University Institutional Repository

ক. কুঁজো হয় যারা ফুলের মূর্ছা দেখে
পৌঁছোয় না কি হাতুড়ি তাদের পিঠে? (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. চিমনির মুখে শোনো সাইরেন–শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে (মে-দিনের কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)

গ. খাড়া ক'রে কান কাস্তের শাণ
শুনছে নাকি
কামারশালে? (এখানে/*পদাতিক*, ১/৩৮)

ঘ. মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।
একদা কাস্তে নিই সকলে। (ধাঁধা/*পদাতিক*, ১/৪১)

ঙ. যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে।
সাবধান! যারা চাইবে বক্র হাসতে ॥ (*শত্রু/চিরকুট*, ১/৫৫)

চ. শাণানো কাস্তে-হাতুড়ির মুখে সোজা জিজ্ঞাসা–
দু শো বছরের রক্ত শুষেও
মেটেনি পিপাসা ? (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫)

ছ. অহল্যা পাথরে মাথা ঠুকে যারা করেছ দুখানা
কাস্তে ও হাতুড়ি (নিয়ে যাব শহর দেখাতে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৫)

জ. আনো দিন হাতুড়ির
আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের। (আজকের গান/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫৫)

সাইরেন

আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতায় যুদ্ধের ভয়াবহতা তীব্র হয়েছে, সতর্কীকরণের পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং চণ্ডী শঙ্খ বাজিয়ে মানুষকে পশুশক্তির ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে উদ্ধার করতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু আজকের দিনে মানুষের দুর্দিনে আর কোন দেবতা পাশে এসে দাঁড়াবেন না। তাই শঙ্খের জায়গা দখল করে নিয়েছে যান্ত্রিক সাইরেন এবং এই সাইরেন কবি তুলে দেন মানুষেরই হাতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর্ত ও বঞ্চিতের ভাগ্য পরিবর্তনে সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধনে বিশ্বাসী বলেই সাইরেনের শব্দে সমবেত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন কিংবা চণ্ডীর সতর্কবাণীর সঙ্গে তিনি আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। পৌরাণিক প্রসঙ্গের এই আধুনিকীকরণে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি তাঁর শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

ক. চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে। (মে-দিনের কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)

খ. বর্গীরা আসে এদেশে বোমারু পুষ্পকে
শহুরে মোড়ল হুঁশিয়ারি হাঁকে সাইরেনে। (ঘরে বাইরে/*পদাতিক*, ১/৪২)

Dhaka University Institutional Repository

গ. সহসা মাভৈ শোনা গেল চড়া সাইরেনে
স্বদেশে দিয়েছে চম্পট ভীরু বর্গীরা। (ঘরে বাইরে/*পদাতিক*, ১/৪২)

ঘ. জলের পাম্পগুলো
থেকে থেকে হরবোলার মতো
কখনও ঝিঁঝির ডাক, কখনও সাইরেনের শব্দ
নকল ক'রে চলেছে। (বন্ধু/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৮)

উদ্ধৃতিসমূহে সাইরেন সুভাষের জীবন-ভাবনার প্রধান প্রান্তকে স্পর্শ করতে সাহায্য করে। কেবল যুদ্ধের দামামা বা অপশক্তির উদ্দামতাকেই তা চিত্রিত করে নি, সাধারণ জীবনযাত্রার অতিতুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গেও তা জড়িত হয়ে গেছে। জলের কলে পানি পড়ার শব্দে 'সাইরেনের শব্দ নকল' করার এই রূপকল্প সুভাষের কাব্যভাষার একটি বিশেষ প্রবণতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনকে পাঠ করার যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি তিনি লাভ করেছেন, তা কবিতার গঠনশৈলীকেও চমৎকার লাবণ্য দান করেছে। সাইরেন-এর প্রতীকী তাৎপর্য তাই শব্দের অর্থকে অনেক দূর সম্প্রসারিত করে দিয়েছে।

নিশান

সংঘবদ্ধ শক্তির আন্দোলন ও সংগ্রামে অধিকার আদায়ের লক্ষে নিশান উচিয়ে যখন শ্লোগান দেয়া হয়, তখন নিশান সমবেত মানুষের দাবির প্রতীক হয়ে ওঠে। মিছিল ও নিশান তাই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যায়। এই নিশান রক্তে লাল হয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতীক হয়ে ওঠে। কমরেড স্তালিন, লেনিন প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম নেতার জীবনবীক্ষার স্মারক হয়ে ওঠে নিশান। যে শিক্ষা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে বদলে দেবে বলে কবি বিশ্বাস করেন, নিশান তারই প্রতিনিধি হয়ে ওঠে কোন কোন কবিতায়। নিচের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ করি –

ক. মিছিলে সভায় অশান্ত হাতে ওড়াবে নিশান
দুর্দমনীয় দাবী। (ফের আসব/*চিরকুট*, ১/৭৩)

খ. রক্তে রক্তে ভিজে ওঠে লাল নিশান। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭)

গ. লক্ষ পায়ের মিছিলে লাল
নিশান চলে আগে। (ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)

ঘ. হাতে কী ?
নিশান (যেতেই হবে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪০)

ঙ. আমাদের হাতে তুমি দিয়ে গেলে
এ পৃথিবী,
তোমার নিশান। (কমরেড স্তালিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫২)

চ. লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে।
(একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫৫)

কাল মধুমাস (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থের 'নিশান' কবিতাটিতে কবির নিশান-ভাবনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্ফটিক-রূপ লাভ করেছে। একটি বাক্যের ভেতর দিয়ে কবির স্মৃতিলোকে নিশানের প্রভাব ফুটিয়ে তোলার এ সাফল্য বিস্ময়কর। পুরো কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করছি –

Dhaka University Institutional Repository

আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে
দুলে দুলে
সারাক্ষণ
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে
নাচছে ॥ (নিশান/*কাল মধুমাস*, ২/১১৭)

কবিতাটির পঙ্‌ক্তিসজ্জায় নিশানের নাচের মুদ্রাগুলো যেন অঙ্কিত হয়ে আছে। এইভাবে নিশানের দুলে ওঠার মধ্য দিয়ে কবির চেতনালোকে এর শেকড়-বিস্তৃতির একটা বর্ণিল পরিচয় লাভ করা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গে কবি নিশান-প্রতীকের প্রয়োগ করে মুক্তিযোদ্ধার অম্লান আত্মদানের স্মৃতিকে গৌরবান্বিত করেছেন– 'নিশির ডাকে নিশান হাতে/যারা ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিল/তারা এখন/সাড়ে তিন হাত জমির দখল ছেড়ে/আগুনের মুখে ছাই হওয়ার অপেক্ষায়' (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৯)।

কেবল আশা বা উজ্জীবনের প্রতীক হিসেবেই নয়, যারা প্রগতিপন্থায় আস্থা হারিয়ে দিন-বদলের পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্যবদলের চেষ্টায় নেমেছে, সাম্যবাদের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত বৈভবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে, তাদের হাতে নিশানের একটি ভিন্নরূপও দেখি আমরা। লাল নিশান-এর এই ব্যঙ্গাত্মক প্রয়োগে কবি-হৃদয়ের রক্তক্ষরণ পাঠকের মর্মমূলে নাড়া দেয় –

ক. লাল নিশান ছড়িয়ে দেয়
ঘরের এক কোণে
তাম্রপত্র
শেষ মুক্তির লড়াই বুকের মণিকোঠায় একচ্ছত্র
অন্ধকারে আকাশপ্রদীপ
নিশানা ঠিক রাখে (শের জঙ্গ-এর ডেরায়/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৩৪)

খ. বাড়ি করেছি।
নীল আকাশে তুলেছি ছাদ।
লাল নিশানে
ধরছি সূর্য
ধরছি চাঁদ ॥ (তুঘলক লেনে/*জল সইতে*, ৩/৩৩৩)

কবি লাঠি ও নিশানের পার্থক্য তুলে ধরেন। সময়ের প্রয়োজনে নিশানের লাঠি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। সুভাষের ভাষায় –

মনে রেখো, বাপসকল
লাঠিকে তোল্লা দিলে নিশান হয়
নিশানকে ওল্টালে লাঠি (ধর্মের কল/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

আকাশের বুকে সম্মিলিত সুখ-সমৃদ্ধির বাণী ছড়িয়ে দেয়ার কাজে তিনি যেমন নিশান ওড়ান, তেমনি নীল আকাশে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের সংবাদও পৌঁছে যায় নিশানের মাধ্যমে। এভাবেই নিশান সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তার বৈচিত্র্যিক উদ্ভাবনাকে সচকিত করে প্রতীকী শক্তির স্মারক হয়ে ওঠে।

সঙিন

যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে সঙিন-এর প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। এই সঙিন কবির রাজনৈতিক বিশ্বাসের সমান্তরালে অবস্থান নিয়ে প্রতিপক্ষের হিংস্রতাকে যেমন চিত্রিত করে, তেমনি সময়ের প্রয়োজনে সাম্যবাদী শক্তির সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রতিশোধে তা হয়ে ওঠে শত্রুনিধনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র। নিচের উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করি –

ক. হে প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্ব করো গ্রহণ–
তীক্ষ্ণ সঙিনে আজ ঘনিষ্ঠ অভিবাদন ॥ (শ্রেষ্ঠীবিলাপ/*পদাতিক*, ১/৩৬)

খ. ছত্রভঙ্গ রৌদ্র হয় ফিকে
উদ্যত সঙিন দিকে দিকে। (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৮)

কেবল আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হওয়া নয়, সাহস নিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত হানার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাই তিনি প্রতিপক্ষের তীক্ষ্ণ সঙিনে ভীত না হয়ে তাকে অভিনন্দিত করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন, ছত্রভঙ্গ জনতার শক্তি মুক্তির পথ দেখাতে পারবে না। বিচ্ছিন্নতা প্রকৃত অর্থে বিপন্নতাকেই চিহ্নিত করে। ফলে শত্রুপক্ষ নির্বিঘ্নে অস্ত্রের মহড়া চালায়। প্রতিপক্ষের অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংঘবদ্ধ শক্তিতে তাদের প্রতিহত করার শপথ নেয়। উদ্যত সঙিন দেখে ভয় করার দিন শেষ হয়ে গেছে। অপশক্তির অস্ত্রকে পদদলিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় এখন, বুকে সঙিন বিঁধলেও আর পিছু হটার উপায় নেই। নিচের উদ্ধৃতিসমূহে কবির এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে –

ক. শরীরে সঙিন ফোটে,
রক্তের ফোয়ারা ছোটে, (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৭)

খ. সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের পথে পথে রক্ত দেয় চীন–
ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির:
মৈত্রীর সংকল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙিন। (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৮)

গ. সঙিন উদ্যত করেছো কে ? সরাও।
বাধার দেয়াল তুলেছো কে ? ভাঙো।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি
দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি। (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

ঘ. সঙিনে বিঁধলেও
–না। (যেতেই হবে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪০)

ঙ. যাদের সঙিনে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুত
তারা সামনে থেকে সরে যাও (আগুনের ফুল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪১)

অস্ত্রের জবাব অস্ত্রের ভাষাতেই দিতে হবে। তাই তিনি চল্লিশ কোটি মানুষের হাতে সঙিন তুলে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারালো সঙিন তাদের ললাটে বিজয়ের স্বাক্ষর এঁকে দেবে। কবি বলেছেন–

জাগ্রত চল্লিশকোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙিন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬০)

সঙিন কবির প্রতিবাদের জোয়ারকে প্রবল করে তুলেছে। প্রতিপক্ষের হাতে সঙিন দেখে তিনি সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাই ভেবেছেন এবং নিজের অস্ত্রকে শাণিয়ে নিয়েছেন প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকে। এভাবেই সঙিন অর্জন করে নিয়েছে প্রতীকী তাৎপর্য।

কুঠার

কুঠার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতীক হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক চরিত্র পরশুরামের কুঠার-এর কথা এ ক্ষেত্রে কবিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। শত্রুকে বধ করার এক প্রবল ও অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে কবি কুঠার ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর বিশিষ্ট ভাবনার অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে –

শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা–
তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার
শত্রু পরখ করুক ধার॥ (গ্রাম্য/*চিরকুট*, ১/৫১)

একইভাবে সুভাষের কবিতায় তীরধনুকও যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা পৌরাণিক আবহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি ব্যক্তিত্বহীন মধ্যবিত্তের প্রভুভক্তির প্রতি প্রণত হওয়ার প্রবণতাকে শাণিত ব্যঙ্গে জর্জরিত করেছেন –

অভ্যাস ছিল তীর-ধনুকের ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান–
বলব, বৎস ! সভ্যতা যেন থাকে বজায় ! (প্রস্তাব : ১৯৪০/*পদাতিক*, ১/২৬)

এভাবে কুঠার ও তীরধনুক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক মনোভাবেরই প্রতীক হিসেবে কবিতায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা।

শৃঙ্খল

পরাধীনতার প্রতীক শৃঙ্খল-এর প্রয়োগ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রচুর এবং তা নানা তাৎপর্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে কবিতাকে দীপ্তিময় করেছে। স্বকালের সমাজ-রাজনীতিকে কবিতায় চিত্রিত করেছেন বলেই পরাধীনতার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তাঁর কবিতা। শৃঙ্খল ভাঙার যে গান তিনি গেয়েছেন, তা যুগে যুগে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হওয়ার মতো। কারণ সুভাষ যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, সেখানে প্রতিটি মানুষ মুক্ত, স্বাধীন – সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাঁর কবিতায় শৃঙ্খল নানা ধরনের দাসত্বকে চিহ্নিত করেছে। নিচের দৃষ্টান্তগুলো থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়াস অনুধাবন করা যাবে –

ক. প্রাণ বাঁচানোর নেই কো সহজ পন্থা,
বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে,
আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা। (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

খ. শৃঙ্খলিত সেনাপতি;
তাই ব'লে আমাদের শূন্য নয় তূণ ॥ (আহ্বান/*চিরকুট*, ১/৫৬)

গ. পদতলে স্খলিত শৃঙ্খল,
ঘরে ঘরে ফসলের নবান্ন উচ্ছল– (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯)

ঘ. শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিকে দিকে–
এখানে আমার মনে
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা। (সীমান্তের চিঠি/*চিরকুট*, ১/৬১)

ঙ. হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও–
শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন ॥ (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৫)

চ. শূন্য পেটে নেমে আসে
ছলেবলে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির শৃঙ্খল, (স্বাক্ষর/*চিরকুট*, ১/৬৬)

ছ. শৃঙ্খল দুহাতে দেবে ?
–এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ; (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৭)

জ. কড়াপড়া হাতে শিকল ভাঙার
শপথ কঠিন (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫–৭৬)

ঝ. বারবার হাতের শৃঙ্খল–
পলাতক প্রাণের সম্বল। (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮)

ঞ. মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব; (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮–৭৯)

সুভাষের কবিতার মূল সুর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করা। তাই তিনি অনুভব করেছেন চলতে ফিরতে তাঁর হাতে পায়ে 'শিকলে চাড় লাগে' (ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)। মিছিলে শ্লোগানে হাত উত্তোলিত করতে গিয়ে টের পেয়েছেন, 'এ হাতে শৃঙ্খল দুঃসহ' (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯) এবং শপথ করেছেন, 'ঘা দিয়ে শিকল ভাঙব' (ফের আসব/*চিরকুট*, ১/৬০)। শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচনের এই দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সজীবতা এনেছে।

মিছিল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেণীচেতনা যখনই শ্রেণীসংগ্রামে রূপ নিয়েছে তখনই মিছিলের উজ্জ্বল মুখগুলোর মধ্যে কবি সঞ্চার করেছেন সম্ভাবনার অমোঘ উত্তাপ। শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা মিছিলকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাম্যবাদের আদর্শ এবং শ্রেণীসংগ্রামের উত্তাপ শ্রমজীবী মানুষের রক্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কবি তাদের ডেকে নিয়ে গেছেন মিছিলে। সাম্যবাদের শ্লোগানে রাজপথ কম্পিত হতে হতে শোষিত, নির্যাতিত এবং বঞ্চিত মানুষের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে যায়, এক গভীর বন্ধন তাদের একই উজ্জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত করে।[৩] নিচের উদ্ধৃতিসমূহ বিবেচনা করা যাক –

ক. নির্জন মাঠের চিন্তা ছুঁড়ে দিয়ে বিকেলের মিছিলের পানে,
শহর বিস্বাদে ঢেকে, ডাকি; 'ঝাউ-ঝুমঝুমির ছায়ায় এসো হে,
প্রজাপতি পায় নাকো এরোপ্লেনের শব্দ বাতাসের কানে'; (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৯)

Dhaka University Institutional Repository

খ. লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন; (দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

গ. উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

ঘ. তুমি ছিলে প্রভুভক্ত ছাত্র; সভামিছিলে
দেখিনি কখনো; বুঝিনি কিছুই কী চিজ ছিলে ! (ভূতপূর্ব/*চিরকুট*, ১/৫২)

ঙ. রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার–
হাতের মুঠোয় বজ্র, আমরা মিছিলে হাঁটি। (স্ফুলিঙ্গ /*চিরকুট*, ১/৬৭)

চ. মিছিলে সভায় অশান্ত হাতে ওড়াবে নিশান
দুর্দমনীয় দাবী। (ফের আসব/*চিরকুট*, ১/৭৩)

ছ. ফস্‌ফরাসের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকল
পাথুরে মাটিতে পা টিপে দৃপ্ত মিছিলে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা। (বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১৩৬)

জ. রাস্তা দাও।
আমাদের যেতেই হবে
মিছিলে ॥ (যেতেই হবে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪০)

বিদেশী শক্তির নির্মম নখর যেমন স্বদেশকে রক্তাক্ত করেছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূণ থেকে তৈরি বণিক শ্রেণী স্বদেশীর রক্তে তৃষ্ণা মিটিয়েছে। পুঁজিবাদী সভ্যতার বৈনাশিক বিকৃতির ফলে জনজীবনে যখন হতাশার সঞ্চার হয়েছে, মানুষ যখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই ভুখা বস্ত্রহীন মানুষকে মিছিলে ডাক দিয়েছেন। মিছিল মানেই অগ্নি-উত্তাপ। জনসমুদ্রের গর্জন থেকেই কবি অর্জন করেছেন মুমূর্ষু স্বপ্নগুলোকে বেগবান করার শক্তি– 'আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন/মিছিলের একটি মুখ' (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)। 'মিছিলের মুখ' কবিতায় কবির রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের অবয়ব নিয়ে, কিন্তু তাতে মার্কসবাদী বিশ্বাস-প্রসূত জনজাগরণের মাধ্যমে মুক্তির শপথই প্রাধান্য লাভ করেছে। কবি যে মুখের সন্ধানে মিছিলে মিছিলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই মুখে শ্রেণী-চেতনার যে সৌরভ উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা-ই কবিকে আকর্ষণ করেছে বেশি। ফলে "মিছিলের মুখ' কবিতায় রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাপিয়ে প্রেম প্রধান হয়ে উঠল' (অশ্রুকুমার শিকদার ১৩৯২ : ২৫৩) – সমালোচকের এই মন্তব্যে কবিতাটির কেন্দ্রগ শক্তির প্রতি সুবিচার হয় নি বলেই আমরা মনে করি। কবি স্বপ্নের ভেতরেও মিছিলের সেই মুখ খুঁজেছেন, 'কে যেন ডেকেছে আমায়। কে ?/ – মিছিলের সেই মুখ!' (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩২); *ফুল ফুটুক* কাব্যগ্রন্থের 'সালেমনের মা' (১/১৩৬–১৩৭) কবিতায় মিছিল লাভ করেছে চমৎকার শিল্পসিদ্ধি। *কাল মধুমাস* (১৯৬৬) গ্রন্থের 'এই মিছিল এই রাস্তা' (২/১২০-১২১) কবিতাটির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। একই গ্রন্থের 'কালো বেড়াল' কবিতায় মিছিল লাভ করেছে ভিন্ন মাত্রা। বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এ এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য– 'গলিতে গলিতে মিছিল/মিছিল নয়– / পাকানো মুঠোগুলো খুলে/লাইন বেঁধে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে/রেশনের থলি' (২/১৩৪)। নিচের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃতিগুলোতেও মিছিল এসেছে কবির জীবনবীক্ষার অনবদ্য শিল্পভাষ্য হিসেবে–

ক. নিজেরে নিখিল মিছিলে মেলাও যদি. (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩২)

খ. চলো না কবি মিছিলে মিশি– (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৫০)

গ. তাই নিয়মিত সভায় মিছিলে যাওয়া আসা। (মুখবন্ধ/*চিরকুট*, ১/৫৩)

ঘ. তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ ! (লাল টুকটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪২)

ঙ. মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে ॥ (এই পথ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৬)

উদ্ধৃতিসমূহে গণদাবির প্রকাশ ঘটেছে সম্মিলিত স্বরের মাধ্যমে। ফলে মিছিলের অজস্র মুখেই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। এভাবেই 'মিছিল' সুভাষের কবিতায় যুক্ত করেছে বহুবর্ণিল ব্যঞ্জনা।

আগুন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আগুন নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়েছে। আগুনের পরশমনি নয়, বরং তার বিধ্বংসী রূপই সুভাষের কবিতায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কখনো সৃষ্টির উল্লাসে তিনি আগুনের উত্তাপ অনুভব করেছেন, আবার কখনো-বা আগুন এসেছে প্রগতিশীল শক্তির সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে। আর মিছিলে মিছিলে আগুনের নিশান হাতে মানুষকে এগিয়ে যেতে দেখে দিন-বদলের স্বপ্নকে আরেকটু ঝালিয়ে নিয়েছেন তিনি। প্রতিবাদ-প্রতিরোধে আগুন সুভাষের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চোখের জল তাঁর কাম্য নয়, তাই তিনি চোখের আগুনে অন্ধকার ভস্মিভূত করতে চান। দুঃসময়ের রূপক হিসেবেও আগুন-প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখি তাঁর কবিতায়। নিচের উদাহরণগুলোতে আগুনের বিভিন্ন অর্থদ্যোতনা আভাসিত হয়েছে –

ক. খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন ॥ (চিরকুট/*চিরকুট*, ১/৬২)

খ. বারুদে লাগালে আগুন যখন
পুড়ে হও ছাই। (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫)

গ. অগ্নিবর্ণ চোখের ভ্রূকুটি
মুহূর্তে হারায় দম্ভ,
দর্প তার হয় কুটি কুটি। (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮)

ঘ. একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

ঙ. কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অন্য–
নিভন্ত আগুনের চিতায়
জন্ম নেয়
মহিমান্বিত জীবন। (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩১)

চ. অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন। (মা, তুমি কাঁদো/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

ছ. পেছনে তাকাই–
গন্‌গনে আগুন। (গাছে গাছে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৯)

জ. আগুনের একটি রমণীয় ফুল্‌কি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে দিক ॥ (পাথরের ফুল/*যত দূরেই যাই*, ২/৭৬)

দিন-বদলের দিন এসে গেছে, তাই নিভন্ত আগুনের চিতায় তিনি মহিমান্বিত জীবনের ডাক শুনতে পান। দুঃখ ভোলানোর জন্য কোন স্নিগ্ধ-মধুর গান নয়, তিনি আলিঙ্গন করেছেন আগুনের ফুলকি। এভাবেই কবি আগুনকে নিজের ইচ্ছের মাপে তৈরি করে নেন। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. ওঠে আগুনের হলকা ক্ষিপ্র ছুটে চলায় ॥ (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)
খ. আগুনের মুখে একটি জবাব সকলে তৈরি রাখবে। (ঊনত্রিশে জুলাই/*চিরকুট*, ১/৭৪)
গ. আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান। (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৯০)
ঘ. পুড়ে পুড়ে ছাই হবে আত্মক্ষয়ী আগুন (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩১)
ঙ. পেটের আগুনে মুখ দেখো না রাত্রির। (সালেমনের মা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৭)
চ. আগুনের চুম্বন, না হাওয়ার ফুৎকার ? (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫১)

যে আগুনে পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়েছেন কবি, তাই দিয়েই মানুষকে ঋদ্ধ আগামীর পথে আহ্বান করেছেন। তাই তিনি বলেন– 'ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির, /অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই /পাল্লা ভারী হচ্ছে' (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৭)। এভাবেই আগুন বিভিন্ন অর্থের অনুষঙ্গে প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে।

সিগারেট

সিগারেট'সুভাষের ব্যবহারনৈপুণ্যে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। সিগারেট যে আগুনকে মুখে নিয়ে হাতে হাতে ঘুরে বেড়ায়, তার শক্তি উপেক্ষা করার মতো নয়। কবি যখন দেখেন 'আগুন মুখে ক'রে /একটা দড়ি/ বেড়ার গায়ে ঝুলছিল' (আমার ছায়াটা/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৫), তখন সেই আগুনের দিকে এগিয়ে যান কবি এবং –

সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
দেয়ালের গায়ে
চোখ পড়ল
ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে
আমাকে অবিকল নকল করছে
আমার ছায়া
মাথায় আমারই মতো পাখির বাসা
চোখে চশমা
ঠোঁটে সিগারেট ধরা (আমার ছায়াটা/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৫)

বুকের ভেতর আগুন নিয়ে সিগারেটের এই নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তখনই ভিন্নতর তাৎপর্য লাভ করে, যখন তিনি দেয়ালের ছায়ার দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেন– 'ধোঁয়ার জায়গাগুলো নিখুঁতভাবে ফোটালেও/আমি লক্ষ্য করলাম/আগুনের জায়গাটা/ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেল' এবং এই ঘটনায় কবি তখন নিজের ছায়াকে শাসিয়ে বলেন– 'শয়তান/এবার আমি আগুনের মধ্যে যাব' (আমার ছায়াটা/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৫)।

Dhaka University Institutional Repository

কলম

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কলম আশ্চর্য প্রতীকী অর্থমাত্রা লাভ করেছে। মানুষের জীবনে কলমের গুরুত্ব অপরিসীম। সৃজনশীল মানুষের কাছে কলম নানা ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কলমের স্বাধীনতা মত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে রূপায়িত করে। স্বৈরশাসকেরা তাই কলমকে অস্ত্রের চেয়ে বেশি ভয় পায়। কলমের কণ্ঠ রোধ করার যে-কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে কবির কলম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। *কাল মধুমাস* গ্রন্থের 'আশ্চর্য কলম' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যা তাঁর ভাষায়– 'খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম : খাই-খাই' (২/১৩৭)। যে-কোন অক্ষম, অপদার্থের লেখক হয়ে যাওয়া ও 'দিনকে রাত, সোজাকে কাত,/হতাশকে হাত করতে' এ কলম অনায়াসে 'সফলতা' এনে দিতে পারে। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতেও কলম নানা ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ প্রতীকে পরিণত হয়েছে –

ক. আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি–
এই ভাই আমার ছুটি–
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও ॥ (আমার কাজ/*কাল মধুমাস*, ২/১৪১)

খ. যারা এই কথা ভাবল–
ছিল না তাদের
শুধু হাত, শুধু কলম। (নাটক/*এই ভাই*, ২০২)

গ. মাইনে-করা কলমগুলো
সমানে কালি ছিটিয়ে
দিনকে রাত করে,
ছোটদের হাত করে,
বড়দের কাত করে ॥ (কমলেকামিনী/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২৫)

উদ্ধৃতি ক-এ কলম সৃজনশীলতার প্রতীক। উৎপাদনের যন্ত্র ট্র্যাক্টরের পাশে কলমকে স্থাপন করায় তা অর্জন করে নিয়েছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। উদ্ধৃতি খ এবং উদ্ধৃতি গ-এর কলম পরাধীনতাকে চিহ্নিত করেছে। সুভাষ মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। শাণিত ব্যঙ্গে মাইনে-করা কলমের রূপকে অন্যের কাছে মাথা বিক্রি করাকে অপরাধ মনে করেছেন তিনি। কবির প্রয়োগসাফল্যে এভাবেই কলম লাভ করে ভিন্ন মাত্রা।

লাঙল

কলম যেমন সৃজনশীলতার প্রতীক, তেমনি লাঙলও উৎপাদনশীলতার প্রতীক। লাঙল সচল হলেই সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত হবে, লাঙলের ডাকেই নবান্ন-উৎসব অর্থময় হয়ে উঠবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় মরচে-পড়া লাঙলের ফালকে শাণিত করে, দুর্বল হাতকে শক্তিশালী করে ফসলের হাসিতে মাঠ ভরে তোলার কথা বলেছেন। আবার পথের বাধাকে আগাছার সঙ্গে তুলনা করে লাঙলের ফালে তা উপড়ে ফেলার দিন এসে গেছে বলে আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ করা যাক –

Dhaka University Institutional Repository

ক. লাঙলে কাটে না মাটি, দুর্বল দুহাতে শূন্য মুঠি। (আহ্বান/*চিরকুট*, ১/৫৬)

খ. জীবন ছড়ায় মাঠে মাঠে বীজমন্ত্র
অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে। (স্বাক্ষর/*চিরকুট*, ১/৬৬)

গ. দিন এসে গেছে
লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে
ফেলবার। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৬)

লাঙলের এই প্রতীকী তাৎপর্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষ কেবল অন্যের রক্ত শোষণ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে। লাঙল-প্রতীক তাই শ্রেণিচেতনারও স্মারক হয়ে উঠেছে।

রক্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রক্ত লাভ করেছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। জীবনের প্রতীক হিসেবে রক্ত তাঁর কবিতাকে প্রাণবন্ত করেছে, উদ্দীপনার প্রতীক হিসেবে তা কাব্যদেহে সঞ্চারিত করেছে বলিষ্ঠতা। রক্ত তাঁর কবিতাকে শাণিত করেছে, সংঘবদ্ধ শক্তিতে উদ্বোধিত করেছে। শোষণের পরিচয় দিতে তিনি যেমন বলেন– 'আমাদেরই লাল রক্তে রঙিন সকাল' (বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৫-১৩৬), তেমনি কঠোর কঠিন সাধনার প্রসঙ্গেও তিনি রক্তের কথা বলেন– 'হাটু ছিঁড়ে যাক, দুপায়ে রক্তকদম ফোটাও!' (দীক্ষিতের গান/*চিরকুট*, ১/৭২)। ঘুমিয়ে থাকার সময় নেই। তাই 'নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন;' (আহ্বান/*চিরকুট*, ১/৫৬)। নানা প্রসঙ্গে সুভাষ মানুষের রক্তের নদীতে ঢেউ তুলেছেন, যা সেই সময়ের উত্তাল দিনগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। নিচের দৃষ্টান্তগুলোতে সুভাষের রক্ত-বিষয়ক ভাবনার বর্ণিল প্রকাশ ঘটেছে –

ক. যাদের রক্তে উড়ছে আকাশে
মিলের ধোঁয়া, (এখানে/*পদাতিক*, ১/৪০)

খ. আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র আগুন
আমাদের রক্তে এসে লাগে। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬০)

গ. ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্তপদচিহ্ন তার
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায় ॥ (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)

ঘ. রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়
অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/ ৮৭)

ঙ. রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন। (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

চ. দিন এসে গেছে, ভাই রে–
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

ছ. একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত, (উজ্জীবন/*চিরকুট*, ১/৭৭)

জ. পুঞ্জিত ক্রোধে রক্তে হিংস্র জ্বলে অনল। (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)

ঝ. এখুনি
রক্তে রক্তে শোনা যাবে
জলদগম্ভীর মহাকালের হাঁক
'কে জাগে ?' (কে জাগে/*যত দূরেই যাই*, ২/৮০)

ঞ. মানুষ মানুষকে আর
মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে,
কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না। (ফলশ্রুতি/*যত দূরেই যাই*, ২/১০২)

ট. ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে,
আমরা বুকের রক্ত দিয়ে
কিনে নিয়েছি। (আমাদের হাতে/*এই ভাই*, ২/১৯৮)

উদ্ধৃতিগুলোতে কবির স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমত্বের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি দেখেছেন– 'দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ, /রক্তচক্ষু রাজার শাসন' (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৭) আর শপথ নিয়েছেন– 'এক পাও পিছু হটব না কেউ, করুক রক্তারক্তি' (ঊনত্রিশে জুলাই/*চিরকুট*, ১/৭৪)। আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষ 'পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত' (এখন ভাবনা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৫) দিয়ে দেশমাতৃকার ঋণ শোধ করেন আর 'রক্তে রক্তে ভিজে ওঠে লাল নিশান' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭)। এভাবেই রক্ত কবির চেতনার রঙে নানা মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে কবিতায় যোগ করে অভিনব ব্যঞ্জনা।

কঙ্কাল

রাজনৈতিক শোষণ এবং দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার প্রতীক হিসেবে কঙ্কাল ব্যবহৃত হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। মালিক, মহাজন, মজুতদার, বণিক ও জমিদার-শ্রেণী কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারার রক্ত শোষণ করে ক্রমে তাদের কঙ্কালে পরিণত করে। অনাহারে মৃত মানুষের সৎকারের ব্যবস্থা নেই বলে পথের দুধারে, খালে-বিলে কঙ্কাল জমে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় –

ক. তামাসা তো শেষ; পারের কড়িও গোনা–
কঙ্কালখানা কালের স্কন্ধে টানো। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৩)

খ. পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল; (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৩)

গ. সূর্য বসে পাটে।
কঙ্কালবিক্ষিপ্ত খালে, (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭০)

ঘ. পথে পথে কঙ্কাল স্তূপীকৃত করে,
বন্দুকের নলে জনসমুদ্রে আগুন ছড়ায়, (উজ্জীবন/*চিরকুট*, ১/৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

শ্মশান

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ এদেশের শ্রমজীবী মানুষকে 'উপহার' দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় দুর্ভিক্ষের পরিণাম শ্মশান-প্রতীকে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কবির দিনযাপনের গ্লানি শ্মশানের উল্লেখে নতুন মাত্রা লাভ করে যখন তিনি বলেন– 'তাই দৈনিক নিজের কিংবা/পরের দায়েই শ্মশান চষি' (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৪)। *চিরকুট*-এর কবিতাগুলোতে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা চিত্রিত করেছেন কবি। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বেশ কিছু ভালো ছোটগল্প বাংলায় লেখা হয়েছিল, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে ভালো কবিতা বেশি পাই না। 'চিরকুটে' পাই। এক বিষাদগাঢ় সকরুণ মমতা এই কবিতাগুলোয় বর্তমান' (অশ্রুকুমার শিকদার ১৩৯২ : ২৫০)। এই 'বিষাদগাঢ় মমতা' শ্মশান-প্রতীকে রূপলাভ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পার –

ক. শত্রুপক্ষ হার মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ– (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৬)

খ. রাস্তার শ্মশান থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে;
মাঠের ফসল দিন গোনে। (স্বাগত/*চিরকুট*, ১/৭০)

গ. সূর্য বসে পাটে।
কঙ্কালবিক্ষিপ্ত খালে,
দ্বারস্থ কবরে, ঘর-জ্বালানো শ্মশানে, (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭০)

ঘ. স্খলিত পায়ের ছন্দে
স্পন্দিত শ্মশান। (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮)

'মৃতচিহ্নিত শ্মশানে' নতুন শিশুর জন্ম হওয়া মনে করিয়ে দেয়, তাঁর শ্মশান কেবল শোষণের পরিণাম বা গন্তব্য হিসেবেই শেষ হয়ে যায় নি, তা জীবনকে নতুনভাবে নির্মাণ করার ইচ্ছেকেও মূর্তি দেয়। তাই তিনি আহ্বান করেন– 'কাঁধের গামছা কোমরে বেঁধে/শ্মশান থেকে উঠে এসো/ভালোবাসায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে/জীবনটাকে ধরো' (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫৩)। এভাবেই শ্মশান প্রতীকী অর্থমাত্রা লাভ করে।

অগ্নিকোণ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অগ্নিকোণ গভীরতর তাৎপর্যের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক অগ্নিকোণের, অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণের দিক্‌পাল অগ্নি এখানে ঔপনিবেশিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কবি লক্ষ করেন– 'মৃত্যুর ঝড় ঠেলে/অন্ধকারের গলা টিপে ধ'রে/রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়/অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭)। এই এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কবির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অগ্নিকোণ প্রতীকের আরো কয়েকটি উদাহরণ –

ক. অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)

খ. দুধের শিশুকে বুকেতে আঁকড়ে ধ'রে
মরে শত শত শহর-গাঁয়ের
অগ্নিকোণের মানুষ। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

গ. ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ
চোখ পিট্‌পিট্ করে
অগ্নিকোণে দুহাতে কে
মশাল তুলে ধরে। (ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)

উদ্ধৃতিসমূহে অগ্নিকোণ-এর মানুষকে মৃত্যুর সঙ্গে যেমন লড়াই করতে দেখি, তেমনি প্রতিরোধ-প্রতিবাদের মশাল হাতেও তারা এগিয়ে যায় অত্যাচারীর কণ্ঠ রোধ করার জন্য। এভাবেই 'অগ্নিকোণ' হয়ে ওঠে উজ্জ্বল প্রতীক।

লেনিন

পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০–১৯২৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লেনিন ১৯১৭ সালে মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন, তা সারা পৃথিবীর প্রগতিপন্থীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। লেনিন-প্রসঙ্গে সুভাষ মূলত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রামী নেতৃত্বের কথাই স্মরণ করেছেন এবং লেনিনের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মার্কসের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশের মাধ্যমে উচ্চতর সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলেছেন।[৪] সেই সঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যাঁরা সাম্যবাদী সমাজপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদার রেখে প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। সুভাষের চোখে লেনিন মৃত্যুঞ্জয়ী মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছেন। নিচের উদাহরণগুলি লক্ষ করি –

ক. শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন-দিবস; লালপাগড়ি মোতায়েন; (দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

খ. লেনিন, এঙ্গেলস, মার্ক্স নখাগ্রে আমার
উত্তরাধিকারসূত্রে অন্যতম নেতা। (আলাপ/*পদাতিক*, ১/৪০)

গ. আমার কাছে ছেলেবেলার
সেই গল্পই চিরসত্য
পৃথিবী আর কমলালেবু
এক আকারে
লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব ॥ (একাকার/*এই ভাই*, ২/১৯২)

ঘ. লেনিনকে আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি ধর্মতলায়
ট্রামের গুমতির একপাশে।
আঁস্তাকুড়ের ভাত একদল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে
ডাস্টবিনে হাত চালিয়ে দিয়ে।
লেনিন দেখছেন। (একটু পা চালিয়ে, ভাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫৪)

উদ্ধৃতি ক লেনিন দিবসের প্রস্তুতি বিষয়ে ইঙ্গিত করলেও উদ্ধৃতি খ-এ শাণিত ব্যঙ্গে কমিউনিস্ট কর্মীদের অন্তঃসারশূন্যতা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন-প্রসঙ্গে প্রকট করে তুলেছেন কবি। উদ্ধৃতি গ-এ লেনিন-বিষয়ক একটি প্রচলিত কাহিনীর আলোকে লেনিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। কবির স্মৃতিতে 'পৃথিবী আর

Dhaka University Institutional Repository

কমলা লেবুর/এক আকারে/জড়িয়ে গেল লেনিনের নাম' (একাকার/*এই ভাই*, ২/১৯২)। উদ্ধৃতি ঘ-এ লেনিনকে ধর্মতলায় দাঁড় করিয়ে রেখে কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের অসঙ্গতিগুলোকে চিত্রিত করেছেন কবি। গ্রাম থেকে আসা একজন রোগীর পকেটমারের হাতে সর্বস্বান্ত হওয়া, সন্ধ্যায় একটি মেয়েকে ট্যাক্সি করে তুলে নিয়ে যাওয়া– এইসব দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী যেন লেনিন। কবির মনে হল– 'লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন/শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে–/একটু পা চালিয়ে ভাই, একটু পা চালিয়ে' (একটু পা চালিয়ে, ভাই/ *একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫৪)। এভাবেই 'লেনিন' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় নানা ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

স্তালিন

জোসেফ স্তালিন (১৮৭৯–১৯৫৩) লেনিনের উত্তরসূরি হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গতিসঞ্চার করেন। রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীকে নতুন পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে স্তালিনের অবদান সুভাষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর বিবেচনায় স্তালিন 'মৃত্যুহীন জীবনের' প্রতীক –

স্তালিন জীবন হোক। আজ থেকে
মৃত্যুহীন জীবনের
নাম হোক
কমরেড স্তালিন ॥ (কমরেড স্তালিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫২)

একইভাবে ক্রুশ্চেভ এবং হো চি মিন প্রমুখ বিপ্লবীর নাম সুভাষের কবিতায় নতুন পৃথিবী ও আলোকিত আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুভাষের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করছি –

ক. পৃথিবীকে নতুন ক'রে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে, শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায় ॥ (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৮)

খ. হো চি মিন
রেখে গেলে পথ
কঠিন ফলকে
এঁকে দিয়ে পদচিহ্ন।
হো চি মিন ! হো চি মিন, হো ! (গাও হো/*এই ভাই*, ২/১৭৩)

উদ্ধৃতি ক-এ ক্রুশ্চেভ ধনতন্ত্রকে নির্বাসিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। উদ্ধৃতি খ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে হো চি মিন-এর গৌরবোজ্জ্বল নেতৃত্বের প্রশংসা করে তাঁকে স্বাধীনতার প্রতীকী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুভাষ।

চীন

ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে জাপানের আগ্রাসী তৎপরতাকে ভূলুণ্ঠিত করে চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট জাপানের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের ঐতিহাসিক প্রতিরোধের পটভূমিকায় লেখা 'চীন : ১৯৪১' কবিতাটিতে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতি সুভাষের সমর্থন ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কখনো কখনো চীন-প্রসঙ্গে কবি সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের উদাসীন আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনকেও ব্যঙ্গবাণে আহত করেছেন। তিনি যখন বলেন– 'মাথা ঘামাবো না চেক-চীনা সংকটেও/তবেই দেখবে ঈর্ষা বাড়বে পাড়াতে' (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৯), কিংবা 'এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না; /–ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর' (আলাপ/*পদাতিক*, ১/৪১), তখন চীন কেবল একটি রাষ্ট্রই থাকে না, একটি চেতনার প্রতীক হিসেবে কবিতাকে ভিন্নমাত্রা দান করে। আবার কবি দেখেন– 'চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর' (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৭), আর ঘোষণা করেন– 'হে চীন তোমার পাশে আমি' (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৮)। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতেও চীন-প্রসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে কবির সমাজতান্ত্রিক চিন্তার নানা প্রান্ত –

ক. দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই ॥ (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৬)

খ. বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ – (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৬)

গ. সাবাস সিয়ান!
চিয়াঙের চোখে আজ অখণ্ড চীনের মৃত্যুপণ। (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৬)

ঘ. সিঙ্গাপুর রেঙ্গুনের পথে পথে রক্ত দেয় চীন – (চীন : ১৯৪১/চিরকুট, ১/৫৮)

জালিয়ানওয়ালাবাগ

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সরকার সাধারণ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনায় প্রগতিপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে নানা প্রান্তে। জালিয়ানওয়ালাবাগ নামটি সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিবেচনায় এটি প্রগতিপন্থীদের তীর্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটি গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের মতোই নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষকে মিছিলে সমবেত করেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় –

দুর্বল স্মৃতি; বীর রসে তাই কাঁপে ব্যারাক,
প্রেত পল্টন, জালিয়ানবাগ প্রয়াগ আজ,
স্বরাজে সেলামী মিলবে; প্রভুরা পেটায় ঢাক। (মুখবন্ধ/*চিরকুট*, ১/৫৩)

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ তাঁর রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার পরিচয় বহন করে। শ্রেণিচেতনার স্মারক হিসেবে এই স্থানসমূহের উল্লেখ তাই কবিতায় যোগ করে নতুন মাত্রা।

আফ্রিকা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আফ্রিকা চমৎকার প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের দমন-পীড়নের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে শক্তি সঞ্চয় করে কালো মানুষেরা শৃঙ্খল ভাঙার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে। আর এই সংগ্রামের মধ্যে কবি দেখেছেন পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের মুক্তির ইশারা। কালো কুৎসিত বউ তাই তার ভবিষ্যৎ বংশধরের নাম রাখতে চায় আফ্রিকা। এভাবেই 'আফ্রিকা' শব্দের অর্থকে ছাপিয়ে কবি আমাদের নিয়ে যান অন্য এক ভুবনে। আবার আফ্রিকার কোলেই কবি মহামূল্যবান স্বাধীনতাকে আন্দোলিত হতে দেখেন। নিচের উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করি –

Dhaka University Institutional Repository

ক. 'কী নাম দেবো, জানো ?
আফ্রিকা
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে ॥' (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০০)

খ. দেখো, আফ্রিকার কোলে
সাত রাজার ধন এক মানিক
স্বাধীনতা। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৭)

সুভাষের প্রয়োগকৌশল শব্দকে এমন রূপকল্পে প্রতিষ্ঠিত করে যে, শব্দ তার পরিচিত অর্থবৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। আফ্রিকার কালো মানুষ এভাবেই কবি কল্পনায় স্বাধীনতার স্মারক হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অন্ধকার নানা প্রতীকী অর্থমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। কবির সমাজমনস্কতা তাঁর যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ থেকে অন্ধকারের বিভিন্ন তাৎপর্য উদ্ধার করেছে। অন্ধকারে অন্ধকার ঘষে আলো জ্বালানোর তপস্যাই তাঁকে প্রণোদিত করেছে দিন বদলের স্বপ্নকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। তিনি অনুভব করেছেন, চেতনাকে শাণিত করতে না পারলে 'চোখে অন্ধকার ঠেকে আপন দেশের গুপ্তধন।' (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯)। তাই তাঁর প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর সমবেত শক্তির মিছিলে একাত্ম হয়ে যায় এবং 'লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়ে/অন্ধকার যবনিকা দুহাতে সরায়' (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)। অধিকারসচেতন মানুষ যখন রক্তের মূল্যে সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা কিনে নিতে চায়, তখনই অন্ধকারের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, 'নির্মেঘ আকাশে এক রক্তাক্ত সমরে/অন্ধকার ধুঁকে ধুঁকে মরে' (স্বাক্ষর/*চিরকুট*, ১/৬৫)। সুভাষের কবিতায় অন্ধকার কেবল হতাশা ও প্রতিবন্ধকতার সঙ্কেত হিসেবেই নয়, কখনো কখনো তা ব্যবহৃত হয়েছে আলোর জন্য অপেক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবেও। বাধার প্রতীক হিসেবে অন্ধকার-এর কয়েকটি উদাহরণ দেই –

ক. পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাঙে
সম্মুখে টলায়মান দেয়ালে দেয়ালে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত এসে লাগে। (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)

খ. আমি আসছি–
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি। (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)

গ. অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে
শকুনের চোখ গেলে দিই
চলো
সুখে শান্তিতে বাঁচি। (বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৬)

ঘ. ততক্ষণ শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক (আমরা যাব/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৭)

ঙ. এক চোয়ারে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

সুভাষের কবিতায় অন্ধকার কখনো দুঃসময়ের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখি। কিন্তু এই ক্রান্তিকাল

Dhaka University Institutional Repository

অতিক্রমণের সংকল্পই অন্ধকারকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। অন্ধকার পার হয়ে এমন এক সময়ে কবি পৌঁছাতে চান যেখানে বিভেদের দেয়াল নেই, সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়ার মহৎ আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৭)

খ. তাহলে এসো,
অন্ধকার উদ্ভিন্ন করি; (গাছে গাছে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪০)

গ. জোয়ানমদ্দ অন্ধকার
তার কাঁধটা সরালেই দেখতে পাবো
সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান–
এক জায়গায় ব'সে
আমরা হাপুস-হুপুস ক'রে খাচ্ছি। (সন্ধ্যামণি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬০)

কবি অন্ধকারকে আলোর জন্মদাতা হিসেবেও চিত্রিত করেছেন। অন্ধকারের চোখে আলোর হাতছানি কবিকে আশান্বিত করেছে– আঁধারের প্রসব-বেদনা টের পেয়েছেন তিনি। সুভাষের কবিতায় অন্ধকারের এই সৃজনীশক্তি চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে –

ক. আলো রাখতেন লুকিয়ে
অন্ধকারের গর্তে। (ছিটমহল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৭)

খ. অন্ধকারের চোখ জ্বলে
চোখে আগুন। (মা, তুমি কাঁদো/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪

গ. ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায় ॥ (এদিকে/*কাল মধুমাস*, ২/১৩১)

অন্ধকারের বহুবর্ণিল উপস্থাপনায় সুভাষের প্রাগ্রসর চিন্তার প্রকাশ যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাঁর জীবনদৃষ্টির দূরসঞ্চারী বৈশিষ্ট্যও তাতে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। কবির চেতনার স্পর্শে অন্ধকার এভাবেই বিচিত্র অর্থমাত্রায় দ্যোতনা লাভ করেছে।

চাঁদ

যুগ যুগ ধরে কবিতায় চাঁদ রোমান্টিক ভাবাবেগের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সুভাষের শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য চাঁদের এই পরিচিত অবয়বকে অবজ্ঞা করে তাতে দান করেছে ভিন্নমাত্রা। 'আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি?' (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১) বলে কবি যখন প্রশ্ন করেন, তখন বোঝা যায় চাঁদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে আগ্রহী নন তিনি। তিনি জানেন, 'রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি/চাঁদের পাড়ায় মেঘের দূরভিসন্ধি' (রোমান্টিক/*পদাতিক*, ১/২৫) এবং 'বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী' (নির্বাচনিক/*পদাতিক*, ১/৩০)। কবি চাঁদকে কল্পনাপ্রবণ মানুষের গন্তব্যহীন আবেগের প্রতীকী বস্তুতে পরিণত করতে চেয়েছেন। তাই চাঁদের প্রতি সুদৃষ্টি দেন নি প্রগতিপন্থী সুভাষ মুখোপাধ্যায় –

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রতিবেশী চাঁদ নয় তো অনাত্মীয়
রামধন-রং দেশেও জমাবো পাড়ি, (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩২)

খ. চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৩)

গ. ফাল্গুনী কবিরা
অর্ধেক চাঁদের মতো কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

ঘ. চাঁদকে আমরা বেঁধেছি চাঁদির সা-রে-গা-মায়
অবৈতনিক প্রণয় রাখি নি ত্রিসীমানায়। (শ্রেষ্ঠীবিলাপ/*পদাতিক*, ১/৩৬)

উদ্ধৃতিসমূহে চাঁদের সৌন্দর্য ও সম্মোহনে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকার বিপক্ষে কবি অবস্থান নিয়েছেন। ফলে চাঁদ-সম্পর্কিত প্রচলিত প্রতীকী চেহারা পাল্টে কবি নতুন প্রতীক নির্মাণ করেছেন, যা কর্মমুখী মানুষ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য বলে মনে হয়।

ঝড়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ঝড় নানা ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে প্রতীক হয়ে উঠেছে। তিনি দেখেছেন, 'মৃত্যুর ঝড় *ঠেলে*/অন্ধকারের গলা টিপে ধ'রে/রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়/অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭), যারা মৃত্যুকে দুপায়ে মুচড়ে দিয়ে 'কামানের মুখে মৃত্যুর ঝড় তোলে' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৬)। ফলে ঝড় কেবল ধ্বংসের বার্তা বয়ে আনে নি, কেবল বাধার দেয়াল হিসেবেই চিত্রিত হয় নি, সুভাষ একে সুন্দরের শুভ-সূচনা হিসেবেও দেখেছেন। ঝড় দেখে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সুভাষ মানুষকে সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াতে দেখেন, কখনো বা ঝড় মাথায় নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার ছবি আঁকেন কবি –

ক. যদিও সম্মুখে ঝড়
ভয়ে কণ্টকিত বিপর্যয়, (স্বাক্ষর/*চিরকুট*, ১/৬৬)

খ. ঝড় আসুন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ, (স্ফুলিঙ্গ/*চিরকুট*, ১/৬৭)

গ. ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ
চোখ পিট্‌পিট্ করে (ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)

ঘ. ঝড় আসছে, উঠে দাঁড়ায়
যে যেখানে আছে। (ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)

ঙ. ঝড় মাথায় নিয়ে আমরা আসছি। (আগুনের ফুল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪১)

ঝড় কখনো কালবৈশাখীর হিংস্রতা নিয়েও উপস্থিত হয়েছে। মেহনতি মানুষের মিলিত শক্তিকে কবি কালবৈশাখীর রূপকে চিত্রিত করেছেন, 'কালবৈশাখী নামবে যে কবে/আমাদের হাত-মিলানো গানে' (কানামাছির গান/*পদাতিক*, ১/২৪)। সুভাষের কবিতায় ঝড় যেমন বাধার প্রতীক, তেমনি তা নতুন জীবনচেতনারও ইঙ্গিত, জীর্ণতাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়ারও প্রেরণা।

Dhaka University Institutional Repository

বজ্র

বজ্র শব্দটিও বিভিন্ন অর্থের অনুষঙ্গে প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। বজ্রের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদের সঙ্কেত হিসেবে। তাই তাঁর চরিত্রগুলোর বলিষ্ঠতায় মুগ্ধ হতে হয় যাদের 'বজ্রের দাপট কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ' (চীন : ১৯৪১/*চিরকুট*, ১/৫৭) এবং তিনি যখন মিছিলের কথা বলেন, তখনও লক্ষ করেন, 'ছাত্র-যুবক-চাষী-মজুরের/গলায় গর্জে উঠল/বজ্রের সেই আওয়াজ' (ফের আসব/ *চিরকুট*, ১/৭৩), যা মূলত সংঘশক্তিরই দ্যোতক হয়ে ওঠে। কবির অনুভব ও প্রত্যাশা বজ্রের মোড়কে চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে – 'বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ/পৌঁছোয় ডাক–/যেখানে যে আছে ময়দানে/সব এক হয়ে যাক' (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫)। কবি বজ্রের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন, 'বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ' (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১), শ্রমিক-জনতার চীৎকারে লাগিয়ে দিতে পারেন 'বজ্রের কানে তালা' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫), কিংবা সুন্দর দিন আনতে শ্রমজীবী মানুষের মনোবলের প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন, 'এখনও বজ্র আকাশকে ছেঁড়ে খোঁড়ে?' (লাল টুকটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৩)। নিচের উদাহরণগুলোতেও আমরা লক্ষ করব, সুভাষ বজ্রকে কীভাবে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের সম্ভাবনার প্রতীকে পরিণত করেছেন –

ক. শত্রুর শিবিরে হানি তোমার হাতের বজ্র। (সীমান্তের চিঠি/ *চিরকুট*, ১/৬১)

খ. হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও–
শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন ॥ (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৫)

গ চাপা বিদ্যুতে খেলে দুশমন বজ্রমুষল: (দীক্ষিতের গান/*চিরকুট*, ১/৭২)

ঘ. বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাতো,
সেই দিন ভেবে আমাদের অনুশোচনা। (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৯)

ঙ. কোটি কণ্ঠের হঙ্কারে লাগে
কিসের যেন ষড়যন্ত্র
বজ্রের ফিস্‌ফাসে (ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)

চ. হাড়-বার-করা পাঁজরগুলো
এখন
বজ্র তৈরির কারখানা। (আগুনের ফুল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪১)

উদ্ধৃতিগুলো আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, সুভাষের শব্দকুশলতাই তাঁর অন্তরের শক্তিকে অন্যের বুকে সঞ্চারিত করে দেয়। 'বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ' (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩) বলে কবি যার কথা বলেন, সেই অনুপ্রেরণার উৎস তো মিছিলই, যেখানে পোড়-খাওয়া মানুষকে উজ্জীবিত করার অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ করে বজ্র। তিনি শপথ করেন, 'বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে' (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৯), তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা 'বজ্রের সুরে বেঁধে নেয় গলা' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)। বজ্রের এই প্রতীকী অর্থমাত্রা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রগতি-চিন্তাকে বলিষ্ঠতা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ

আকাশ কখনো সাফল্যের শীর্ষ বিন্দুকে নির্দেশ করেছে, আবার কখনো কল্পনার অবাধ বিস্তারকেও প্রতীকায়িত করেছে। খোলা হাওয়া বা বন্ধনহীন জীবনেরও স্মারক হয়ে উঠেছে আকাশ। আকাশকুসুম কল্পনার আকাশও সুভাষের কবিতায় অনুপস্থিত নয়– 'এক কবি।/ছিল আকাশটা তাঁর টুপি/সমুদ্রে তিনি শুতেন' (ছিটমহল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৭)। আবার কবির মানসভূগোল হিসেবেও আকাশ-প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে – 'আকাশে তাকালাম/তোমার মুখ (আমি আসছি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)। স্বপ্নকে স্পর্শের সীমায় নিয়ে আসার প্রতীক হিসেবে আকাশ-এর ব্যবহার লক্ষ করি – 'কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শিখরে উঠে/আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম/আকাশ।' (জয়মণি, স্থির হও/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩২)। যারা শ্রমিকের বুকে পা দিয়ে আকাশে উঠে যায়, তাদেরও কবি ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন, 'করেছি তৈরি/স্বর্গের সিঁড়ি/উঠবি আকাশে পা ছুঁড়ে' (রাস্তার গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৩)। আবার একটি আকাশের নিচে তিনি সবাইকে সমবেত করতে চান যেখানে সবার জন্য সম-অধিকার নিশ্চিত হবে। আরো কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায় –

ক. পাগল বাবরারির চোখের মতো আকাশ। (সোলেমনের মা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৬)

খ. এখনও বজ্র আকাশকে ছেঁড়ে খোঁড়ে ? (লাল টুকটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৩)

গ. কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে দিয়ে
তুমি যখন হাসলে (সুন্দর/*ফুল ফুটুক*, ১৪৩)

ঘ. এখনও আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়। (শুধু ভাঙা নয়/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৩)

ঙ. যেখানে তার চোখের
উজ্জ্বল নীল মণির মতো আকাশ। (পোড়া শহর/*যত দূরেই যাই*, ২/৭২)

এভাবেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ' তাঁর চেতনার রঙে রঙিন হয়ে বিভিন্ন অর্থদ্যোতনা লাভ করেছে।

অশ্ব

জীবনকে গতিশীল এবং প্রাণবন্ত করার প্রতীকী তাৎপর্য ধারণ করেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অশ্ব'। সৈনিকের বাহন হিসেবে তা কবির রাজনৈতিক আদর্শকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ঘোড়ার ডাক যখন হিংস্র গর্জনে পরিণত হয়, তখন তা যোদ্ধাকে লক্ষের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এইভাবে অশ্ব-প্রসঙ্গ কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনা আনে। নিচের উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করি –

ক. কমরেড, আশু অশ্বের ক্ষুরে আনো লাল দিন
দম্পতি রাত ততদিন হোক উৎসবহীন। (চীন : ১৯৩৮/*পদাতিক*, ১/৩৮)

খ. কর্কশ হ্রেষায় ওঠে একদিকে হিংস্র গর্জন (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯)

উদ্ধৃতি ক-এ 'অশ্ব' বিশ্বের আগামী দিনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা যুদ্ধের গতিকে তীব্রতা দিয়েছে। উদ্ধৃতি খ-এ কবির প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞায় শক্তি সঞ্চার করেছে 'কর্কশ হ্রেষা'।

Dhaka University Institutional Repository

শৃগাল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শৃগাল তার প্রচলিত প্রতীকী তাৎপর্যেই ব্যবহৃত হয়েছে, কোন নতুন অর্থমাত্রা সঞ্চার করে নি। শৃগাল ধূর্ততার প্রতীক। তিনি আদর্শহীন মধ্যবিত্তের পলায়নপরতাকে শাণিত ব্যঙ্গে জর্জরিত করতে শৃগাল-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস রাজনীতির সমালোচনা করে এই মতের সমর্থকদের তিনি শৃগাল বলেছেন। উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ করি –

ক. সম্মতি নেই মজুর ধর্মঘটেও,
ভাঙচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি ভাড়াটে; (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৯)

খ. অহিংসা পরমো ধর্ম নীলবর্ণ শৃগালের দলে। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

গ. ভোজের পাত
পেতে রেখেছে
ধুরন্ধর শেয়াল। (ভুলে যাব না/*কাল মধুমাস*, ২/১৩৩)

শৃগাল-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কতিপয় মানুষের মধ্যে আরোপ করে তিনি মূলত তাঁর সময়ের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রকৃত চেহারা চিত্রিত করেছেন।

হরিণ

হরিণ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। হরিণের সৌন্দর্য যেমন নন্দিত হয়ে এসেছে, তেমনি হরিণের মাংসের প্রতিও মানুষের লোভ এর জীবনকে শঙ্কিত করে তোলে, যার দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদেও – 'আপনা মাসে হরিণা বৈরি'। সুভাষের কবিতায় হরিণ নানা অর্থমাত্রায় অভিষিক্ত হয়েছে। কখনো এর মাংস প্রসঙ্গে মানুষের লোভ, কখনো সোনার হরিণ অধরা স্বপ্ন, আবার কখনো-বা তা ধামবান সময়ের বিরামহীন গতির স্মারক হয়ে উঠেছে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. সাদা ডিশটায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হল কার নয়নে, (বিরোধ/*পদাতিক*, ১/২৬)

খ. উদাসী হৃদয় সুলভেই পাবে হরিণা
রূপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রূপকে। (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৬)

গ. হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পার ? (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৩)

ঘ. একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়-হরিণী (কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৮)

ঙ. কারো হরিণের মতো চাহনি নেশা ধরায় (মিছিলের মুখ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

চ. পর্দাটা সরাতেই
ভয়চকিত হরিণীর মতো
আমাকে জড়িয়ে ধরল
হাওয়া ॥ (দিনান্তে/*যত দূরেই যাই*, ২/৭১)

হরিণ চমৎকার অর্থদীপ্তি পেয়েছে *যত দূরেই যাই* গ্রন্থের 'ফলশ্রুতি' কবিতায়। 'ফলের দোকানের সামনে/এক সময়ে একটা বাঁধা হরিণ' (২/১০১) কবির চোখে বন্দিত্বের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। এই বন্দিত্ব হরিণকে অনশনে মৃত্যুবরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বন্দি হরিণের অনুষঙ্গে পরাধীন মানুষের চেতনা জাগ্রত করার এই প্রতীকী শিল্পকৌশল কবিতাটিতে চমৎকার শিল্পঋদ্ধি দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বসন্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার রোমান্টিক বাতাবরণ থেকে বসন্তকে উদ্ধার করে তাকে প্রগতিশীল জীবনভাবনায় জড়িয়ে বাস্তব পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগপত্র পাঠাবে না ? (নির্বাচনিক/*পদাতিক*, ১/৩০)

খ. অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৫)

গ. বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে; (আলাপ/*পদাতিক*, ১/৪০)

ঘ. বসন্তকে পুড়িয়ে মারে
দাও দাও দাবাগ্নি শিখায়, (উজ্জীবন/*চিরকুট*, ১/৭৬)

তিনি 'পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে' (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৭) বললেও তা পুষ্পিত বসন্ত নয়, বরং তা মানবমনের চেতনাগত পরিবর্তনের প্রতীক। একইভাবে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত' (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬২) – এই বহুল প্রচলিত উদ্ধৃতিতেও আমরা অবাক হয়ে বাসন্তি ফুলের অনুপস্থিতি লক্ষ করি।

কোকিল

কোকিল সুবিধাবাদী মানুষের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কোকিলের গান যে রোমান্টিক ভাবকল্পের জন্ম দেয়, সুভাষের কবিতায় তাকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বসন্তের প্রতি কবির মনোভাব যেমন অনুকূল নয়, তেমনি বসন্তের কোকিলকেও তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। উদ্ধৃতি দুটো লক্ষ করি –

ক. চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান ॥ (প্রস্তাব : ১৯৪০/*পদাতিক*, ১/২৬)

খ. খুলে বুকের
সমস্ত খিল
খাঁচায় বন্ধ
বোবা কোকিল (বোবা কোকিল/*জল সইতে*, ৩/৩১৯)

চড়াই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চড়াই অন্ধ অনুকারীদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। *পদাতিক*-এর 'নারদের ডায়রি' কবিতায় কবির ব্যঙ্গবাণ গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হলেও ঈশ্বরকে ব্যক্তির সমতলে নিয়ে আসা এবং চড়াইয়ের সঙ্গে নাস্তিক যুক্ত হওয়ায় তা লাভ করেছে নতুন ব্যঞ্জনা। চীনে ফ্যাসিস্ট জাপানি আক্রমণের নিন্দা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু তাই নয়, চীনের জনগণের জন্য বাণী প্রেরণ করেছিলেন তিনি এবং 'চীন তহবিলে' দান করেছিলেন ৫০০ টাকা। এতে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সমর্থক জাপানি কবি ইয়োনে নোগুচি রবীন্দ্রনাথের ওপর বিরূপ হন এবং কদর্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন (সুস্নাত দাশ ১৯৮৯ : ৩১)। সুভাষ মুখোপাধ্যায় নোগুচির নিন্দা বা ভুল সমর্থনকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে চড়াইকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। সুভাষের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করছি –

ক. ঈশ্বর-ব্যক্তির টিকি পাবে নাকো নাস্তিক চড়াই; (নারদের ডায়রি/*পদাতিক*, ১/৩১)

খ. আজকে এপ্রিল মাস, –(চৈত্র না ফাল্গুন ?)
ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়াইয়েরা ভণে। (পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাপতি

রোমান্টিক মন প্রজাপতির পাখায় ভর দিয়ে সুখস্বপ্নে ভেসে যায়। এছাড়া প্রণয়ের বার্তাবাহক হিসেবেও লোকবিশ্বাসে প্রজাপতি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়ানোর বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি দেখেছেন, প্রজাপতি-পন্থীরা যুদ্ধ-বিমানের শব্দ শুনতে পায় না। আর 'কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'র গায়ে এসে বসা প্রজাপতিও সমাদৃত হয় নি, বরং তাতে বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ 'দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ' শুনেছি আমরা। প্রসঙ্গত কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক –

ক. আমরা তো নই প্রজাপতি সন্ধানী! (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. প্রজাপতি পায় নাকো এরোপ্লেনের শব্দ বাতাসের কানে (পলাতক/*পদাতিক*, ১/২৯)

গ. ঠিক সেই সময় চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি ! (ফুল ফুটুক না ফুটুক/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৩)

এভাবেই সুভাষের কবিতায় 'প্রজাপতি' তার পরিচিত জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে।

এরোপ্লেন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এরোপ্লেন-কে কখনো উচ্চবিত্তের বিলাসী জীবনের প্রতীক হিসেবে, আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ-বিমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুভাষের কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত –

ক. আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে; (সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. প্রজাপতি পায় নাকো এরোপ্লেনের শব্দ বাতাসের কানে (পলাতক/*পদাতিক*, ১/২৯)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রচুর পৌরাণিক চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। বেশ কিছু কবিতা সম্পূর্ণরূপে পুরাণের কোন কাহিনী বা ঘটনার আলোকে নির্মাণ করে সমকালীন নানা সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন কবি। তাঁর কবিতার পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে। এখানে প্রধান কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্র তুলে ধরা হল যারা প্রতীকী অর্থমাত্রায় উন্নীত হয়ে কবিতায় গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

ত্রিশঙ্কু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় 'ত্রিশঙ্কু' প্রতীকী মাত্রা লাভ করেছে। পৌরাণিক রাজা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে তিনি পথহারা কিংবা হতবুদ্ধি মানুষকে চিহ্নিত করেছেন।[৫] নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা–
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে, (সকলের গান /*পদাতিক*, ১/২১)

খ. আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি–
গোলকধাঁধায় বৃথাই ঘোরা, (কানামাছির গান /*পদাতিক*, ১/২৪)

Dhaka University Institutional Repository

যমদূত

পৌরাণিক যমদূতের সঙ্গে একীভূত করে ঔপনিবেশিক অপশক্তির হিংস্রতা চিত্রিত করেছেন সুভাষ। বৃটিশ শাসন পথে পথে ছড়িয়ে দিয়েছে ভগ্নস্তূপ, মড়ক। বামপন্থী রাজনীতির কল্যাণচিন্তাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে। তাদেরকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়েছে ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও নির্যাতন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ে এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতা পুরাণ অনুষঙ্গে আরো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে –

ক. আজকের ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবসাঁতার (কিংবদন্তী/*পদাতিক*, ১/৪৪)

খ. দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে, (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)

গ. যমদূত দেয় চৌকি।
সাবধান!
বাঁয়ে যাস কে? (রাস্তার গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪)

কুরুক্ষেত্র

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-প্রসঙ্গ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। পরাধীন দেশে প্রতিনিয়ত অনাহারে মানুষের মৃত্যু দেখেছেন কবি। ঔপনিবেশিক শোষণ যেমন 'উপহার' দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যায় ভেসে গেছে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন। ফলে কুরুক্ষেত্রে উপবাস যাপনের মতোই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে মানুষকে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাকে কবি কৌরব ও পাণ্ডবদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে কুরুক্ষেত্রকে প্রতীকী তাৎপর্য দিয়েছেন। নিম্নের উদাহরণগুলো লক্ষ করা যাক –

ক. তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই॥ (আর্ষ/*পদাতিক*, ১/৪৩)

খ. এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো (স্তালিনগ্রাড/*চিরকুট*, ১/৬৮)

গ. বিড়ম্বিত জীবন আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে
পালাবার নেই কোনো গোপন দুয়ার। (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮)

উদ্ধৃতি ক-এর উপবাসী প্রার্থনায় পৌরাণিক উপবাসের স্বর্গপ্রাপ্তিকে অতিক্রম করে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে দুর্দিনের প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে আলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কবি। উদ্ধৃতি খ-এ স্তালিনগ্রাড যুদ্ধ বিষয়ে কবির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ধৃতি গ-এ কবির স্বদেশচিন্তার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গ উল্লেখে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। এভাবেই কবির স্বদেশ-ভাবনা পুরাণপ্রসঙ্গে অন্যতর মাত্রায় উদ্ভাসিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্র প্রতীকী মর্যাদা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃশাসন

মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র দুঃশাসন অপরাধ ও অপকর্মের এবং শোষণ ও নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখিত হয়ে আসছে। কৌরবদের অত্যাচারে পাণ্ডবদের জীবনে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শোষকশ্রেণীও তেমনি সাধারণ মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করেছে বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাদের দুঃশাসনের বংশধর হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. দুঃশাসনের পাঁজর খসাবো, গা থেকে খুলবো চামড়া। (উনত্রিশে জুলাই/*চিরকুট*, ১/৭৪)

খ. দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের
ভিৎ পড়ো-পড়ো (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫)

গ. অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাত উপ্‌ড়ে আনে
দুঃশাসনের ভিৎ। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)

উদ্ধৃতিত্রয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দুঃশাসনের চরিত্রের সঙ্গে চিত্রিত করায় দুঃশাসন প্রতীক হয়ে উঠেছে।

দুর্যোধন

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনও মহাভারতে খলচরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুভাষের কবিতায় অপশক্তির দম্ভকে দুর্যোধনের দুষ্কর্মের সঙ্গে তুলনা করায় তা প্রতীকী অর্থমাত্রা লাভ করেছে –

ক. দ্বারকায় ব'সে দুর্যোধন
চেটে নেয় জিভ –
আজ তার প্রাণে বড় সুখ। (ঘরে না, বাইরে না/ *যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৯)

খ. যাত্রাতেই যা ভীমের সাজে
ভাঙে দুর্যোধনের উরু। (অনেকের গান/ *যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪৭)।

শকুনি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সময়ের শঠ, স্বার্থপর, দুষ্টবুদ্ধি, বিবেকহীন, ভয়ঙ্কর মানুষ এবং কুটিল ও ষড়যন্ত্রকারী সম্প্রদায়কে তুলনা করে শিল্পসফল প্রতীক নির্মাণ করেছেন। অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে শকুনি-প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন কবি। নিচের দৃষ্টান্তসমূহে ব্যবহৃত শকুনি-প্রসঙ্গে তাঁর প্রগতিচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে –

ক. এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে।
শকুনির নখরে নখরে
উন্মত্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯)

খ. শকুনিচক্রের বুক কাঁপে।
অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম–(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬০)

গ. দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ,
রক্তচক্ষু রাজার শাসন–
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু, (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৭-৭৮)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে শকুনি-প্রতীক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিবেচনাকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। সময়-সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পর্ক এসব প্রতীকে রূপলাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দধীচি

মহাভারতে দধীচি কঠোর ও কঠিন তপস্যার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাড়কে দধীচির হাড়ের সঙ্গে তুলনা করে এই প্রাণদানকে মহৎ কর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং এই মর্মে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের এই আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। নিচের উদ্ধৃতিদ্বয়ে কবির প্রগতিচেতনা দধীচি প্রতীকের মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে –

ক. দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার–
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার ॥ (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬১)

খ. গুপ্তকক্ষে ব'সে ব'সে নিজের অস্থিতে
বজ্র যেন বানাচ্ছে দধীচি। (কাল মধুমাস /*কাল মধুমাস*, ২/১৬২)

যা রে কাগজের নৌকো (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থের 'সপ্তাহ প্রতিদিনই' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। শোষক ও নিপীড়ক যেমন নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে মানুষের অধিকার খর্ব করে চলেছে, তেমনি আমাদের চোখের আড়ালে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিদিন জন্ম নেয় দধীচি, এবং –

বিনা নামে বিনা অর্থে
বিনা যশে
সে বজ্র বানিয়ে যায়
নিজের অস্থিতে (সপ্তাহ প্রতিদিনই/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪৬)

এভাবেই এই পৌরাণিক চরিত্র সুভাষের চেতনার স্পর্শে প্রতীকী অর্থমাত্রা লাভ করে।

বীরবাহু

বীরবাহু দেশপ্রেমিকের প্রতীক হিসেবে সুভাষের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে, যা কবির স্বদেশচিন্তায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন মুক্তির জন্য মানুষের প্রস্তুতি। তাই সূর্যোদয়ের স্বপ্নে কবি ঘোষণা করেছেন –

মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব
দিগন্তে দিগন্তে দেখি বিস্ফোরিত আসন্ন বিপ্লব। (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮–৭৯)

বিপ্লব আসন্ন ভেবে কবি স্মরণ করেছেন রাবণপুত্র বীরবাহুর আত্মত্যাগের কাহিনী। তিনি লক্ষ করেছেন, দেশপ্রেমিক জনতা জেগে উঠেছে। তাই মুক্তির আনন্দ দেশপ্রেমিকের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে দিতে তিনি বীরবাহুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ফলে কবি-চৈতন্যের উত্তাপে বীরবাহু প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভস্মলোচন

ভস্মলোচন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চমৎকার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। রাবণের অন্যতম অনুচর ভস্মলোচন সহস্র বছরের তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে যে বর লাভ করেন, তাতে নিজেই ভস্মিভূত হয়ে যান। ভস্মলোচন এখানে শোষক ও নিপীড়কের নির্মম পরিণতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে –

Dhaka University Institutional Repository

ক. রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে। (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

খ. হাত পড়ছে
বেবাক ব্যথার জায়গায়
হাত পড়ে না কী জানি কেন
ভস্মলোচনের গায় (হাল ছাড়া/*ধর্মের কল*, ৫/২২৯- ২৩০)

উদ্ধৃতি ক-এ যারা পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, নরকের উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘরে ঘরে, তাদেরকে কবি ভস্মলোচনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উদ্ধৃতি খ-এ কলকাতার ভস্মলোচন আপাতত নিরাপদ হলেও তাঁর পরিণতিও নিজের আগুনে নিজেই ছাই হওয়া। এভাবে কবির স্বদেশচিন্তা ভস্মলোচন প্রতীকে রূপলাভ করেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও শিল্পভাবনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে শোষিত মানুষ। তাঁর প্রকরণ-প্রকৌশল এমন কোন জটিলতা বা দুর্বোধ্যতাকে প্রশ্রয় দেয় নি, যা তাঁর শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে সাধারণের ব্যবধান রচনা করে। দেশ-কালের পটভূমিতে সংলগ্ন থেকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সুদৃঢ়তার ভিত্তিতে তিনি যে স্বদেশ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাঁর কবিতা সেই ব্রতযাপনের মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। সমাজমনস্কতা ও রাজনীতি-সচেতনতাই তাঁর কবিতাকে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের তীক্ষ্ণমুখ হাতিয়ার তাঁর কবিতা। তাঁর প্রতীক সৃজনপ্রক্রিয়ায় সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি সচেতনতার প্রভাব সক্রিয় থেকেছে। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে তিনি তাঁর শিল্পভাবনাকে ঋদ্ধ করেছেন এবং তাঁর প্রতীক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জীবন-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে, যা সমষ্টিগত চেতনার উদ্বোধক।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু, প্রতীকী কাব্যের উৎসস্থল শার্ল বোদলেয়ার-এর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রতীকী কাব্যান্দোলনকে বাংলা কাব্যপ্রকরণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মাহবুব সাদিক (১৯৯১ : ৩৬৮)। বোদলেয়ারের প্রতীকী কাব্যান্দোলন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন –

> শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নয়, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা। অনুভব না করে উপায় নেই পরবর্তী ফরাশি কবিতায় তার অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা দূরাগত, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্তনির্যাস (১৯৮১ : ২-৩)।

প্রতীকী কাব্যান্দোলন আমাদের তিরিশের কবিদেরও তেমন প্রভাবিত করে নি। বুদ্ধদেব বসুর অন্তিম পর্যায়ের কবিতায় প্রতীকবাদীদের বিষাদ, বিতৃষ্ণা, নির্বেদ, কামপ্রাবল্য, ইন্দ্রিয়বিলাস, ভিখিরি, বেশ্যা, দারিদ্র্য ও মৃত্যু ইত্যাদি উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে বলে মাহবুব সাদিক উল্লেখ করলেও তা প্রকৃত অর্থে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের মধ্যেই বিশেষ দীপ্তি লাভ করেছে, প্রতীকী কবিদের অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার জগৎ বুদ্ধদেবের দৃশ্যমান বস্তুর ভাষারূপে ধরা পড়েছে বলে মনে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (১৯৬৫ : ১৯৪-১৯৫) গ্রন্থের 'প্রতীকের প্রয়োগ' শীর্ষক প্রবন্ধে জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রতীকের তাৎপর্য ও ইঙ্গিতময়তা-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩. তারেক রেজা, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : মিছিলের মুখ এবং মুখের মিছিল', *উলুখাগড়া*, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ১০৬।

৪. মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ভ. ই. লেনিন। এর 'সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব' সম্পর্কে লেনিনের (*রচনা সংকলন*, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৪) মতামত উদ্ধৃত করা যেতে পারে –

> বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ইতিহাস ও রাজনীতি-বিষয়ক মতামতে যে বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়াল এ যাবৎ চলে আসছিল তার সমাপ্তি ঘটিয়ে এল এক আশ্চর্য রকমের সর্বাঙ্গীন ও সুসামঞ্জস্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা দেখাল কী করে উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশের ফলে সমাজজীবনে একটি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভব হয় উচ্চতর ব্যবস্থা।

৫. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), ১৪১২, *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২০৫। পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, অন্য কোন উল্লেখ না থাকলে, এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে বুঝতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৬৫, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা।

২. অশ্রুকুমার শিকদার, ১৩৯২, *আধুনিক কবিতার দিগবলয়*, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৩. আহমদ কবির, ১৯৯৫, *রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক*, তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

৪. বুদ্ধদেব বসু (অনূদিত), ১৯৮১, *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, প্রথম সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫. ভ. ই লেনিন, *রচনা সংকলন*, প্রথম ভাগ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৬. মাহবুব সাদিক, ১৯৯৩, *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. সুস্নাত দাশ, ১৯৮৯, *ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা*, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, কলকাতা।

8. M. H. Abrams, 1997, *A Glossary of Literary Terms*, Reprinted, Macmilan India Limited, New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুরাণ

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ ঐতিহ্য সংলগ্নতা। একজন স্রষ্টা সমকালীন সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেই অতীতের সকল অর্জনকে স্বীকরণ করেন এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে নতুন পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্নে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। যে কোন সৃজনশীল মানুষের ব্যক্তিগত ভুবনই সময়ের এই ত্রিধারায় স্নাত হয়ে স্বাতন্ত্র্য সংযোজনায় সক্রিয় থাকে। নিজের ভেতর থেকে নেমে এসে অন্য সময় ও সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হয় তাঁকে। আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের বন্ধন প্রগাঢ় হলেই সামনে এগিয়ে যাওয়া তাঁর জন্য সহজ হয়। তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবেন না, সবার সঙ্গে রঙ মেলানোর এই পথযাত্রায় তিনি শেকড়ের সুদৃঢ়তায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই শেকড়-ভাবনাই একজন সাহিত্যিককে পুরাণ অন্বেষায় অনুপ্রাণিত করে।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) পুরাণ প্রয়োগে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারই উত্তরাধিকারী হিসেবে তিরিশের কবিরা পৌরাণিক প্রসঙ্গের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। আধুনিক জীবনযাত্রার নানা অসঙ্গতি, অতৃপ্তি এবং অচরিতার্থতার শিল্পরূপ দিতে গিয়ে তাঁরা পুরা-কাহিনীর নানা চরিত্রের স্মরণ নিয়েছেন, আবার কখনো কখনো পৌরাণিক ঘটনার আলোকে বর্তমানকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। পুরাণ ধর্মকাহিনীর স্মারক হলেও ধর্মবিশ্বাস থেকে নয়, বরং জীবনের জটিল আবর্তে বিপর্যস্ত ব্যক্তির মানসিক বিভঙ্গতার পরিচয় দিতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যিককে পুরাণের আশ্রয় নিতে হয়। পুরাণ প্রয়োগের প্রেরণা একজন সাহিত্যিক নিজের ভেতর থেকেই লাভ করেন। সাহিত্যিক উত্তরাধিকার তাঁর জীবনদৃষ্টি নির্মাণে যেমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি উত্তরণের অভীপ্সা তাঁকে জীবনের নতুন প্রান্তে আলোক প্রক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়েও পৌরাণিক অনুষঙ্গের আবেদন আমাদের কাছে পুরোনো হয়ে যায় না, নতুনের ব্যঞ্জনায় বিকশিত হয়ে ওঠে চৈতন্যের অনালোকিত অঙ্গন।

পুরাণ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধ রচনা করে। 'পুরাণ' নামটির মধ্যে পুরাতনের সংযোগ আছে, যার উদ্দেশ্য হল 'পুরাতন' ঐতিহ্যকে বহাল রাখা। কিন্তু পুরাণসমূহ বর্তমানে যে বিবেচনায় আমরা পাঠ করি তা যে পুরাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে 'পূরণ' শব্দটির মধ্যে পুরাণের একটি উৎসমূল অনুসন্ধান করা যেতে পারে। একজন আধুনিক সাহিত্যিক ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের ব্যবধান হ্রাস করার কাজটি পুরাণ ব্যবহারের মাধ্যমে করে থাকেন।[১] রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় পুরাণের ব্যবহার সরলরৈখিক নয়, তা কাব্যদেহে যোগ করেছে নতুন ব্যঞ্জনা এবং বিগতকে বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করার এই কৌশল যেমন কবিতার বক্তব্য ও চিত্রকল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতার শিল্পরূপে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

> সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার সামসময়িক জীবনচেতনা শাশ্বত মিথ-অভিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সাহিত্যে তৃতীয় মাত্রার সংযোজন ঘটায়। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা পুরাণ-অভিজ্ঞানের সংযোজন-সমন্বয়ে সাহিত্য পায় শাশ্বত কালমাত্রা (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৩৯৫)।

পুরাণের বহুমাত্রিক প্রয়োগে তিরিশের কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন পাশ্চাত্যের কবিরা। রবীন্দ্র-বলয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্র স্বরের স্রষ্টা হিসেবে বাঙালি কবিদের আত্মপ্রকাশের প্রেরণা ছিলেন যারা, তাঁদের কবিতার মিথিক আভিজাত্য কালের চিহ্নকে ধারণ করেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়।[২] মানুষ স্বভাবতই মিথের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। মানবচৈতন্যের গভীরতর স্তরে পৌরাণিক কাহিনী ক্রিয়াশীল বলেই যে কোন শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে চিরায়ত মাত্রায় রূপ দেয়ার প্রয়োজনে পুরা-কাহিনীর আশ্রয়ে নিজেকে নির্মাণ করেন। বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানববিশ্বাসের ভিত্তিকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে, তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে গিয়ে অনেকের কাছেই পুরাণের আশ্রয় অনিবার্য মনে হয়েছে। প্রচলিত মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টির বিপরীতে অনিকেত মানুষের ভগ্ন-বিপর্যস্ত রূপ চিত্রিত করার প্রণোদনা থেকেই আধুনিক কবিরা মিথ-এর জগতে প্রবেশ করেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> This consideration of the role of myth in great poetry of the past may throw some light upon the predicament of the poet and the unpromising estate of poetry in our non-mythological present. The poet of today--and by that I mean the poetic impetus in all of us today--is profoundly inhibited by the dearth of shared consequences of myth.[৩]

যে-কোন সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই শিল্পরূপ দিয়ে থাকেন। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্বকালের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। সমকালীন জীবন-বাস্তবতার চিত্রায়ণে কবির অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিই তাঁকে মিথকলার পরিচর্যায় উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পী কেবল নিজের কালের মানুষের মধ্যেই তাঁর শিল্পচেতনাকে সীমাবদ্ধ করতে চান না। স্বকালের সংঘাত ও সম্ভাবনাকে দেশকাল-অতিক্রান্ত সর্বজনীনতায় অভিষিক্ত করার অভিনব কৌশল হিসেবে ঐতিহ্যের উজ্জ্বল আধার মিথের জগতে তাঁর আনাগোনা। মিথ শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্বয় ঘটিয়ে সাহিত্যকে সার্থকতায় উন্নীত করে।[৪]

আধুনিক জীবনের নানাবিধ জটিলতা এবং যন্ত্রসভ্যতার বহুবিধ বিপর্যয়ের কাব্যরূপ দিয়েছেন আমাদের তিরিশের কবিরা। বর্তমানের ভাঙন-বিকার-বিকৃতিকে তাঁরা এড়িয়ে যান নি। সংবেদনশীল শিল্পীর দায়িত্ব তাঁরা বিস্মৃত হন নি, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাকে নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। ফলে তাঁদের কবিতায় পুরাণের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পুরাণ প্রয়োগে জীবনানন্দ দাশের সাফল্য বিস্ময়কর। পৌরাণিক নায়িকারা তাঁর কবিতায় মানবীয় লাবণ্য লাভ করেছে। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী থেকেই তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত পুরাণসমূহ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অভারতীয় পুরাণের উল্লেখও তাঁর কবিতায় রয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি হয় মূলত তাঁর পুরাণ নির্বাচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই। হিমকৈলাশ, গঙ্গা, শঙ্খ প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গ একটা ধর্মীয় ব্যঞ্জনা আনে। সেই অর্থে পুরাণ প্রয়োগে তিনি যাপিত জীবনের অপ্রাপ্তি ও আক্ষেপ চিত্রায়িত করেন নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতায় পুরাণ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কবিতায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ ঘটনার চেয়ে চরিত্রকেই উজ্জ্বল করে তোলে। বুদ্ধদেব বসু ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

মিথ-ঐতিহ্যের ব্যবহারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য পুরাণের উল্লেখ তাঁর কবিতায় থাকলেও তাঁর আধুনিক শিল্পদৃষ্টি ভারতীয় পুরাণের নবজন্ম দিয়েছে। বিষ্ণু দে মিথাশ্রয়ী কবি। তাঁর কাব্যের প্রকরণগত ও ভাবগত সমৃদ্ধি বিশ্বপুরাণ পরিক্রমার ফসল। ভারতীয় ও অ-ভারতীয় পুরাণ ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি বাংলা কবিতায় মিথ প্রয়োগে নতুনত্ব এনেছেন। তিরিশের কবিরা ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগরক্ষার উপায় হিসেবে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ ব্যবহার করেছেন, তেমনি স্বকালের নানা বিপর্যয় ও বিক্ষোভকে চিত্রিত করতেও পৌরাণিক কাহিনীর শরণ নিয়েছেন। তিরিশ-পরবর্তী বাঙালি কবিরা পুরাণ-প্রয়োগের এই ধারাবাহিকতায় যেমন অভিনবত্ব এনেছেন, তেমনি পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতির দাহ ও দ্রোহের স্বাক্ষর তাঁদের পুরাণভাবনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসবাদী কবি হিসেবে স্বীকৃত। কবিতাকে তিনি শ্রমশীল, উৎপাদনক্ষম মানুষের উজ্জীবনের মন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ দিনবদলের যে স্বপ্ন দেখায়, কবিতা সেই স্বপ্নকেই ধারণ করে শিল্পসফল হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায় সফল-সমৃদ্ধ-উজ্জ্বল আগামীর প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক শক্তি হিসেবে কবিতায় পুরাণ প্রয়োগ করেছেন। ফলে 'শঙ্খ'[৫] শব্দের ধর্মীয় আবরণ ছিন্ন করে শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ করার আহ্বান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। শঙ্খ তাই সাইরেনের শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে লাভ করে ভিন্নমাত্রা। ভগবানের শক্তিতে তিনি মানুষকে অধিষ্ঠিত করে ভাগ্যের চাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলেছেন। যে-কোন বিপদ বিপর্যয়ে মানুষের সহায় একমাত্র মানুষই– এই বিশ্বাস মিথের প্রচলিত ধারণাকে নবনির্মিতি দিয়েছে–

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে। (মে-দিনের কবিতা /*পদাতিক*, ১/২২)

প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করেই জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে হবে– যৌবনের এই ধর্মই সুভাষের কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। পৌরাণিক শঙ্খ অসংখ্য মৃত্যু, ধ্বংস, জরা ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণাকে আরো প্রবল ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যার কণ্ঠস্বর মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে উজ্জীবিত, যার উদ্যম ও শ্রম দেশ গড়ার মহান আদর্শে নিবেদিত, কবি তাঁদেরকে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন কিংবা চণ্ডীর শুভ্রব্রতের সমগোত্রীয় করে তুলেছেন –

কোথায় তিনি শান্তির রথ
সাজান ময়ূরপঙ্খে
ঝড়ের বেগে গড়েন দেশ
ফুঁ দেন মুক্তিশঙ্খে (জাগ্রত[৬]/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২২)

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন নামক রাক্ষসকে হত্যা করার পর তার অস্থি হতে নির্মিত শঙ্খ 'পাঞ্চজন্য' বাজিয়ে যুদ্ধের বার্তা ঘোষণা করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন বাঁশি, যার সুর সারা

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে, অর্থবহ হয়ে উঠবে মানুষের জীবন –

সরিয়ে ফেলে পাঞ্চজন্য,
ওষ্ঠে নাও বাঁশী
ফোটাও মুখে আবার ভুবন-
ভোলানো সেই হাসি,
জীবন হোক ধন্য ॥ (সখা হে/ *ধর্মের কল*, ৫/২৪২-২৪৩)

পদাতিক (১৯৪০)-এর প্রথম কবিতাতেই তিনি মধ্যবিত্তের দোলাচলতার পরিচয় দিতে গিয়ে পৌরাণিক 'ত্রিশঙ্কু'র সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যে-কোন আন্দোলন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার অন্যতম শর্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী চরিত্র প্রায়শই দোটানায় পড়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই হতবুদ্ধি মধ্যবিত্তের অন্তরেও সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ, নতুন দিনের এই যাত্রায় হাতে হাত রেখে এগিয়ে না গেলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য সম্ভব নয়। বাধার দেয়াল ভাঙার আহ্বান তাই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো উচ্চারিত হয় কবিকণ্ঠে–

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পকে চেনা–
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে, (সকলের গান /*পদাতিক*, ১/২১)

আত্মমগ্ন, ভীরু মধ্যবিত্ত ঘরে ও বাইরে কোথাও স্বস্তি পায় না। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর এই মনোবৃত্তি কবিকে ব্যথিত করেছে। ফলে পৌরাণিক রাজা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে তিনি এই স্বার্থসন্ধানী মানুষকে চিহ্নিত করেছেন।

আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি–
গোলকধাঁধায় বৃথাই ঘোরা, (কানামাছির গান /*পদাতিক*, ১/২৪)

কবির এই 'আমি' ব্যক্তি আমি'র সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সমগ্র মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি বিশ্বাস করেন, মহৎ কর্মের অনুশীলন দ্বারা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করা সম্ভব। কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে সূর্যবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বাসনা ব্যর্থ হয়। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের স্মরণ নিলেও শেষরক্ষা হয় নি। কিন্তু মানুষের এই স্বপ্ন সহজেই পূর্ণ হতে পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানুষকে কেবল স্বর্গে যাওয়ার পথই দেখান না, স্বর্গ তৈরির ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ করেন –

সশরীরে স্বর্গে যেতে চাস?
আয় কাছে, আয় এই বেলা (গোলোকধাম/ *একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/৩০৪)

পথভ্রান্ত মধ্যবিত্তের চিন্তা ও কর্মের ব্যবধান প্রচুর। এই ব্যবধান সাফল্যের অন্যতম অন্তরায়। পরিশ্রমের সঙ্গে প্রতিজ্ঞার জোর থাকলেই যে কোন ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের গা বাঁচিয়ে চলার প্রবণতাই তাদেরকে বার বার পরাজয়ের পথে পরিচালিত করে বলে কবি মনে করেন। তাই মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে তিনি 'বালখিল্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে
ধূলিসাৎ বটে, সে বালখিল্য-স্বপ্নেরা: (কানামাছির গান /*পদাতিক*, ১/২৩)

স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে যে পরিশ্রম ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিই মধ্যবিত্তকে পৌরাণিক 'বালখিল্য'-এর সমগোত্রীয় করে তোলে। এই পৌরাণিক ক্ষুদে ঋষির দল তেজস্বী সত্ত্বেও আকারগত ক্ষুদ্রতায় সাফল্যবঞ্চিত হয়েছে। প্রচেষ্টাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে বালখিল্যের রূপকে চিত্রায়িত করে তিনি আধুনিক অনুষঙ্গে পুরাণ প্রয়োগ করেছেন। এই 'বালখিল্য' চরিত্র কবির রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি মূলত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য মানুষের অর্থহীন আড়ম্বরে আহত ও বিব্রত বোধ করেছেন। কখনো কখনো নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকেও ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। তাই নিজেকে 'ভ্যালা পদাতিক' হিসেবে সম্বোধন করে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছেন। আত্মোপলব্ধির এই অভিনব কৌশলকে অন্যতর তাৎপর্য দিয়েছে বালখিল্য চরিত্রের উল্লেখ–

সামনে একটা আয়না
ধরলেই ব্যাটা (আসলে তো কেঁচো)
বনে যাবে বালখিল্য। (পালানো/ *বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮২)

কশ্যপঋষি পুত্রকামনায় আয়োজিত যজ্ঞে কাষ্ঠ সংগ্রহে বালখিল্য মুনিদের নিয়োজিত করেন। খর্বাকৃতি ও দুর্বল বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে মাত্র একটি পাতা নিয়ে বন থেকে ফিরে আসার পথে জলপূর্ণ এক গোস্পদে পতিত হন। এই দৃশ্যে ইন্দ্র পুলক বোধ করেন। ঋগ্বেদের বালখিল্য ঋষিরা ইন্দ্রের উপহাসে আহত হয়েছিলেন।[৭] মহাভারতের আদি পর্বে বালখিল্যের তপস্যায় যে নিষ্ঠা ও সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অবশ্য প্রমাণ করে যে, দৃঢ় মনোবল ও লক্ষ্যে অবিচল থাকলে দৈহিক আকার সিদ্ধিলাভের অন্তরায় হতে পারে না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বকালের যাবতীয় সংঘাত, সংঘর্ষ ও সম্ভাবনায় সাড়া দিয়েছেন। শিল্পের সর্বকালীন আবেদন স্রষ্টার সমসাময়িক অনুভব ও অভিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সম্ভব হয়ে ওঠে– এই কাব্যবিশ্বাসেই ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে সুভাষের সৃজন-ভুবন। পুরাণ মূলত পুরাঘটিত ও বর্তমান মুহূর্তের সুদৃঢ় বন্ধনেই জাত হয়।[৮] ফলে তিনি বর্তমানের ভয়াবহতাকে পৌরাণিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। দেশের পথে-প্রান্তরে যমদূতের আনাগোনায় কবি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। পৌরাণিক যমদূতের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় ঔপনিবেশিক অপশক্তির হিংস্রতা। বেদে আমরা যে শিবকে ভয়াবহ, হিংস্র ধ্বংসকারী হিসেবে দেখি, তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে লোকদের হিংসা করেন ও তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করেন, বজ্রাঘাতে মানুষ ও পশু বধ করেন, রোগ আনয়ন করেন, তেমনি বৃটিশ শাসন পথে পথে ছড়িয়ে দিয়েছে ভগ্নস্তূপ, মড়ক। বামপন্থী রাজনীতির কল্যাণচিন্তাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে। ফলে 'ভূড়িদাসদের' ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যে প্রগতিশীল শক্তি, তাদেরকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়েছে ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও নির্যাতন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ে এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতা পুরাণ অনুষঙ্গে আরো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে –

ক. আজকের ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবসাঁতার (কিংবদন্তী/*পদাতিক*, ১/৪৪)

খ. দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে,
রক্তলোভাতুরা শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে। (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭১)

Dhaka University Institutional Repository

গ. যমদূত দেয় চৌকি।
সাবধান!
বাঁয়ে যাস কে? (রাস্তার গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪)

শিব বা মহাদেব যেমন বিচিত্র রূপে আবির্ভূত হন– কখনো সৃষ্টি ও কল্যাণের মূর্তিতে, আবার কখনো ধ্বংস ও মহাসংহারক রূপে– তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও নানা অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এই মহাশক্তিধর পৌরাণিক চরিত্র। তিনি এই চরিত্রের উল্লেখে মানবচিন্তার বহুবর্ণিলতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।[৯] কখনো শাণিত ব্যঙ্গ, আবার কখনো লোকজ প্রবাদ থেকে তিনি শিবের সাধারণ অবস্থিতি তুলে ধরেছেন অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠতায়। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে–

ক. পালকি এসে পৌঁছুল দেউড়িতে
সে পেয়েছে শিবতুল্য বর। (কাল মধুমাস /*কাল মধুমাস*, ২/১৬৪)

খ. নইলে শিব গড়তে গিয়ে
হয়ে যেত নিশ্চয় বাঁদর। (কাল মধুমাস /*কাল মধুমাস*, ২/১৬৪)

গ যখন ভগ্নদূতকে আড়াল করে
সামনে এসে দাঁড়াবে
রুদ্রের দক্ষিণ মুখ (ভগ্নদূত/*যা রে কাগজের নৌকা*, ৫/৪২)

ঘ. যাত্রা পাঁচালি কথকতা
হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা॥ (৬৪/*মিউয়ের জন্যে ছড়ানো ছিটানো*, ৫/৩১২)

ঙ. চোখ তার
অনুর্বর অন্ধকারে ঢাকা,
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা। (এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৩)

চ. এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,
দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা ॥ (জয়মণি, স্থির হও/ফুল ফুটুক, ১/১৩২)

ছ. সাহিত্যে সখ, পড়ি না ভ্রষ্ট কবিতা;
শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে । (আদর্শ/*পদাতিক*, ১/২৯

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের প্রত্যেকটিতেই শিবের মিথকল্প ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই পৌরাণিক চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত। উদ্ধৃতি ক-এর শিব সৌন্দর্যে ও পৌরুষে উজ্জ্বল। নতুন জীবনের সূচনায় বরের দৈহিক অবয়ব নববধূর চোখে যে স্বপ্নের আবির ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই প্রকাশ শিবের রূপকল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃতি খ-তে শিব সম্পর্কিত একটি লোকপ্রবাদের উল্লেখ লক্ষ করার মতো। শিবের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হলে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটতে পারে, তারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কবির ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে মায়ের স্মৃতিচারণ কবিতাটিতে যোগ করেছে ভিন্নতর আস্বাদ। মায়ের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা কবি লিখলে সত্যিকার অবস্থার প্রকাশ যে অসম্ভব হয়ে হয়ে উঠত- এই আশঙ্কা

Dhaka University Institutional Repository

শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর সৃষ্টির লোকপ্রবাদে চমৎকার শিল্পসফলতা লাভ করেছে। উদ্ধৃতি গ-তে রুদ্র বা শিবের কল্যাণময়ী রূপকে কবি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হতে পরাজয়ের সংবাদ বহনকারী দূতের মতো দৈনিক পত্রিকা কবিকে ক্ষতবিক্ষত করে। আগামী দিনে স্বার্থান্ধচক্রের কবলে পড়ে লাশ হয়ে যারা ভাগাড়ে চলে যাবে, কবি যেন চোখ বন্ধ করেই তাদের নাম বলে দিতে পারেন। কবি তখনই চোখের পাতা খুলে তাকাতে চান, যখন শিবের সংহারক মূর্তিকে আড়াল করে সামনে দাঁড়াবে তাঁর সৃষ্টি ও সুন্দরের রূপ। মানুষের নিয়ত মঙ্গলকামনায় রত এই দেবতা নানা কাজের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলেই তিনি শিব। কবি এখানে রুদ্রের শিবত্বকে উচ্চাসন দিয়ে দিন বদলের দৃঢ় প্রত্যয়কেই প্রবল করে তুলেছেন। উদ্ধৃতি ঘ-এ শিবের বাইরের চেহারা প্রকট হয়ে উঠেছে। মহাযোগীর বেশে তাঁর দেহ ভস্মাবৃত এবং জটাজুটধারী। তিনি নৃত্যকলারও উদ্ভাবক বলে তাঁর নাম 'নটরাজ'। এখানে যাত্রা, পাঁচালি, কথকতার স্রষ্টা নটরাজের স্মরণ নেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ঙ-তে শ্মশানচারী শিবের কঠোর তপস্যার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণ যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারির জন্ম দিয়েছে তা যেন শিবের শ্মশানব্রতের মতোই কঠিন ও কঠোরের সাধনা। কবি এই সাধনার পথেই পরস্পরের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে 'ভূকম্পিত বিস্ফোরণে' বজ্রাঘাত করতে বলেছেন, যার মাধ্যমে সম্ভব হবে 'শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন'। উদ্ধৃতি চ-এর শিব অবশ্য কঠিন ও কঠোর সাধনার প্রতীক হয়ে ওঠে নি। 'জয়মণি, স্থির হও' বলে তিনি যে আদিম সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বিবৃত করেন, তা মিথ-সংক্রান্ত, যে মিথ কলকাতার ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। 'এই শৈবমূর্তি কোনো রুদ্রের নয়; গঙ্গাধর আশুতোষের। জীবনে প্রেমের সংরাগে যিনি অর্ধনারীশ্বর'।[১০] উদ্ধৃতি ছ-এ মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে কবি প্রতিবাদী সাহিত্যের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণার কথা বলেছেন এবং নিছক মনোরঞ্জনের নিমিত্তে সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে শিব-এর স্মরণ নিয়েছেন।

শিবপত্নী দুর্গা বা চণ্ডী প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি শোষিত বঞ্চিত মানুষের সংঘবদ্ধ জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। দশভুজা দুর্গা সম্মিলিত জনতার যৌথ প্রয়াসকে প্রোজ্জ্বল করেছে। আর অরণ্যপর্বতে রণচণ্ডীর নহবত প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞায় প্রাণসঞ্চার করে। আবার দশমহাবিদ্যার প্রথম বিদ্যা কালী কখনো সাধারণ লোকবিশ্বাসের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো এই মহাশক্তিধর পৌরাণিক চরিত্র সাংসারিক আচরণের অস্বাভাবিকতাকেও চিহ্নিত করেছে –

ক. আকাশে সমুদ্রে, স্থলপথে
থরে থরে শোভাযাত্রা উলঙ্গ মৃত্যুর,
অরণ্যপর্বত শোনে রণচণ্ডী সাঁজোয়ার নহবতে আজ
আদিম গুহার সুর। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/ *চিরকুট*, ১/৫৯)

খ. আমরা জয় মা কালী ব'লে
দিলাম সজোরে পয়সা ছুঁড়ে
যে তিমির
সেই তিমিরেই। (কাল মধুমাস / *কাল মধুমাস*, ২/১৫৭)

গ. বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিণীর বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো। (মেজাজ /*যত দূরেই যাই*, ২/১০০)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. মা-কালী কলকাত্তাওয়ালী

ঠন্‌ঠনের মোড়ে (যা রে কাগজের নৌকো/ *যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৬)

শিব ও পার্বতীর পুত্র গণেশ অসুস্থ কলকাতার রূপক হয়ে ওঠেন। শহর কলকাতায় সৃজনশীল ও গঠনমূলক চিন্তার অনুপস্থিতি কবিকে আহত করেছে। তাঁর মনে হয়েছে, বিবেচনাবোধ বর্জিত মানুষগুলো এখন অন্যের নিয়ন্ত্রণে। কলকাতার মুখ আঁকতে গিয়ে শনির দৃষ্টিপ্রভাবে গণেশের মুণ্ডচ্যুত হওয়ার প্রসঙ্গ দ্বারা কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন –

চোখ-ধাঁধানো আলোয় আর
কান-ফাটানো তাসায়
করেন গৃহপ্রবেশ
সিদ্ধিদাতা গণেশ (হাল ছাড়া/ *ধর্মের কল*, ৫/২৩০)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার জগন্নাথের প্রসঙ্গ কবিতায় ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে আষাঢ় মাসে তাঁর রথযাত্রার সঙ্গে কলকাতার রাজনৈতিক চালচিত্রের একটা তুলনামূলক চিত্র তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। জগন্নাথের ভ্রাতা বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রাকে রথে স্থাপন করে তাঁর উপাসকরা টেনে নিয়ে যায়। দেশের স্বার্থ রক্ষার নামে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে কবির কাছে যথার্থ মনে হয় নি। ফলে রাজনীতির এই রথযাত্রাকে তাঁর মনে হয়েছে 'হাওয়াই রথ', আর তার পাশে কবি স্থাপন করেন পুরাণোক্ত অগ্নিবর্ষী তীরবিশেষ। কবির ভাষায় –

হাওয়াই রথ দিলো হানা
অগ্নিবাণ ছড়ালো চারপাশে। (চলচ্চিত্র/*চিরকুট*, ১/৫৩)

জগন্নাথের প্রস্থান দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন, 'এত বলি ত্রিপুরীর বীর জগন্নাথ/ গেলা চলি' (১/৫৪)। আর ভক্তের স্তবগানে চৈতন্যদেবের শৈশবের ডাকনাম মনে পড়ে যায়। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় চৈতন্যের নামের মধ্যে তাঁর মায়ের যে বিরক্তি লুকিয়ে ছিল অর্থাৎ যমের অযোগ্য বলে নিমাই নামকরণের সঙ্গে বাজারের অগ্নিমূল্যকে সমন্বিত করেন আর স্মরণ করিয়ে দেন তিনি–

'ধন্য প্রভু, তুমি যেন বাপুজী সাক্ষাৎ।
সহসা বিস্মিত শিষ্য কীর্তন থামায়।
বিষণ্ন বাজার কাঁদে : নিমাই, নিমাই! (চলচ্চিত্র/*চিরকুট*, ১/৫৪)

তিনি অবশ্য স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না, 'পুনশ্চ : প্রার্থনা এই রাখি, অতঃপর/আমার অহিংস ছাগে দিও না নজর' (১/৫৫)। এভাবেই সমকালীন রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা পৌরাণিক অনুষঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

চিরকুট কাব্যগ্রন্থে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্মৃতিবিজড়িত 'উজ্জীবন' কবিতার প্রথমেই কবি কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের কাব্যরূপ দিয়ে কবিতাটি শুরু করেন। 'আমার প্রশংসায় কাজ নেই।/ধর্ম অধর্মের অতীত/কার্যকারণ থেকে পৃথক/অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন/যা তুমি জানো/আমাকে বলো' (১/৭৬)–এই কাব্যাংশ কবিতার পরবর্তী অংশের বক্তব্যকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছে। যমের প্রতি নচিকেতার এই নির্দেশের সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের আত্মোপলব্ধি ও শিল্পরূপের অন্বয় আবিষ্কারের একটি চেষ্টা এখানে

Dhaka University Institutional Repository

চোখে পড়ে। কঠোপনিষদের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়েছে। সুকান্ত ও সুভাষের বিশ্ববীক্ষার একটি সাধারণ প্রান্ত এই কবিতায় স্পষ্ট। সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন বলেছিলেন, 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি– /নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার',[১১] তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অনুজ কবির কাছে অঙ্গীকার করেন–

সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাবো। (উজ্জীবন/*চিরকুট*, ১/৭৭)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-প্রসঙ্গ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরু-পাণ্ডবের এই রণভূমি 'ধর্মক্ষেত্র' হিসেবে খ্যাত, কারণ এখানে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে কুরু জীবন অতিবাহিত করেন। এখানে উপবাস করে কিংবা যুদ্ধ করে প্রাণ ত্যাগ করলে সে স্বর্গ লাভ করে। পরাধীন দেশে প্রতিনিয়ত অনাহারে মানুষের মৃত্যু দেখেছেন কবি। ঔপনিবেশিক শোষণ যেমন উপহার দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যায় ভেসে গেছে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন। ফলে কুরুক্ষেত্রে উপবাস যাপনের মতোই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে মানুষকে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কবিকে মনে করিয়ে দিয়েছে কৌরব ও পাণ্ডবদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করা যাক –

ক. তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই॥ (আর্য/*পদাতিক*, ১/৪৩)

খ. এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো
বসন্ত গলিতপত্র;
বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ। (স্তালিনগ্রাড/*চিরকুট*, ১/৬৮)

গ. বিড়ম্বিত জীবন আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে
পালাবার নেই কোনো গোপন দুয়ার। (ঘোষণা/*চিরকূট*, ১/৭৮)

ঘ. তবুও যদি হত কোনো মাংসাশী ও মেছো
বেদব্যাস –
বোঝা যেত
ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ-টুদ্ধ!
তা নয়, কে এক বুদ্ধু... (আরে ছা/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৭২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গ সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। কবি যে অস্থির ও অসুস্থ পৃথিবীর বাসিন্দা, তা কেবল কুরুক্ষেত্রের সঙ্গেই তুলনীয় মনে হয়েছে তাঁর। কিন্তু প্রগতিশীল চেতনায় ঋদ্ধ কবি কেবল ক্ষতচিহ্নকে ধারণ করে দিনযাপনের গ্লানিকে সহ্য করতে পারেন নি। তাই যুদ্ধ ও রক্তপাতের মাধ্যমে অপশক্তির পতন ঘটিয়ে সমৃদ্ধ আগামীর পথে অগ্রসর হতে চেয়েছেন তিনি। উদ্ধৃতি ক-এর উপবাসী প্রার্থনায় পৌরাণিক উপবাসের স্বর্গপ্রাপ্তিকে অতিক্রম করে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে দুর্দিনের প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কবি। 'ভীড়গ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত' কবি যখন সংসার সমুদ্রে হালে পানি পাচ্ছেন না, তখন সৈনিক হিসেবে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছেন তিনি। এখানে পৌরাণিক অনুষঙ্গে কবির আধুনিক প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। একই কবিতায় তিনি পাণ্ডব-প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন, 'পাণ্ডববর্জিত দেশ যদ্যপি আমার/তবু বুঝি, কালের জাহাজ/বাণিজ্যবায়ুর হাতে শুধুমাত্র ক্রীড়নক আজ'। উদ্ধৃতি খ-এ স্তালিনগ্রাড যুদ্ধ বিষয়ে কবির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৪২ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১৯৪৩-এর ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যাসিস্ট বাহিনী স্তালিনগ্রাডে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কবি রাশিয়ার জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং তাদের বীরোচিত ভূমিকার প্রশংসা করতে গিয়ে স্তালিনগ্রাডকে কুরুক্ষেত্র হিসেবে চিত্রিত করেন এবং বলেন– 'প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী/দাঁড়ায় নগরদুর্গে।/দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে;/ক্ষিপ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু'(স্তালিনগ্রাড/*চিরকুট*, ১/৬৮)। এখানে পরশু প্রসঙ্গে পৌরাণিক পরশুরামের কথা মনে আসাও অসম্ভব নয়। পরশুরাম যেমন পিতার আদেশ শিরোধার্য করে কুঠারাঘাতে মাতার শিরচ্ছেদ করেন, তেমনি রাশিয়ার জনগণের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে কবি পরশু প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। উদ্ধৃতি গ-এ কবির স্বদেশচিন্তার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গ উল্লেখে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত কবির জন্মভূমিকে শাসন করে রক্তচক্ষু রাজা। ফলে শবের গলিত গন্ধে কবির মনে পড়ে যায় কুরুক্ষেত্রের কথা। ভাণ্ডারে খাদ্য নেই, কারখানায় তালা ঝুলছে আর 'দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিণী/পিছনে করুণমূর্তি পথের কাহিনী/গহন অরণ্য আরাকান' (ঘোষণা/*চিরকূট*, ১/৭৮)। এই বিড়ম্বিত জীবনযাত্রা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজেন না তিনি, সহস্র জনতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন ছড়িয়ে দেন এবং সদম্ভে ঘোষণা করেন, 'এদেশ আমার গর্ব/এ মাটি আমার কাছে সোনা' (ঘোষণা/*চিরকূট*, ১/৭৯)। উদ্ধৃতি ঘ-এ চণ্ডীদাসের 'শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য' কিংবা হরিদাসের 'শুনহ মানুষ সত্য' এই আপ্তবাক্যের বিপরীতে বেদব্যাসের কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ ভ্রাতৃযুদ্ধের প্রসঙ্গই যুক্তিযুক্ত উল্লেখ করে যুদ্ধ ও রক্তপাতের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন কবি। তাঁর মতে– 'জয়হিন্দ্ জিন্দাবাদ যুগযুগজীও/বন্দেমাতরম আর/আল্লা হো আকবর' (১/১৭২)– এই সব প্রাতঃস্মরণীয় উক্তির কোন কার্যকারিতা নেই। এখানে কবির ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আর্তনাদকে আরো মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। এভাবেই কবির স্বদেশ-ভাবনা পুরাণপ্রসঙ্গে অন্যতর মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়।

কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গ উল্লেখের মাধ্যমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে *যা রে কাগজের নৌকো* (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থের 'ঘরে না, বাইরে না' কবিতায় এবং *ধর্মের কল* (১৯৯১) কাব্যগ্রন্থের 'সখা হে' ও 'ধর্মের কল' কবিতাদ্বয়ে। পূর্বালোচিত কবিতাসমূহে কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গ কবির বক্তব্যের কোন বিশেষ অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত কবিতাত্রয়ে মহাভারতের এই ভ্রাতৃযুদ্ধকেই কেন্দ্রীয় বিষয় করে তার আলোকে কবি তাঁর অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

গণ্ডারের মেরুদণ্ড দিয়ে প্রস্তুত অর্জুনের ধনুক গাণ্ডীব প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকে গণবৈপ্লবিক শিবিরের আভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃঘাতী, আত্মঘাতী-আত্মহত্যা প্রবণতার বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার সংগ্রামের পটভূমি তুলে ধরেন (জমিল শরাফী ১৯৭৫ :১২)। গাণ্ডীবের সাহায্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হন অর্জুন। কবি বলেন –

Dhaka University Institutional Repository

আমার হাত উঠছিল না,–

এখন

আমি টান টান করে বাঁধছি

গাণ্ডীবের ছিলা। (পাখির চোখ/*এই ভাই*, ২/১৭২)

চোখের সামনে ভাইবন্ধুদের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন কবি। আততায়ীও আপনজন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে রথ থামাতে বলেন। ব্যক্তিগত বিষাদ এভাবেই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণায়।

আকাশ নয়,

গাছ নয়–

পাখির চোখ ছাড়া

আম যেন আর কিছুই না দেখি॥ (পাখির চোখ/*এই ভাই*, ২/১৭২)

'ঘরে না, বাইরে না' কবিতায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দুই পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কবি তাঁর সময়ের ভারতের জনগণের দ্বিধাবিভক্তিকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন। কবি দেখছেন, 'এক পক্ষে/ তিন লক্ষ অক্ষৌহিণী/ নারায়ণী সেনা' (৫/২৯) যাদের প্রত্যেকেই যোদ্ধা হিসেবে দুর্ধর্ষ এবং অকুতোভয়, যারা শপথ করে ও মরণ পণ করে যুদ্ধে যাওয়ায় 'সংশপ্তক' হিসেবে অভিহিত হয়েছেন। দ্বারকায় বসে দুর্যোধন লোলুপ দৃষ্টিতে আত্মসুখ উপভোগ করেন, কারণ তার বিশ্বাস এদের হাতে অর্জুন বধ হবে। দুর্যোধনের সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। 'এরাও কৃষ্ণের জীব' হলেও কুরুক্ষেত্রে অর্জুন কৌরবপক্ষের সমস্ত সংশপ্তককে বিনষ্ট করেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব– উভয় পক্ষকেই সাহায্য করতে সম্মত হন কৃষ্ণ। এক দিকে কৃষ্ণের দশকোটি দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা ও অপর দিকে নিরস্ত্র ও যুদ্ধবিমুখ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই দুইপক্ষ থেকে যে-কোন এক পক্ষ নির্বাচনের জন্য বয়ঃকনিষ্ঠ বলে আগে অর্জুনকে বেছে নিতে বললে অর্জুন কৃষ্ণকেই বরণ করলেন আর দুর্যোধন নিলেন নারায়ণী সেনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অর্জুনের এই নির্বাচন প্রসঙ্গের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায় –

অন্য পক্ষে

নিরস্ত্র একাকী

যুদ্ধপরাঙ্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

ভূভারতে একালে কেবা কী

তাকালেই বোঝা যাবে।

বোঝা যাবে অর্জুন কী চায়। (ঘরে না, বাইরে না/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/২৯)

এই কবিতায় মূলত কবির যুদ্ধবিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কুরুক্ষেত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যে যুদ্ধ হয়েছে এবং তাতে অর্জুনের যে ভূমিকা, তার বিপরীতে কবি ঘোষণা করেছেন, 'বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ,/যেন কেউ মানুষ মারে না–/ঘরে না, বাইরে না' (৫/৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

'সখা হে' কবিতারও মূল ভাব যুদ্ধবিরোধী চেতনা। কবি তাই অর্জুনের সারথি কৃষ্ণকে, যিনি কেশী নামক দানবকে বধ করায় কেশব নামে বিখ্যাত হন, উদ্দেশ্য করে বলেন –

থামাও রথ, কেশব!
দিয়েছ আমায় তত্ত্বজ্ঞান যেসব
ফুরিয়ে গেছে
দিন তার
নারকী এই কুরুক্ষেত্র ছেড়ে
চাই এবার
পায়ের নিচে মাটি। (সখা হে/*ধর্মের কল*, ৫/২৪১–২৪২)

সমস্ত রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবী জুড়ে 'দর্শন দিক/সমন্বয়, /সুখশান্তি, /যোগক্ষেম, /প্রেম' (৫/২৪২)–এই আশাবাদই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের দুর্দিনে মানুষের হিংস্রতা ও বর্বরতার উলঙ্গ প্রকাশ দেখেছেন কবি। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করবে, এতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু যুদ্ধ যখন দুয়ারে হানা দেয় তখন বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো হারিয়ে যায়। তাই কবি কৃষ্ণকে রথ থামাতে বলেন। কুরুক্ষেত্রকে হৃদয়-বৃন্দাবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার মাধ্যমে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মিথের পুনর্জন্ম ঘটান –

কুরুক্ষেত্রে জন্ম নিক
সখা হে, আজ
এই পুণ্যাহে
দুঃখহরণ চপলচরণ
হৃদয়-বৃন্দাবন। (সখা হে/*ধর্মের কল*, ৫/২৪২)

আর এই বৃন্দাবনে কবি শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খের পরিবর্তে বাঁশি বাজানোর দায়িত্ব দেন । শঙ্কার বদলে সুখের হাসিতে ভুবন ভোলানোর মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতাকে স্পর্শ করার অভিপ্রায়কে কবি সার্থক করে তোলেন পৌরাণিক অনুষঙ্গে।

'ধর্মের কল' কবিতার দুইটি অংশ, প্রত্যেকটি অংশই শুরু হয়েছে পৌরাণিক চরিত্রের সংলাপ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে। প্রথম অংশে বসুদেব-এর সংলাপ –

> হে ধনঞ্জয়! যারা রাজারাজড়া আর দৈত্যদানবদের হারিয়েছে, তাদের না দেখেও আমি বেঁচে আছি। যে সাত্যকী আর প্রদ্যুম্ন ছিল তোমার প্রিয়শিষ্য, বৃষ্ণিবংশের জাঁহাবাজ বীর, এমন কি খোদ বাসুদেবেরও প্রিয়পাত্র– তাদেরই দুর্নীতিতে যদুকুলের এই ক্ষয় (৫/২৪৬)।

কৃষ্ণের পিতা বসুদেব ধনঞ্জয় বা অর্জুনকে যদুবংশের ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করছেন। অর্জুনের দুই প্রিয় শিষ্য সাত্যকী ও প্রদ্যুম্ন ছিলেন যদুবংশের প্রবল পরাক্রমশালী বীর। এরা বাসুদেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাত্যকী অর্জুনের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ লাভ করতে সক্ষম হন। প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বীরযোদ্ধা ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে কৃষ্ণের সহায়তা করেন। আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার সময় প্রদ্যুম্নও নিহত হয়। এই পৌরাণিক চরিত্রসমূহকে বিবেচনায় রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সময়কে চিত্রিত করেছেন। সুবিধাবাদী মানুষের তৎপরতা যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবনের মূল্যও গেছে কমে। মুখোশধারীরা নিজেদের আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত। যদুবংশের আত্মকলহ ও অপতৎপরতা যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছে, তেমনি এক দুঃসময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আর কোন অর্জুনের আবির্ভাব সম্ভব নয়– এ বিষয়ে কবি নিশ্চিত। তাই তিনি বলেন –

'ভো ভো পুরবাসিনীরা!
দ্বারকায় এখুনি এসে পড়বেন তৃতীয়পাণ্ডব
মা ভৈঃ মা ভৈঃ!'
কে আসবে? তৃতীয় পাণ্ডব!
ধ্যুস,
উনি যে গাণ্ডীব তুলবেন, সে ক্ষ্যামতাও তো ওঁর আর নেই ॥ (ধর্মের কল/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৭–২৪৮)

দ্বিতীয় অংশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যাসদেব-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন । মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস অর্জুনের অন্তিম মুহূর্ত অর্থাৎ মহাপ্রস্থানের সময় যে বক্তব্য প্রদান করেন, তা-ই এখানে উল্লেখ করেছেন –

'হে পার্থ! সময় সহায় হলে সুবুদ্ধি, তেজ, অনাগতদর্শন– যা হওয়ার সবই হয়। আবার অসময়ে সবই খোয়া যায়। কালই জগতের বীজস্বরূপ! কাল বলবান হয়েও ক্ষমতা হারায়, প্রভু হয়েও হয় পরের আজ্ঞাবহ। তোমার অস্ত্র তার স্বস্থানে ফিরে গেছে। এবার তুমি মহাপ্রস্থানে যাত্রা করো' (২/২৪৮)।

মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন ও দ্বিতীয় পুত্র দুঃশাসন অপরাধ ও অপকর্মের এবং শোষণ ও নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখিত হয়ে আসছে। কৌরবদের অত্যাচারে পাণ্ডবদের জীবনে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শোষকশ্রেণীও তেমনি সাধারণ মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করেছে বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাদেরকে দুর্যোধন-দুঃশাসনের বংশধর হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত –

ক. স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক !
দুঃশাসনের পাঁজর খসাবো, গা থেকে খুলবো চামড়া। (উনত্রিশে জুলাই /*চিরকুট*, ১/৭৪)

খ. দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের
ভিৎ পড়ো-পড়ো
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা
নাঙ্গারা জড়ো। (জবাব চাই/*চিরকুট*, ১/৭৫)

গ. অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাত উপ্‌ড়ে আনে
দুঃশাসনের ভিৎ। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৫)

গ. দ্বারকায় ব'সে দুর্যোধন
চেটে নেয় জিভ –
আজ তার প্রাণে বড় সুখ। (ঘরে না, বাইরে না/ *যা রো কাগজের নৌকো*, ৫/২৯)

ঙ. গর্জে শুধু বর্ষে না যে
লাগে না সে কোনো কাজে
যাত্রাতেই যা ভীমের সাজে
ভাঙে দুর্যোধনের উরু। (অনেকের গান/ *যা রো কাগজের নৌকো*, ৫/৪৭)।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতে শকুনির ভূমিকা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গান্ধারীর ভাই ও দুর্যোধনাদির মামা শকুনি দুর্যোধনের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় দুর্যোধনেরা নানা অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতেন । অভিজ্ঞ দ্যূতক্রীড়ক এবং কপট ক্রীড়ায় পারদর্শী হিসেবে তিনি পাণ্ডবদের সবকিছু জয় করেন এবং পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে বনবাসে প্রেরণ করেন। মূলত তাঁরই পরামর্শে দ্যূতক্রীড়ার সভাস্থলে দ্রৌপদীর অবমাননা হয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সময়ের শঠ, স্বার্থপর, দুষ্টবুদ্ধি, বিবেকহীন, ভয়ঙ্কর মানুষ এবং কুটিল ও ষড়যন্ত্রকারী সম্প্রদায়কে তুলনা করে শিল্পসফল রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে শকুনি এবং শকুন প্রসঙ্গ ব্যবহার করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মূলত সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল আগামীর পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ও শ্রেণীশত্রুকে সনাক্ত করে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। নিচের দৃষ্টান্তসমূহে ব্যবহৃত শকুনি ও শকুন-প্রসঙ্গে তাঁর প্রগতিচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে –

ক. এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে :
শকুনির নখরে নখরে
উন্মত্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৫৯)

খ. শকুনিচক্রের বুক কাঁপে।
অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬০)

গ. দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ,
রক্তচক্ষু রাজার শাসন–
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,
মুঠোয় শিথিল সিংহাসন; (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৭–৭৮)

ঘ. কুঠিয়াল এক সাহেবের লাশে
শকুনি খায় ছিঁড়ে
লুণ্ঠনকারী পঁচিশটা যুগ
সাম্রাজ্যের নেশাতুর চোখ থেকে। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৬)

ঙ. ফাঁসিকাঠ জেল গ্যাস-গুলি ঠেলে
অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে
শকুনের চোখ গেলে দিই
চলো
সুখে শান্তিতে বাঁচি। (বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৬)

চ. শকুনের মুখে হাসি ফুটিয়ে
নতুন কার
লাশ পড়বে ভাগাড়ে (ভগ্নদূত/ *যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪২)

বাঘ ডেকেছিল (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের 'খালি পুতুল' কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শকুন কিংবা শকুনির বহুবর্ণিল চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। যে শহর ষড়যন্ত্রকারীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য সংঘবদ্ধ শক্তিতে গর্জে ওঠে না, তা কবির বিবেচনায় 'মৃত শহর'। সেখানে শকুনরূপী স্বার্থপর, হিংস্র মানুষেরা উৎসবে মেতে ওঠে। অন্তঃসারশূন্য দেশপ্রেমীদের 'কামানবন্দুক গোলাগুলি' মাঝে মাঝে 'ধর্মের কল বাতাসে নাড়ার ভঙ্গিতে' বেজে

Dhaka University Institutional Repository

উঠলেও এইসব কলের পুতুলের শীঘ্রই দম ফুরিয়ে যায়, আর শুরু হয় শকুনিদের হিংস্রতার প্রদর্শনী। বামপন্থী রাজনীতিবিদদের দোলাচলতায় কবির ক্ষোভ শাণিত ব্যঙ্গে প্রকাশিত হয় যখন তিনি 'ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের সহযোগে' মেকি স্বদেশপ্রেমের পরিচয় তুলে ধরেন। সুভাষ তাঁর সময়ের রাজনীতিবিদদের মানসিক দৈন্য তুলে ধরতে গিয়ে দেখেছেন, কেবল রাজনীতিতে নয়, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধেও ফাটল ধরেছে। ফলে শকুনিদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত মানুষগুলোকে তাঁর মনে হয়েছে 'দাঁতমুখ খিঁচিয়ে/প'ড়ে আছে মানুষের পোশাক-পরা/একরাশ পুতুল' (৪/১৮৫)। নিচের উদাহরণগুলোতে শকুনদের দৌরাত্ম্যে কবির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে –

ক. মৃত শহরটাতে জমবে খাসা
বুড়ো শকুনদের মচ্ছব (খালি পুতুল/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮৪)

খ. শকুনিরা ঠিক তখনই
বাইরে বেরিয়ে এসে

মৃত শহর জুড়ে
দাঁত আর নখের খেলায়
বুড়ো হাড়ে দেখাবে ভেল্‌কি (খালি পুতুল/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮৪)

ঘ. খেল যেই খতম
বুড়ো শকুনেরা আর সেখানে থাকে? (খালি পুতুল/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৮৫)

মহাভারতে 'দধীচি' কঠোর ও কঠিন তপস্যার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। বৃতাসুরের আক্রমণে অতিষ্ঠ স্বর্গবাসীরা যখন জানতে পারেন, একমাত্র দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রেই বৃতের নিধন সম্ভব, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দধীচির নিকট গিয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে দধীচির পূর্ব শত্রুতা থাকলেও তা ভুলে গিয়ে উদারচেতা দধীচি দেবতাদের উপকারসাধনে প্রাণবিসর্জন দেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাড়কে দধীচির হাড়ের সঙ্গে তুলনা করে এই প্রাণ দানকে মহৎ কর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং এই মর্মে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের এই আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। নিচের উদ্ধৃতিদ্বয়ে কবির এই প্রগতিচেতনার প্রকাশ পুরাণপ্রয়োগে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে –

ক. দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার–
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার ॥ (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬১)

খ. গুপ্তকক্ষে ব'সে ব'সে নিজের অস্থিতে
বজ্র যেন বানাচ্ছে দধীচি। (কাল মধুমাস /*কাল মধুমাস*, ২/১৬২)

যা রে কাগজের নৌকো (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থের 'সপ্তাহ প্রতিদিনই' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। মহাভারতে দধীচির শিবভক্তির অনন্য উদাহরণ দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে তাঁর অনুপস্থিতি। বৃতাসুরের আক্রমণ থেকে স্বর্গচ্যুত দেবতাদের মুক্তির জন্য নিজের অস্থি থেকে বজ্র নির্মাণে সম্মত হয়ে তিনি পরম

Dhaka University Institutional Repository

পূজিত হয়েছেন। অর্থব মুনির ঔরসে কর্দমকন্যা শান্তির গর্ভে জাত এই ঋষির আত্মদানের কাহিনীর সঙ্গে অপশক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণদানকারী মানুষকে চিত্রায়িত করে কবি মূলত তাঁদের আত্মত্যাগকে গৌরবান্বিত করেছেন। সুভাষের মতে, এই আত্মদান অব্যাহত ধারায় চলছে। শোষক ও নিপীড়ক যেমন নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে মানুষের অধিকার খর্ব করে চলেছে, তেমনি আমাদের চোখের আড়ালে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিদিন জন্ম নেয় দধীচি, এবং –

বিনা নামে বিনা অর্থে
বিনা যশে
সে বজ্র বানিয়ে যায়
নিজের অস্থিতে (সপ্তাহ প্রতিদিনই/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪৬)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মহাভারতের নানা চরিত্র ও অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে তাঁর শিল্পদৃষ্টির কেন্দ্রীয় চারিত্র্যকে প্রাণস্পর্শী করেছে। পৌরাণিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও তিনি অন্বেষণ করেছেন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রমণের পথনির্দেশ। প্রগতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁর এই শিল্পদৃষ্টির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে –

ক. ধরা পড়ে গিয়ে
মহাভারতের
সপ্তরথীর ব্যূহে (ডাইনে বাঁয়ে/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৯)

খ. দ্রোণাচার্য তুচ্ছজ্ঞানে
নেন নি ভাগ্যিস
বাল্যে বুড়ো-আঙুল দক্ষিণা (কাল মধুমাস /*কাল মধুমাস*, ১/১৫৩)

গ. একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ
যীশুখ্রীষ্ট।
অন্যটিতে
হেলায় করেন কর্ণ মৃত্যুকে বরণ
রথের চাকায় হাত রেখে। (সাধ/*একটু পা চালিয়ে*, ভাই, ৩/১৯৫–১৯৬)

ঘ. কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আর যাই হোক সব
ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়! (ছেলে ধরা/*জল সইতে*, ৩/৩৩৭)

ঙ. ধম্মপুত্তুর দারোগা
বাগে পেলে মারে ঘা॥ (রক্ষাকবচ/*জল সইতে*, ৩/৩৪৫)

চ. দেশের মাটিতে গড়াগড়ি যায়
সুলতান, রাজারাজড়া, উজির, শিখণ্ডীদের মাথা। (অগ্নিকোণ/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৬)

উদ্ধৃতি ক-এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে বধকারী সাত রথারোহী বীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন- এর প্রসঙ্গ স্মরণ করে বামপন্থী নেতাদের সুবিধাবাদী আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি। 'বাঁয়ে আনতে না আনতে দেখছি/একেবারে সাফ ডাইনে' (১/১৪৯) – এই যখন তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অবস্থা, তখন ডানপন্থীদের কণ্ঠে শোনা যায়, 'বাঁদিকে যাওয়া বেআইনী'। আকাশ-কুসুম

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনায় মগ্ন বামপন্থীদের দেখে কবির অভিমন্যুর অসহায়ত্বের কথা মনে পড়ে। উদ্ধৃতি খ-এ উল্লেখিত হয়েছে মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য প্রসঙ্গ। দ্রোণ তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করার জন্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সক্রিয় হাতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এই রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃতি গ-এ যীশুখ্রীষ্টের ছবির পাশে কর্ণের জীবনাবসানের দৃশ্য স্থাপন করেছেন কবি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের অভিশাপে দিব্যাস্ত্র-বিস্মৃত কর্ণের রথচক্র মাটিতে আটকে যায় এবং এই সুযোগে অর্জুন তাঁর শিরোচ্ছেদ করেন। বিধিবহির্ভূত জন্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে কবি যীশু ও কর্ণ– এই দুজনকে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করেছেন। উদ্ধৃতি ঘ এবং উদ্ধৃতি ঙ-তে পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকজ-উক্তি ও ব্যঙ্গার্থে 'ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' হিসেবে গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃতি চ-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে। দেশি ও বিদেশি শাসকবর্গের পাশে ভীষ্ম-বিদ্বেষী শিখণ্ডীর পতনের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডী অর্জুন কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিলেন এবং অশ্বত্থামার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। এখানে কবি শিখণ্ডী প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থকদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ 'ভূশুণ্ডী' পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাপরম্পরার সাক্ষী হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পারিবারিক আবহে স্থাপন করে চমৎকার রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। সংসারে অনাদ্রিত কালো মেয়ের কষ্ট আরো মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে যখন কবি গল্পের ছলে তার দেবরের বখাটেপনার পরিচয় দেন –

> মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে ব'সে
> রাস্তায় মেয়ে দেখছে:
> ফরসা ফরসা মেয়ে
> বউদির মতো ভূষুণ্ডি কালো নয়। (মেজাজ /*যত দূরেই যাই*, ২/৯৯)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মহাভারত-প্রসঙ্গ নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে তাঁর শিল্পভাবনায় যেমন সমৃদ্ধি এনেছে, তেমনি ঐতিহ্য-অনুসন্ধানের প্রযত্ন প্রয়াস তাঁর কবিতাকে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আধুনিক যুগ ও জীবনপ্রেক্ষিতকে তিনি সমন্বিত করেছেন মানবচেতনায় বদ্ধমূল মিথ-ঐতিহ্যের সঙ্গে।

রামায়ণের কোন কাহিনী কিংবা চরিত্র অবলম্বন করে কবিতার বক্তব্য নির্মাণেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শেকড়-সন্ধানী শিল্পদৃষ্টি রামায়ণের নানা উপাদান-অনুষঙ্গ নিয়ে নির্মাণ করেছে আধুনিক জীবন-চেতনায় ঋদ্ধ এক বর্ণিল শিল্প-ভাণ্ডার। কালের চিহ্নকে ধারণ করার দায়িত্ব এড়িয়ে যান নি তিনি। এমনকি ঐতিহ্যের সঙ্গেও ছিন্ন হয় নি তাঁর সম্পর্ক। বরং যে জটিল কালখণ্ডের সাক্ষি তিনি, তাঁর নানা অর্জন ও বিসর্জনকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এই শিল্পনিষ্ঠাই তাঁকে পৌরাণিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধ তৈরিতে অনুপ্রাণিত করেছে, যা ভবিষ্যতকেও স্পর্শ করতে সক্ষম। এই বিবেচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রামায়ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় রামায়ণের স্রষ্টা বাল্মীকির রামায়ণ রচনা প্রসঙ্গ এবং রামকে বনবাসে পাঠিয়ে 'দশরথের পুত্রশোকের স্বল্পায়ু'কে ব্যঙ্গ করে তাঁর সঙ্গে প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় যুবসমাজের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। যৌবনে দশরথ শিকারে গিয়ে গভীর রাতে কলসে জলপূর্ণরত এক মনিকুমারকে জলপানরত হস্তী ভেবে শব্দভেদী বাণে নিহত করেন। উক্ত মুনিকুমারের অন্ধ পিতা দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু দশরথের পুত্রশোক দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কবি বলেছেন, 'রাম তো গেলেন বনে।/দশরথ বাপ/দুঃখ যা পেলেন মনে/ছ' রাত্রেই সাফ' (ছেলে গেছে বনে, ২/২১১)। দশরথ স্ত্রী কৈকেয়ীর প্রার্থনা অনুযায়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন। দশরথের এই দুর্বলতাকে কবি ব্যঙ্গ করেছেন–

আমি নই স্ত্রীর বশ
ইক্ষ্বাকু বংশের সেই ভগ্নস্নায়ু দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা।
মুখ বুঁজে সগৌরবে আমি বই কালের এ সাজা। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২২)

স্বৈরশাসকের দমন-পীড়ন-নির্যাতনের ভয়ে পলাতক প্রগতিকর্মীদেরকে রামের বনবাসের সঙ্গে তুলনা করলেও রামের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তিনি মনে করেন, কোন অন্ধ মুনির অভিশাপের প্রয়োজন নেই, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অন্ধ শাসকের নিষ্পেষণের এই নির্মম, নিষ্ঠুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনায়াসে আরো একটি রামায়ণ লেখা যায়। কোন দৈব নির্দেশে নয়, কবি অন্তরের তাগিদেই প্রিয় মানুষের ছন্নছাড়া জীবনকে পৌরাণিক রূপকল্পে চিত্রায়িত করেছেন। কবি মনে করেন, ঋষি বাল্মীকি নয়, দস্যু রত্নাকরই এই মর্মঘাতী নিপীড়নকে রুখে দেয়ার প্রেরণা হতে পারে। *ছেলে গেছে বনে* [১২] (১৯৭২)-এর নাম কবিতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে মিথ বিবেচনায় কবির আধুনিক জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় –

ক. ভাবতেও অবাক লাগে, এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সাতকাণ্ড বানিয়ে
কী করে গেলেন তরে কঠিন এ সংসারে বাল্মীকি!
আমি যদি লিখি,
নিয়তিকে করতে আজ্ঞাবহ,
মিথ্যে অন্ধ মুনিকে টানব না। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২১১)

খ. জল ভরবার শব্দে বাণ ছুঁড়ে আমি নই ভুলক্রমে খুনী;
আমাকে দেয় নি শাপ
শোকগ্রস্ত কোনো অন্ধ মুনি। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২১-২২২)

গ. কাছে এস রত্নাকর, দূর হটো বাল্মীকি ॥ (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় রামায়ণের রামকে নানা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তবে রামের প্রতি প্রচলিত শ্রদ্ধাবোধে নত হন নি তিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাম সাধারণ লোকজ-উক্তি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। কখনো কখনো দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন শাসক ও দায়িত্বহীন স্বামীর দৃষ্টান্ত হিসেবেও রামকে উল্লেখ করেছেন কবি[১৩]। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করলে দেখা যাবে, সুভাষের শিল্পভাবনায় পরনির্ভর রাম অনেকটা অনুজ্জ্বল, বিমর্ষ –

ক. 'রাম রাম–
একটু তেল চাই কামানের চাকায়।' (রাম রাম/*অগ্নিকোণ*, ১/ ৯১)

খ. চোখে কালো ঠুলি, মুখে বাঁধাবুলি
বামে হো, বামে হো, বামে হো
গোলে হরিবোলে টেনে নেয় কোলে –
রামা হো, রামা হো, রামা হো॥ (দেয়ালে লেখার জন্যে/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

গ. এত রাত্রে কে যায়?
–ভাইরে, আমি রাম:
আমি রহিম ॥ (অগ্নিগর্ভ/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৮)

ঘ. রাম রাম, এ ছি!
মার্জনা করবেন, প্রভু, অধীনের এ অবিমৃশ্যতা। (ছেলে গেছে বনে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২১১)

ঙ. পরক্ষণে মনে হবে, রাম রাম
লোকটা তো আমারই বয়সী। (কাল মধুমাস /*কাল মধুমাস*, ২/১৫৫)

চ. 'আরে রামো রামো
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন মিছে ঘামো–
তার চেয়ে এসো
নিয়ে যাও এই নোটটা।' (সর্ষে/*এই ভাই*, ২/২০৩)

উদ্ধৃতি ক-তে ভারতের তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য শোষক শ্রেণীর হিংস্রতাকে রূপায়ণ করতে গিয়ে কামান সক্রিয় করার প্রসঙ্গে পৌরাণিক রামের স্মরণ নেয়া হয়েছে। বামপন্থী রাজনীতিবিদদের একচোখা নীতিকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বামের সঙ্গে রামের নাম উচ্চারিত হয়েছে উদ্ধৃতি খ-এ। উদ্ধৃতি গ-এ হিন্দু-মুসলমান মিলনের দৃষ্টান্ত হিসেবে রাম ও রহিমকে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা হয়েছে। রাম-প্রসঙ্গ বাকি উদ্ধৃতিগুলোতে রামভক্ত মানুষের বিশ্বাসপ্রসূত বিশেষ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, এতে ভিন্নতর কোন তাৎপর্য যোজিত হয় নি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সীতার প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। তবে *ধর্মের কল* (১৯৯১) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় সীতা-চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে। এখানে সীতা হৃত-ঐশ্বর্য স্বদেশের বিষণ্নতাকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। জন্মভূমির সম্পদ ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের জন্য কবির সতর্ক প্রয়াস চোখে পড়ার মতো –

বনবাসে এলোচুলে
দুঃখিনী মা আমার! আমি আসছি
হাওয়ার উজানে বুক টান ক'রে
মাটিতে পা টিপে টিপে (ধর্মের কল/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৯)

কখনো কখনো সীতা ও রাম প্রসঙ্গ একই সঙ্গে উচ্চারিত হলেও তা কোন বিশেষ কোন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি –

ঝুমকোলতা রাঙচিতা।
দণ্ডকবনে রাম সীতা ॥ (৪২/ মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো, ৫/২৯৯

রামায়ণে লক্ষ্মণ সৌন্দর্য, দায়িত্বশীলতা ও ভ্রাতৃভক্তের অনুপম উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত। সীতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। রামের বৈমাত্রেয় ভাই হলেও লক্ষ্মণ সীতা ও রামের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি রামের বনবাসকালে তাঁর সহগামী ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় লক্ষ্মণ-প্রসঙ্গ অসাধারণ শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে –

Dhaka University Institutional Repository

ক. রাক্ষসদের হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ
থমকে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে
রামলক্ষ্মণের চুলোচুলি। (ভালো লাগছে না/*এই ভাই*, ২/১৯৫)

খ. সে চেয়েছে বেঁধে দিতে
সমস্ত গতিবিধি
লক্ষ্মণের খড়ির গণ্ডিতে (যম-যমী সংবাদ/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/১৮)

গ. মা-লক্ষ্মীদের জন্যে কাটা হচ্ছে
লক্ষ্মণের গণ্ডি
তার বাইরে পা দিলেই রাক্ষসে ধরবে (ধর্মের কল/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৭)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ে লক্ষ্মণ-প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে কবিতায় দূরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা এনেছে। উদ্ধৃতি ক বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ করে তুলেছে ভ্রাতৃযুদ্ধকে। যারা সংঘবদ্ধ হলেই অপশক্তিকে চিরতরে পরাজিত করতে পারতো, তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধে লিপ্ত। তাই দেখে সুযোগ সন্ধানীরা করতালি দিচ্ছে। কবি কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করছেন, 'আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে/ভিয়েতনামকে ভাই বলছি' (২/১৯৫)। তাঁর মতে, রামলক্ষ্মণের মিলিত প্রয়াসেই আসবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। উদ্ধৃতি খ এবং উদ্ধৃতি গ রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনবাসকালে লক্ষ্মণ কর্তৃক অঙ্কিত সীতার নিরাপত্তা বেষ্টনী-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি মানুষের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টিকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় রাবণ-প্রসঙ্গ গভীরতর তাৎপর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের নির্মম নির্যাতনকে রাবণের চুল্লির রূপকল্পে ব্যবহার করে তিনি বাঙালির আত্মদানের ইতিহাসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পাকসেনাদের গুলিতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ সারিবদ্ধ মানুষ–এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন কবি –

রাবণের চুল্লির সামনে লাইনবন্দী হয়ে
ধর্না দিচ্ছে
লালগাড়ি-পাশ-হওয়া
ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ
অপাপবিদ্ধের দল (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৯)

রাবণ-পুত্র বীরবাহু নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে কবির স্বদেশচিন্তায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন, 'এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত/আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা' (ঘোষণা/*চিরকুট*)। সূর্যোদয়ের স্বপ্নে কবি ঘোষণা করেছেন –

মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব
দিগন্তে দিগন্তে দেখি বিস্ফোরিত আসন্ন বিপ্লব। (ঘোষণা/*চিরকুট*, ১/৭৮–৭৯)

রাবণের অন্যতম অনুচর ভস্মলোচন সহস্র বছরের তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে যে বর লাভ করেন, তাতে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেই ভস্মিভূত হয়ে যান। ভস্মলোচন এখানে শোষক ও নিপীড়কের নির্মম পরিণতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে –

ক. রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে। (একটি কবিতার জন্যে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৮)

খ. হাত পড়ছে
বেবাক ব্যথার জায়গায়
হাত পড়ে না কী জানি কেন
ভস্মলোচনের গায় (হাল ছাড়া/*ধর্মের কল*, ৫/২২৯– ২৩০)

উদ্ধৃতি ক-এ সমৃদ্ধ-উজ্জ্বল-আলোকিত আগামীর জন্য কবির প্রতীক্ষা পৌরাণিক-প্রসঙ্গে নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। যারা পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, নরকের উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘরে ঘরে, তাদেরকে কবি ভস্মলোচনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উদ্ধৃতি খ-এ কলকাতার ভস্মলোচন আপাতত নিরাপদ, কারণ আত্মকেন্দ্রিক মানুষ মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারছে না। ফলে শোষণের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ দেখছেন না কবি। ভস্মলোচনের এই নিরাপদ জীবনযাত্রায় কবি নিজেই যেন দগ্ধ হচ্ছেন।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে কবির অভীপ্সার রূপায়ণ সম্ভবপর করে তোলে। জীবনের যে প্রান্তে আলোক সঞ্চারে তাঁর আগ্রহ, পুরাণ সেই প্রান্তের বন্ধুরতাকে অতিক্রমে অবদান রাখে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে রামায়ণের নানা চরিত্র ও ঘটনার ইঙ্গিত থেকেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টি ও জীবনবীক্ষার মৌল প্রবণতা অনুধাবন করা যাবে –

ক. সম্মুখে দাঁড়ানো কোন্ ভবিষ্যত,
কোন্ প্রতিশ্রুতি?
হাতে দুঃখহরা কোন্ বিশল্যকরণী? (বর্ষশেষ/*চিরকুট*, ১/৭০)

খ. অহল্যা পাথরে মাথা ঠুকে যারা করেছ দুখানা
কাস্তে ও হাতুড়ি (নিয়ে যাব শহর দেখাতে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৫)

গ. দেয়ালে পা ফাঁক ক'রে চোখ-মারা তারকা-রাক্ষুসি!
দোকানে শো কেসে স্টলে সাজাও যা খুশি। (নিয়ে যাব শহর দেখাতে/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৪৫)

ঘ. ময়দানবেরা সব তাঁবু ছেড়ে এসে
দে-গোল দে-গোল ব'লে ধরবেই ঠেসে। (ময়দানব/*ধর্মের কল*, ৫/২৫৮)

ঙ. এক টুক, দুই টুক, তিন টুক
ভাগ ক'রে পিঠে খায়
কালনেমি হিংসুক (এক দুই তিন/*ধর্মের কল*, ৫/২৬০)

Dhaka University Institutional Repository

চ. মুণ্ডগ্রীবাহীন এক নির্বোধ কবন্ধ,
উদরে যার মুখ,
আর সেই মুখমণ্ডলে বসানো
অগ্নিবর্ষী একটিমাত্র চোখ (অন্ধকারে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৮১)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। উদ্ধৃতি ক-এর 'বিশল্যকরণী' শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদকে বোঝালেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এখানে ভয়াবহ বর্তমানে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং এই মর্মঘাতী ব্যাধির নিরাময়ের উপায় অন্বেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। উদ্ধৃতি খ-এ ব্রহ্মার মানসী কন্যা অহল্যার গৌতমের অভিশাপে পাথর হয়ে যাওয়া এবং রামচন্দ্রের স্পর্শে শাপমোচনের কাহিনী প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় স্বার্থান্ধ শ্রেণীর সঙ্গে প্রগতি আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টিকারীদেরও সমালোচনা করেছেন। উদ্ধৃতি গ-এ সুকেতু যক্ষের কন্যা তাড়কা-রাক্ষসী রূপী পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের প্রভাবে অগস্ত্য মুনির তপোবন সদৃশ এই বাংলাদেশের দুরবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন কবি। কারণ, কবিরও 'মুক্তিযুদ্ধে/ শিরায় শিরায় নেচে ওঠে রক্তনদী' (২/২৪৪)। উদ্ধৃতি ঘ-এর 'ময়দানব', উদ্ধৃতি ঙ-এর 'কালনেমি' এবং উদ্ধৃতি চ-এর 'কবন্ধ' অশুভ দানব ও রাক্ষসরূপী মানুষকে রূপায়িত করেছে। কবি দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অশুভ শক্তির কাছে মানুষের অসহায়ত্ব চিত্রিত করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রামায়ণপ্রসঙ্গের বহুমাত্রিক প্রয়োগ ঘটেছে। প্রগতিচেতনার ধারক হিসেবে পুরাণ নির্বাচনেও তাঁর সতর্কতা চোখে পড়ার মতো। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শক্তিকে যেমন তিনি পৌরাণিক অনুষঙ্গে চিত্রিত করেছেন, তেমনি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে নিবেদিত মানুষের উদ্যম ও উদ্যোগ পুরাণপ্রসঙ্গে হয়েছে দূরসঞ্চারী।

হরি বা নারায়ণ বা বিষ্ণু ভক্তরা নানা উপলক্ষে দেবতার নাম করে মানসিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনের নানা প্রান্তকে স্পর্শ করার প্রয়োজনে মানুষের এই বিশ্বাস ও তার বহিঃপ্রকাশকে ধারণ করেছেন কবিতায়। হরি-নামের সঙ্গে টাইপের শব্দ তিনি অনায়াসে জুড়ে দিতে পারেন। তিনি হরিভক্ত পাখির কথা যেমন বলেন, তেমনি শব-যাত্রার বর্ণনা দিতেও ভোলেন না। নিচের উদ্ধৃতিগুলোতে হরির বর্ণিল প্রকাশ চোখে পড়ার মতো –

ক. হরিসভার কানে তালা ধরিয়ে
টাইপ শেখার স্কুল (কে যায়/*এই ভাই*, ২/১৮৩)

খ. অষ্টপ্রহর হরিনাম-করা-পাখির খাঁচাটা
একা এককোণে দুলছে। (এক অসহ্য রাত্রি/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৬)

গ. বলহরি হরিবোলে
আরো একদল এসে কাঁধ থেকে ইতিমধ্যে নামাল খাটিয়া। (ছিন্নভিন্ন ছায়া/*এই ভাই*, ২/১৯৭)

সর্ব সম্পদে সফলা, সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মীর নাজেহাল অবস্থা চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে কবি মূলত অসহায়, দরিদ্র, বুভুক্ষু

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মর্মবেদনাকে প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্মীর ভক্তদের উৎপাতে সরস্বতীর বেহাল অবস্থাকে চিত্রায়ণের মাধ্যমে কবি ধনের প্রভাবে জ্ঞানের কদর হ্রাস পাওয়াকে চিত্রিত করেছেন। কখনো আবার ভাইয়ের জন্য বোনের অপেক্ষার মাঝখানে লক্ষ্মী আসেন সান্ত্বনার আশ্বাস হয়ে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি –

ক. লক্ষ্মী,
ক্ষিধে পেলে ফুটপাথে চিৎ হয়ে
দে উড়িয়ে পক্ষী। (রাস্তার গল্প/*ফুল ফুটুক*, ১/১৩৪)

খ. লক্ষ্মীর পা মাড়ায় কেটা
হ্যাদে, মোড়ল-পো না? (আওনি বাওনি চাওনি/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৪)

গ. লক্ষ্মীর চেলামুণ্ডাদের উৎপাতে।
সরস্বতী দাঁড়ান এসে ফুটপাতে ॥ (কিংবদন্তী/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৪)

ঘ. ভাই এনেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি,
খুলে ফেলেছে ডালা (ফোঁটা/*কাল মধুমাস*, ২/১৩২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গের সাবলীল ব্যবহারে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। সহজ-সাধারণ-নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ের সঙ্গেও তিনি পুরাণ-কথার প্রাণবন্ত অনুষঙ্গ জুড়ে দিতে পারেন। ফলে কথ্যভঙ্গির শব্দবন্ধও হয়ে ওঠে গভীরতর ভাবের দ্যোতক। বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি বরুণদেবকে আহ্বান করেন– 'হে জলের দেবতা/তুমি কোথায়?' (জল আসুক/*এই ভাই*, ২/১৮৫)। তিনি তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পৌঁছে দিতেও বিশ্বকর্মার স্মরণ নেন –

আজ বাদে কাল
বিশ্বকর্মা
বৈঠকখানায়
পৌঁছোয় ফর্মা (যা রে কাগজের নৌকো/ *যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৭)

সাধারণ প্রতিবন্ধকতা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে প্রগতিপ্রত্যাশীদের হাল ছেড়ে দেয়ার ঘটনায়ও তিনি বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন– 'হল যেই ইন্দ্রপতন/ঘটে এ কী ঘোর অঘটন' (মুক্তকণ্ঠে বহুবচনে/*ধর্মের কল*, ৫/২২২)।

মায়ের প্রতি সন্তানের অপ্রকাশ্য ভালোবাসার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের তুলনা করে কবি জন্মভূমির মাটির স্মৃতি দশ আঙুলে জড়িয়ে নেন। দেশের প্রয়োজনে আত্মাহুতি দেয়ার উৎসব তাঁর ভাষায় হয়ে ওঠে পৌরাণিক যজ্ঞ –

যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে
আমরা বিরক্ত। (জননী জন্মভূমি/*কাল মধুমাস*, ২/১৩০)

পৌরাণিক কৃষ্ণকে আমরা দুই রূপে, দুই মূর্তিতে দেখি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রধান হয়ে উঠলেও বংশীবাদক প্রেমিক কৃষ্ণকেও তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের প্রতীক রাধাকেও, যে কেবল বন্ধন হয়ে আসে, ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সীমাকে যে অতিক্রম করতে পারে না, তার আহ্বান উপেক্ষা করেন কবি –

Dhaka University Institutional Repository

বলো পাখি কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গিয়ে বলো
রাধে রাধে রাধে

তার কাছে
না, আমি যাব না (তার কাছে/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৭৮)

কবি তার কাছে যেতে চান, যে সমস্ত যন্ত্রণা নিজের করে নিয়ে প্রাণ খুলে হাসে, যে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজে বাঁচে এবং অন্যকে বাঁচায়। কারণ, কবির ভাষায়, 'সে বেঁধে দিয়ে ছাড়ে/এবং যতটা পারে/ছেড়ে দিয়ে বাঁধে' (তার কাছে/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৭৯)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্যের ব্যবহার তেমন নেই। কবি যদিও বলেছেন– 'শোনো/কোরাণের সুরার সঙ্গে/উপনিষদের মন্ত্র,/সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গে/ভোরের আজান/একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে॥' (একাকার/*বাঘ ডেকেছিল*, ৪/১৬৭), তবুও ইসলামি মিথ-ঐতিহ্যের প্রতি কবির আগ্রহ তেমন চোখে পড়ে না। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে কবির ইসলামী মিথ ও ঐতিহ্য শিল্প-সফল পরিণতি লাভ করেছে –

ক. হায়-হাসান হায়-হোসেন
হায়-হাসান হায়-হোসান ব'লে
বুক বাজাতে বাজাতে চলেছে আমার ভাই (মর্সিয়ার পর/*কাল মধুমাস*, ২/১২৭)

খ. ইস্রাফিল, শিঙা তোর বাজা। (সাজা চাই/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২৩)

গ. বদর বদর ব'লে, ও ভাই
নোঙর নিই তুলে (যা রে কাগজের নৌকো/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/৫)

উদ্ধৃতি ক-এ ইসলামি ঐতিহ্য মহরম-এর মিছিল চিত্রিত হয়েছে। কারবালার ট্রাজেডির রূপকল্পে কবি নির্মাণ করেছেন 'নতুন জীবনের/বীজমন্ত্র' (২/১২৮)। উদ্ধৃতি খ-এ পৃথিবীতে মহাপ্রলয় সৃষ্টির জন্য কবি ইস্রাফিলকে শিঙায় ফুঁ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতা ইস্রাফিল শিঙায় ফুঁ দিলে পৃথিবী ধ্বংস হবে –এই ধর্মবিশ্বাসের মোড়কে কবি অপরাধপ্রবণ পৃথিবীর মুমূর্ষু অবস্থাকে রূপায়িত করেছেন।[১৪] উদ্ধৃতি গ ইসলামি লোকপুরাণের দৃষ্টান্ত। জলযাত্রা নির্বিঘ্ন করার জন্য মুসলমান মাঝিগণ 'বদর' নামক পীরের নাম স্মরণ করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেয়ার আগে অর্থাৎ, সাহিত্য-সৃষ্টির সময় এই ইসলামী ঐতিহ্যের স্মরণ নিয়েছেন।

খ্রিস্টীয় মিথ-ঐতিহ্যের একটি প্রয়োগ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় চমৎকার শিল্প-সফলতা লাভ করেছে। গর্ভবতী নারীর ঘরের দেয়ালে ঝুলে থাকা যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করে কবি একটি শিশুর আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন –

একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ
যীশুখ্রীষ্ট। (সাধ/ *একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/১৯৫)

কোন কোন সমালোচক মিথ ও লোককাহিনীর স্বাতন্ত্র্য আলোচনা করে জীবনে এর প্রভাবের ভিন্নতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। লোককাহিনী জীবনের বহির্বাস্তবতার বর্ণিলতাকে চিহ্নিত করে বলে অনেকে মনে করেন। মিথকে সত্যের খুব নিকটবর্তী বিবেচনা করে জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে এর প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবকেও স্বীকার করেছেন কেউ কেউ। সমালোচকের মন্তব্য –

> The difference between myth and folk tale, however, also have their importance. Myths, as compared with folk tales, are usually in a special of seriousness : they are believed to have "really happened" or to have some exceptional significance in explaining certain features of life, such as ritual. [১৫]

যে বিচিত্র-বর্ণিল-বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় জীবন ঋদ্ধ হয়ে ওঠে তাকে অনুধাবনের প্রয়োজনে তার যৌথ নির্জ্ঞানে (Collective unconscious)-এ লুকিয়ে থাকা রূপকথা বা পুরাকথার পাঠোদ্ধার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাই পুরাণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা ও লোককাহিনী বিষয়েও কবির দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা রূপকথা-লোকবিশ্বাস-লোককাহিনীকে লোকপুরাণ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লোকপুরাণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লোকপুরাণ ও রূপকথার শিল্প-সফল মিথস্ক্রিয়ার উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তিনি। 'রূপকথা ও পুরাকথার আয়নায় প্রায়শই বিম্বিত হয় আধুনিক জীবনের চালচিত্র। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে, নিছক সেই রূপকথার গল্প শোনানোই উদ্দেশ্য নয় হয়তো; সময়-সচেতন শিল্পীর কাছে রূপকথা, পুরাণ অথবা কিংবদন্তী আসলে সেই দৃশ্যমান মোড়ক – যা নিপুণভাবে ধরে রাখে সময় কিংবা সময়ের ইতিহাসকেই'[১৬]। নিচের উদাহরণগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক –

ক. তাই ব'লে ছিলাম না অবুঝও
চাঁদ সদাগর হয়ে দিতাম বাঁ-হাতে
মনসাকে পুজো। (যা রে কাগজের নৌকো/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/১৩)

খ. আমি রইলাম পড়ে
অজলে অস্থলে
মনপবনে দেখ রে
ময়ূরপঙ্খী চলে (যা রে কাগজের নৌকো/*যা রে কাগজের নৌকো*, ৫/১৪)

গ. তাহলেই সোনার কৌটোয় কালো প্রাণভোমরাগুলো
বুক ফেটে দাপিয়ে দাপিয়ে মরে যাবে (ফেরাই/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২৫২)

ঘ. বনবিবিকে পুজো দেওয়া তাদের ঘটপট
এখনও মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে
আমি ওসব পুজোপাঠের মধ্যে নেই (ধর্মের কল/*ধর্মের কল*, ৫/২৪৯–২৫০)

ঙ. চোখে যাদের দেখেছিলাম
আলাদিনের আলো (দে-দোল/ যা রে কাগজের নৌকো, ৫/৪৫)

চ. কী-হয় কী-হয় সারাদিন
প্রদীপ খোঁজে আলাদিন। (পিক-এ/ধর্মের কল, ৫/২৬৫)

ছ. শূন্য শ্মশানে শুরু হল
রক্তবসনে
জনগণতান্ত্রিকের শবসাধনা (এক মাঘে শীত যায় না/*ধর্মের কল*, ৫/২২১)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে লোকপুরাণ ও লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্ধৃতি ক-এ শৈশবের দস্যিপনায় অন্ধকারে সর্পভীতি এবং সেই ভীতি দূরীকরণে মনসাদেবীকে অবজ্ঞায় পূজা প্রদান সম্পর্কিত চাঁদ সদাগরের

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী উল্লেখ কবি করেছেন। লোককাহিনী হিসেবে ময়ূরপঙ্খী খুবই জনপ্রিয় প্রসঙ্গ যার সঙ্গে কবি মনকে বেঁধে দিয়েছেন উদ্ধৃতি খ-এ। উদ্ধৃতি গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাক্ষসরূপী পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও তার দোসরদের ধ্বংসের কৌশল বিবৃত করেছেন। ভাঙাকে জোড়া দেয়ার মাধ্যমেই রূপকথার কালো ভোমরারূপী অপশক্তির মৃত্যু হবে, ধ্বংস হবে রাক্ষসের রাজত্ব– এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য উদ্ধৃতিতে। এই প্রাণভোমরা-প্রসঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে আরেকটি কবিতায় : 'আমাদের প্রাণভোমরাগুলো বড়ো বড়ো খোলের মধ্যে ভরে/সরু সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে' (উত্তরপক্ষ/এই ভাই, ২/১৭০)। উদ্ধৃতি ঘ-এ লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন স্পষ্ট। উদ্ধৃতি ঙ ও উদ্ধৃতি চ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ সম্পর্কিত রূপকথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদ্ধৃতি ছ শবের উপরে অশ্বারোহণের ভঙ্গিতে উপবেশন করে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের সঙ্গে গণতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদপ্রক্রিয়ার তুলনা করেছেন কবি।

সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের গল্প এবং ষড়যন্ত্রী বিমাতার অত্যাচারের কাহিনী খুবই জনপ্রিয় রূপকথা হিসেবে পরিচিত। ফুল ফুটুক (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থের 'পারুল বোন' কবিতায় এই রূপকল্প রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিধৃত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বিজয় সিংহের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন ইলা মিত্র। পাক-সৈরাচারী শাসকদের হাতে চরম নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে সে সময় তিনি ঢাকার সরকারী জেলে অন্তরীণ। এই দু'টি ঘটনাই আবেগ-মথিত হয়ে 'পারুল বোন'-এ ধরা পড়েছে। রূপকথা থেকে উঠে আসা এ কবিতার 'পারুল বোন'-এ মিশে আছেন একাধারে 'স্তালিন-নন্দিনী' ইলা মিত্র ও জাগ্রত বাংলাদেশ।[১৭]

কারাবন্দি ইলা মিত্রের ওপর রাজনৈতিক অত্যাচার আর তাঁর সহযোদ্ধাদের অপেক্ষার পালা, রূপকথার সাত ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা। তাই কবি বলেন –

> শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
> পারুল বোন আমার ॥ (পারুল বোন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৫)

কবি এই পারুল বোনের কথা বলেছেন আরো একটি কবিতায়। 'সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে/পারুল বোন রইল কাছে' (ঠাকুরমার ঝুলি/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫০)-এর মাধ্যমে তিনি 'সাত ভাই চম্পা'র লোককাহিনীর রূপকল্পে অস্থির সময়কে ধরার চেষ্টা করেছেন।

রূপকথার অসাধারণ ভাণ্ডার দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে গল্পের নায়কের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়ার চেষ্টাই গল্পগুলোতে রয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আধুনিক জীবনদৃষ্টি দিয়ে অপরাধপ্রবণ সমকালকে রূপকথার আবহে উপস্থাপন করেন –

> কাড়ে না কেউ রা
> ভালোমানুষের ছা (ঠাকুরমার ঝুলি/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২৫০)

কবি সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী মানুষকে 'সুয়োরানী'র সমর্থক হিসেবে দেখেছেন, আর বঞ্চিত, বিড়ম্বিত মানুষগুলো আজ 'ঘুঁটেকুড়ুনির ছানা'। সাপের বিষের নীল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে কবি তুলনা করেন মানবসভ্যতার বিপর্যয়কে, আর অশুভ তৎপরতা বন্ধ করার মোক্ষম মন্ত্র হয়ে যায় সাম্যবাদী আদর্শ-চেতনা, 'যা রে/সাপের বিষ/দিয়েন বিয়েন/ফুঃ' (দিয়েন বিয়েন ফুঃ/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৮)। লোককাহিনী ও রূপকথার মোড়কে কবির আধুনিক জীবনবীক্ষা এভাবেই বিরূপ-বিপন্ন-বিচলিত সমকালকে চিহ্নিত-চিত্রিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্য স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। মহাভারত ও রামায়ণের চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই তাঁর পুরাণভাবনা উজ্জ্বল প্রয়োগসাফল্য অর্জন করেছে। লোকপুরাণ প্রয়োগেও তাঁর জীবনবীক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। হিন্দু মুসলিম উভয় পুরাণের মিথস্ক্রিয়ার দৃষ্টান্তও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়। পাশ্চাত্য পুরাণ তাঁর সৃজনভুবনে প্রবেশাধিকার পায় নি বলা যায়। পুরাণকে অবিকৃত কাহিনীরূপে নয়, পৌরাণিক সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের ভেতরে আধুনিক জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির শেকড় বিস্তৃত করেছেন তিনি, আর সেই নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মাণ করেছেন ব্যক্তিগত শিল্পভুবন যা আত্মকেন্দ্রিক নয়, সামাজিক ও সমষ্টিগত চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পুরাণের আধুনিক রূপায়ণ ঘটিয়ে সমকালীন জীবনবেদ প্রকাশই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯১ : ৫০১) বিষ্ণু দে-র কবিতায় পুরাণ ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পূরণ শব্দটি সম্ভবত পুরাণ শব্দের মৌলসূত্র সন্ধানে আমাদের সাহায্য করে। যা ঘটে গিয়েছে বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে পূরণ করতে হবে।' সাহিত্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গের প্রয়োগ বিবেচনার ক্ষেত্রে এই মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. তিরিশের কবিদের শিল্পদৃষ্টি নির্মাণে পাশ্চাত্য প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বাংলা কবিতাকে বিশ্বসাহিত্যে উন্নীত করার এ প্রয়াস কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছে। পুরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁদের শিল্পভাবনার স্বাতন্ত্র্য বাংলা কবিতার ইতিহাসে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, জেমস জয়েস, টমাস মান, ফ্রানজ্ কাফকা প্রমুখ বিশ্বজয়ী প্রতিভার পুরাণ-ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছেন আমাদের তিরিশের কবিরা।

৩. Philip Wheelwright, 'Poetry, Myth, and Reality'. An essay in the book *Twentieth Century Criticism : The Major Statements* [Ed.] William J. Handy & Max Westbrook, Indian Edition 1976. p. 265-266.

৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫ : ২০) বলেছেন, '...শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ মিলতে না পারছে, তত ক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন। সেই জন্যে প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না, এবং কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই'।

৫. দুঃসময়ে শ্রীকৃষ্ণ বা অর্জুন শঙ্খে ফুঁ দিতেন। এই শঙ্খ চণ্ডীও দানব দলনে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ *বলাকা* কাব্যের 'শঙ্খ' কবিতায় শঙ্খ শব্দের এই ঐতিহ্যিক আবহকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন –

> তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন করে সইব !
> বাতাস আলো গেল মরে, একি রে দুর্দৈব !
> লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে, গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
> চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে– আয় না রে নিঃশঙ্ক।
> দুলায় পড়ে রইল চেয়ে ওই-যে অভয় শঙ্খ॥

কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর্ত ও বঞ্চিতের ভাগ্য পরিবর্তনে সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধনে বিশ্বাসী বলেই সাইরেনের শব্দে সমবেত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন কিংবা চণ্ডীর সতর্কবাণীর সঙ্গে তিনি আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতাকে মিলিয়ে নিয়েছেন। পৌরাণিক চরিত্রের এই আধুনিকীকরণে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি তাঁর শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জাগ্রত' কবিতাটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখা। নজরুলের মহান সৃষ্টিসম্ভারের সক্রিয়তা সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেছেন সুভাষ। বাংলাদেশের মাটিতে নজরুলকে সমাধিস্থ করায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। এ-সম্পর্কে সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য* শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনে বিজয় সিংহ 'কবিতার নেপথ্যে' প্রবন্ধে বলেছেন–

> ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার কাজী নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় কবির মর্যাদা দেয় এবং সসম্মানে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকাতেই কবি নজরুলের জীবনাবসান হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ঢাকার মাটিতে। বাংলাদেশে কবি-কাজীর মৃত্যু এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এপার বাংলার মানুষের মধ্যে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গোটা ঘটনাটি পদাতিক-কবির মনে যে আবেগ নিয়ে আসে এবং তিনি যে দৃষ্টিতে ঘটনাটিকে দেখেন, তারই কাব্যরূপ 'জাগ্রত' কবিতা। বিদ্রোহী কবির মৃত্যু নয়, তাঁর জাগ্রত সত্তাই কবির কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয় বলে তাঁর দেখার বিষয় একটাই : 'দেখব তিনি কোথায় জেগে/ কোথায় তিনি মৌন।'

৭. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), ১৪১২, *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৩৩। পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, অন্য কোন উল্লেখ না থাকলে, এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে বুঝতে হবে।

৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* গ্রন্থে (১৯৬৫ : ২০৩) বলা হয়েছে, 'প্রকৃতপক্ষে পুরাণের জন্ম পুরাঘটিত ও বর্তমান মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতায়'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুরাণ-ভাবনায় এই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমরা মনে করি।

৯. বাংলা সাহিত্যে নটরাজ শিবের বহুবর্ণিল চিত্রকল্প রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করার জন্য তিনি শিবের প্রলয় ও সৃষ্টির, ধ্বংস ও সুন্দরের প্রতিরূপকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শিবের সেই ধ্বংসাত্মক শক্তি কিংবা সৃষ্টিশীলতার উদ্দাম তেমন ঔজ্জ্বল্য লাভ করে নি। তিনি শিবের অলৌকিক অসাধারণত্ব থেকে তাঁর সাধারণ ও লৌকিক উল্লেখ দ্বারা বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

১০. তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথপুরাণের ছায়া', সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত), ২০০২, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ৯৮।

১১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের *ছাড়পত্র* কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। তিনি পৃথিবীকে সকলের বসবাসের যোগ্য করে তোলার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। সুভাষ মুখোপাখ্যায়ও 'উজ্জীবন' কবিতায় পৃথিবী ও মানুষের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যাতে ভবিষ্যৎ পৃথিবী অনাগত সুকান্তদের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

১২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *ছেলে গেছে বনে* (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কবির অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন* (১৯৭৫)-এর সম্পাদক জমিল শরাফী (রণেশ দাশগুপ্ত) গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন কবির মনে নতুন আশার বাতি জ্বেলেছে, তখন এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা সাথীদের ফিরে পাওয়ার জন্যে গভীর অপেক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে এই কবিতাগুলি লেখা' (জমিল শরাফী ১৯৭৫ : ১০)। এই গ্রন্থের 'ছেলে গেছে বনে' কবিতাতেই কবির এই মনোভাবের প্রকাশ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও শিল্পসম্মত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. এ প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪–১৮৭৩) *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-র কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে কবি রামের দুর্বলতার বিপরীতে রাবণের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম দেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের এই শিল্পচেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন– একথা খুব সরলভাবে বলা যায় না। আমাদের বিবেচনায়, সুভাষের রাজনৈতিক মতাদর্শ জীবনকে পাঠ করার যে দৃষ্টি দিয়েছে, তারই আলোকে তিনি রামের ব্যক্তিত্বহীনতাকে ব্যঙ্গ করেছেন।

১৪. ইসলামি ঐতিহ্য হিসেবে মহরম ও ইস্রাফিলের শিঙায় ফুঁ দেয়ার প্রসঙ্গ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় অসাধারণ শিল্প-সফলতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) কাব্যগ্রন্থের 'মোহর্‌রম' কবিতায় কবি লিখেছেন, 'ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,–/ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।' এবং 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বলেছেন, 'আমি বজ্র, আমি ঈষাণ-বিষাণে ওঙ্কার/আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুংকার'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই ইসলামি পুরাণ প্রয়োগের সার্থকতা নজরুলের সাফল্যের পাশে ম্লান মনে হয়।

১৫. Northrop Frye, "Myth, Fiction, and Displacement". An essay in the book *Twentieth Century Criticism : The Major Statements* [ed.] William J. Handy & Max Westbrook, Indian Edition 1976.P.164.

১৬. সুমিতা দাস, ২০০২, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আদিকল্প', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, সম্পাদক : সন্দীপ দত্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ১০১।

১৭. বিজয় সিংহ, ২০০২, 'কবিতার নেপথ্যে', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, সম্পাদক : সন্দীপ দত্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ২৩।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৬৫, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, বাক-সাহিত্য, কলকাতা।

২. জমিল শরাফী (সম্পাদিত), ১৯৭৫, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন* , প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, লালন প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৯১, *বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৪. বলরাম মণ্ডল, ১৯৯৩, *পুরাণ বিচিত্রা*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

৫. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. মাহবুব সাদিক, ১৯৯৩, *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত), ২০০২, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৯৫, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৯. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), ১৪১২, *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা।

১০. William J. Handy & Max Westbrook [Ed.], 1976, *Twentieth Century Criticism: The Major Statements*, Indian Edition, Light & Life Publishers. New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছন্দ

কবিতার সৃজনপ্রক্রিয়ায় ধ্বনি ও শব্দের নানামাত্রিক সমবায়-সমন্বয় সংঘটিত হয়। ধ্বনির বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত হলেই কবিকল্পনার বাণীরূপ বেগবান কিংবা প্রাণবন্ত হয়। শব্দকে গতিশীল করতে পারলেই তা সুগভীর ব্যঞ্জনায় পাঠকের চেতনায় আলোকসঞ্চার করে। ছন্দ সেই আলোকবর্তিকা যার স্পর্শে কবির সুসংযত ও সুপরিমিত শব্দসজ্জা কোমল, পেলব ও বেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, জড়তা-নিষ্প্রাণতা-নিষ্প্রভতা অতিক্রম করে শব্দ লাভ করে অপরূপ দীপ্তি ও ধ্বনিমাধুর্য। ফলে ছন্দ-ব্যবহারে অসচেতন–অসতর্ক হলে যে-কোন কবির জন্যই ব্যর্থতা অনিবার্য। কথাকে ছন্দে গেঁথে নেয়ার নানা কৌশল কবিকে রপ্ত করতে হয়। তা না হলে পাঠকের অন্তরে তা মুক্তির আনন্দ দিতে পারে না। এই কাব্যপ্রকৌশল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> আমরা ভাষায় বলে থাকি কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ৫০)।

ব্যক্তিগত ভাবনাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার প্রয়োজনেই কবিকে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়। কবির যে আবেগ ও প্রজ্ঞা কবিতায় বিধৃত হয়, তাতে বেগ সঞ্চারিত না হলে পাঠকের সঙ্গে বোঝাপড়ার সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে ছন্দ-বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় কবিকে। যে কোন সৃজনশীল মন স্বভাবতই পরীক্ষা-প্রবণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার প্রকরণ-প্রকৌশলে অভিনবত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বাংলা কবিতায় পদার্পণ করেছেন। তিনি বাংলা ছন্দের নিরূপিত কাঠামোতেই নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক*-এর ছন্দ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন –

> সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের কান নিখুঁত, ছন্দ নিয়ে এই ৩২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানারকম পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন; নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে তাঁর এই ঝোঁক যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহলে বাংলা ছন্দের বড়ো রকমের কোনো পরিণতি তাঁর কাছে আশা করা অন্যায় হবে না (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ৮৫)।

সমালোচকের উপরিউক্ত মন্তব্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ-সচেতনতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তিন মাত্রা ও পয়ার উভয় ছন্দেই সুভাষের মুন্সিয়ানায় মুগ্ধ হয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। এছাড়া হসন্ত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সুভাষের কৃতিত্বে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে নিজস্ব ভাবনাকে জুড়ে দিয়ে তিনি এমন কবিভাষার সৃষ্টি করেছেন, যা প্রচলিত ছন্দকাঠামোর মধ্যে থেকেও অভিনব হয়ে উঠতে পেরেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার ছন্দে গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্বকে হ্রাস করার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের প্রচলিত ছন্দোরীতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা নিয়েছেন।[১] ছন্দ সম্পর্কে তাঁর রয়েছে একটি নিজস্ব বিবেচনা, যার প্রভাব তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুভাষের ছন্দ-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যে ধরা পড়েছে –

Dhaka University Institutional Repository

> ছন্দ কথাটার মধ্যে আছে এইসব ভাব – ছাড়া, বাঁধা, আনন্দ। মাথার ওপরকার খোলা, খালি, ছাড়া জায়গাটা যখন বাঁধি সেটা হয় ছন্দ, ছাঁদনা, ছাঁদ, চাঁদোয়া। ছেঁড়ে বাঁধি কেন? তা থেকে ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে। ফলটা যদি ভালো হয়, ছেঁড়ে বাঁধার কাজটা হয় আনন্দের – ছন্দটা হয় মনের মতো। মানুষ যে কাজ করে, সেটাই তাহলে ছন্দ। ছাড়া, বাঁধা, উদ্দেশ্য আনন্দ – কোনো একটা বাদ দিলে ছন্দে খুঁত হবে।
>
> ছন্দ জিনিসটা যেন লাগাম। ঘোড়া যদি ছাড়া অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না। ঘোড়া থাকলো বনে আর আমি এখানে মনে মনে ঘোড়ায় চড়ছি, তা তো হয় না। বুনো ঘোড়া ধরে আনতে হবে, বশ করতে হবে। কিন্তু এনে যদি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখি, তাহলেও ঘোড়ায় চড়া হবে না। তাকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে ছেড়ে বাঁধতে হবে। একেবারে ছাড়া নয়, একেবারে বাঁধা নয়। দড়ি কিংবা শেকল হলে চলবে না। লাগাম দরকার (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪ : ৪৬–৪৭)।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষ করা যায়, তিনি ছন্দের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, নিষ্ফল, নিরানন্দ কাজে মানুষ যেমন হাঁপিয়ে ওঠে, তেমনি ছন্দহীন কবিতার রাজ্যেও পাঠকের অবাধ আনাগোনা অসম্ভব। তাঁর মতে, 'চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হল কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম' (১৯৮৪ : ৪৭)। ভাব ও ভাষার সুদৃঢ় বন্ধন ছন্দের পৌরোহিত্যে কতোটা প্রবল এবং প্রাণবান হতে পারে, সুভাষের প্রথম কাব্যগ্রন্থই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও ছন্দোকলায় সুভাষের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাচ্ছন্দ্য প্রথম কাব্যগ্রন্থেই বিধৃত হয়েছে। তিনি অবাধে হসন্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে অক্ষরবৃত্তে সাবলীল গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন সুভাষের এই চল্‌তি বাংলার প্রতি প্রবল পক্ষপাতের প্রশংসা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *পরিশেষ* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা ছাড়া আর কোন কবি এমন অনায়াস সাফল্য লাভ করেন নি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় –

> ...একথা ঠিক যে যৌগিক ও মাত্রাবৃত্ত উভয় প্রকার ছন্দেই সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারই সাধারণ রীতি। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পদাতিক' কবিতায় উভয় প্রকার ছন্দেই অবলীলাক্রমে এবং সর্বত্র সমভাবে চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এটা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের নয়। আর, এই ভাষা-বৈশিষ্ট্যের জন্যও তাঁর ছন্দের ধ্বনি নূতন ব'লে বোধ হয়; চলতি বাংলার অনভ্যস্ত ধ্বনি ওই উভয় প্রকার ছন্দেই একটি নূতনত্বের আভাষ এনে দিয়েছে।[২]

ছন্দ নিরীক্ষায় সুভাষের এই প্রয়াস পরবর্তী পর্যায়ে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত *পদাতিক*-এর কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে –

ক. নির্জন মাঠের চিন্তা। ছেড়ে দিয়ে বিকেলের। মিছিলের পানে, ৮.৮.৬
শহর বিস্বাদে ঢেকে, । ডাকি: 'ঝাউ-ঝুমঝুমির। ছায়ায় এসো হে, ৮.৮.৬
প্রজাপতি পায় না কো। এরোপ্লেনের শব্দ। বাতাসের কানে'; ৮.৮.৬

(পলাতক/*চিরকুট*, ১/২৯)

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাপুজি, দক্ষিণ করে। আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই; ৮.১০
সাঙ্গ, প্রভু, সত্যাগ্রহ? | একচ্ছত্রে বেজেছে বারোটা? ৮.১০
শেষে কি নৈমিষারণ্যে | পাবে আত্মগোপনের ঠাঁই? ৮.১০
(নারদের ডায়রি/*পদাতিক*, ১/৩১)

গ. অনেকদিন খিদিরপুর। ডকের অঞ্চলে ৮.৬
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় | গরু খোঁজা ক'রে ৮.৬
নীলাকাশে অন্ধকারে, | গৈরিক নদীতে; ৮.৬
(আলাপ/*পদাতিক*, ১/৪০)

ঘ. ভীড়গ্রস্ত তরণীতে। ভারগ্রস্ত আমি ৮.৬
সংসার সমুদ্রে হালে। পাই নাকো পানি। ৮.৬
তাই এই কৃষ্ণপক্ষে | উপবাসী প্রার্থনা জানাই, ৮.১০
আমাকে সৈনিক করো। তোমাদের কুরুক্ষেত্রে ভাই ॥ ৮.১০
(আর্য/*পদাতিক*, ১/৪৩)

উদ্ধৃতি ক-এ তৃতীয় পঙক্তির দ্বিতীয় পর্বের এক মাত্রা পতন উচ্চারণ-কৌশলে এড়িয়ে যেতে পারে। 'এরোপ্লেনের'-এর 'এ' এখানে বিচ্ছিন্ন বা আল্‌গাভাবে উচ্চারিত হয়ে দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য হয়েছে। উদ্ধৃতি গ-এ প্রথম পঙ্‌ক্তির 'অনেকদিন' অনায়াসে চারমাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এর 'ভীড়গ্রস্ত' ও 'ভারগ্রস্ত'-কে কবি গণ্য করেছেন চারমাত্রা হিসেবে। তাঁর কবিতায় অক্ষরবৃত্তের সাবলীল ভঙ্গি ছন্দোশাস্ত্রের প্রভাবজাত নয়। তিনি কানের পৌরোহিত্ব স্বীকার করে নিয়েই সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাত্রাসমতা আনার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> বিশ্লেষণ করা ছন্দোজ্ঞানের দরকার হয় না কবির, দরকার হয় কেবল বোধময় ছন্দোজ্ঞানের। দরকার হয় শুধু কানের। লেখার সূচনাকাল থেকেই ঠিক করে নিয়েছেন এই কবি, এ বিষয়ে কোন পুঁথিপত্র পড়বেন না তিনি, তিনি নির্ভর করবেন কেবল তাঁর নিজেরই শোনার উপর। ছোটবেলায় ধোপাদের কাপড়কাচার শব্দ শুনতেন তিনি বাড়ির পিছনে, তাঁর কানে লেগে ছিল সেই তাল, আর ছিল লোকমুখের স্পন্দের উপর ভর করবার সাহস, কথার চালগুলি ভালো করে লক্ষ করবার ইচ্ছে। ভেবেছিলেন, লিখতে হবে ঠিক তেমন করে, যেমনভাবে কথাবার্তা বলে লোকে, ছন্দকে তুলে আনতে হবে কেবল সেইখান থেকে। আর, ঠিক সেখান থেকে তুলতে পেরেছেন বলেই বাংলা অক্ষরবৃত্তে একটা স্বাভাবিক বাচন তৈরি হয়ে গেছে তাঁরই কবিতার পথ ধরে।[৩]

উপরিউক্ত মন্তব্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সহজ-স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতি শঙ্খ ঘোষের মুগ্ধতার প্রকাশ স্পষ্ট হলেও বাংলা অক্ষরবৃত্তের 'স্বাভাবিক বাচন তৈরি'র ক্ষেত্রে সুভাষের পথনির্দেশ আধুনিক কবিতায় দূরসঞ্চারি প্রভাব ফেলেছে- এ কথা স্বীকার করতেই হয়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন কবিকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। তিনি বলেছেন, 'আমার নিজের বিশ্বাস যে আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করি নে, অন্তত সজ্ঞানে নয়' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ৯৩)। ফলে সুভাষ অবলীলায় টুকরো, পাগড়ি, হাজরা, টাটকা, খাজনা প্রভৃতি শব্দকে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়েছেন, এবং ডায়মন্ড, হারবার, কমরেড, কসরত, দরবার, কলকাতা, মাসতুতো,

Dhaka University Institutional Repository

ঝুমঝুমি প্রভৃতি শব্দকে তিনি গণ্য করেছেন তিন মাত্রা হিসেবে। সংশ্লেষণের আরো কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. ডায়মন্ড হারবার থেকে | ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা ৮.১০
ইতিমধ্যে কলকাতায় : | একুত্রিশে চৈত্রেই চম্পট, – ৮.১০
(নারদের ডায়রি/*পদাতিক*, ১/৩১)

খ. বসন্ত কী আর্য, আহা! | এসপ্লেনেডে আশ্চর্য জনতা। ৮.১০
(নারদের ডায়রি/*পদাতিক*, ১/৩১)

গ. শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা;|লেনিন-দিবস; লাল|পাগড়ি মোতায়েন ৮.৮.৬
(দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩১)

ঘ. হাজরাপার্কে সভা কাল;|নিরপেক্ষ থেকে আর|চিত্তে নেই সুখ ৮.৮.৬
(দলভুক্ত/*পদাতিক*, ১/৩২)

ঙ. সংগ্রাম নিশ্চিত, তবু | মাসতুতো ভাইয়েরা ৮.৬
(পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩৪)

চ. অথচ বকেয়া খাজনা | প্রজারা দেয়নি গত | দুই তিন সনে। ৮.৮.৬
(অতঃপর/*পদাতিক*, ১/৩৭)

ছ. তবে কি নাছোড়বান্দা | ফাল্গুন, কমরেড ? ৮.৬
(আলাপ/*পদাতিক*, ১/৪০)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এভাবে সংশ্লেষণের মাধ্যমে চলতি বাংলার হসন্ত শব্দকে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে শিল্পসফলতার পরিচয় দিয়েছেন। যৌগিক ছন্দের নিয়ম অনুসারেই এগুলি সুষ্ঠু বলে স্বীকার্য হলেও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন সুভাষের কৃতিত্ব নির্দেশ করেছেন এভাবে –

> ...সুভাষের কৃতিত্ব এই যে সাধারণত কবিরা এসব স্থলে অক্ষর গোনার নিরাপদ পথে বিশ্লেষণের দিকেই ঝুঁকে থাকেন; কিন্তু সুভাষের প্রখর কান তাঁকে উচ্চারণরীতির পথেই চালনা করেছে, ছন্দ শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় নি; তাই তাঁর চোখ তাঁকে আক্ষরিক হিসাবের নিরাপদ পথে চালনা করার সুযোগ পায়নি।[৪]

অবশ্য বিশ্লেষণের দৃষ্টান্তও তাঁর কবিতায় কম নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. ফাল্গুন অথবা চৈত্রে | বাতাসেরা দিক্ বদলাবে। ৮.১০
(নির্বাচনিক/*পদাতিক*, ১/৩০)

খ. ...সর্ষেফুল ? আমাদের | হাতে আসবে রাজ্যভার? | চমৎকার কিবা! ৮.৮.৬
(অতঃপর/পদাতিক, ১/৩৭)

গ. বসন্ত সত্যিই আসবে ? | কী দরকার এসে ৮.৬
(আলাপ/পদাতিক, ১/৪০)

ঘ. এবার বিধ্বস্ত চীন | মন্দ লাগবে না; ৮.৬
– ভারতবর্ষে বিপ্লবের | দেরি নেই আর ॥ ৮.৬
(আলাপ/পদাতিক, ১/৪১)

প্রবোধচন্দ্র সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট প্রয়োগকে সাহসিকতার পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন। উচ্চারণভিত্তিক ছন্দগণনার কারণেই ছন্দপতনের হাত থেকে মুক্ত তাঁর কবিতা। ফলে সংশ্লেষণ-

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণের মাধ্যমে অক্ষরবৃত্তের নিরূপিত পরিধির মধ্যেই নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি, যা পরবর্তী কবিদেরকেও যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। এ সম্পর্কে কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন –

> আধুনিক ছন্দের ইতিহাস ছন্দ-শরীরে বাক্‌স্পন্দকে আত্তীকরণের ইতিহাস; এই বাকস্পন্দকে আয়ত্ত করবার ভিন্ন ভিন্ন পথ খুঁজেছিলেন এই কবিরা – সেইটেই কি দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আমাদের ? তারই এক প্রবল প্রবর্তনায় যেমন পঁচিশ বছর আগে সম্ভব হয়েছিল 'পদাতিক', যেমন অক্ষরবৃত্তের শোষণচাতুর্যের আশ্চর্যের ব্যবহার করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর হাজরা পার্ক, বা খিদিরপুর-এর মতো আয়তনকে চার মাত্রার আয়ত্তে এনে, ...'পদাতিক'-এর পর এই প্রক্রিয়া থেমে থাকে নি, সংশ্লেষ-বিশ্লেষের যুগল ভঙ্গিতে অক্ষরবৃত্তের সম্ভাবনা আজ কবিদের কাছে অনেকটাই খোলামেলা (শঙ্খ ঘোষ ১৩৭৮ : ৩১-৩২)।

সুভাষের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহেও সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতার দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, | রক্তে তার জ্বলুক আগুন: ৮.১০
শৃঙ্খলিত সেনাপতি; ৮
তাই ব'লে আমাদের | শূন্য নয় তূণ ॥ ৮.৬
(আহ্বান/*চিরকুট*, ১/৫৬)

খ. জাগ্রত চল্লিশকোটি | এখানে তৈয়ার। ৮.৬
ধারালো সঙীন দেবে | বিজয়ী স্বাক্ষর ৮.৬
গণতন্ত্র দিকে দিকে | কেটে দেবে মৃত ধন | তন্ত্রের কবর ৮.৮.৬
(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার/*চিরকুট*, ১/৬০)

গ. চোখ তার ৪
অনুর্বর অন্ধকারে | ঢাকা, ৮.২
গায়ে তার শবগন্ধ, ৮
পদতল চিতাভস্মে | রাখা ৮.২
(এই আশ্বিনে/*চিরকুট*, ১/৬৩)

গ. দমকল পুরুত গেল | ঘন্টা নেড়ে! কিছু একটা | ঘটেছে কাছেই ৮.৮.৬
এখনও পোকায় খায় নি | ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই | সুন্দর ছবিটা ৮.৮.৬
(ছেই/*যত দূরেই যাই*, ২/১০৩)

ঘ. কাজ ফুরোলেই পাজী | যে ছিল পা-চাটা। ৮.৬
তুমি যে ঢাকের বাঁয়া | ছিলে তার, বোকা। ৮.৬
শ্রীমুখে খেউড় শুনতে | গায়ে দিত কাঁটা। ৮.৬
(রোমাঞ্চ-সিরিজ/*এই ভাই*, ২/২০৮)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ সুভাষের কবিতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তিনি অতি নিরূপিত এই ছন্দের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তা ছান্দসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সম্ভাবনাকে অনেক দূর প্রসারিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যছন্দ

বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দের নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের সময়ে শুরু হলেও ত্রিশোত্তর কবিদের হাতেই এই ছন্দ বেশ সবল, সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। 'ত্রিশোত্তর কবিগোষ্ঠী আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দে গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চার ও পদ্যের বাকভঙ্গির মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর প্রচেষ্টায় যেমন নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি গদ্যছন্দচর্চায়ও নিয়োজিত ছিলেন' (মাহবুব সাদিক ১৯৯১ : ৪৩৭)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পয়ারের বৈচিত্র্যহীনতা দূর করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে অক্ষরবৃত্তের সম্ভাবনাকে অনেক দূর বিস্তৃত করেছিলেন। অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে শাসন করার যেসব সূত্র উপস্থিত, তাকে অস্বীকার করে অবাধ কিন্তু আবেগশাসিত ভঙ্গিতে ভাবকে গ্রথিত করার প্রেরণা থেকেই গদ্যছন্দের যাত্রা শুরু। গদ্যছন্দ পর্ব ও মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত নয়, আবেগ-নিয়ন্ত্রিত। গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুইটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি –

ক. গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের পতন ভাঙ্গাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সসজ্জ, সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২ : ২৩১)।

খ. গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দ বোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজ না থাকে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয় (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৬ : ১৯৮)।

রবীন্দ্রনাথের হাতে গদ্যছন্দ যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করেছে। রবীন্দ্রপরবর্তী গদ্যছন্দ আরো নানামাত্রিক নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষপাত মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তে আবর্তিত হলেও শীঘ্রই তিনি গদ্যছন্দের প্রাণখোলা প্রান্তরে প্রবেশ করলেন এবং রচনা করলেন এমন সব শিল্পসফল কবিতা, যা ছান্দসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যকবিতার অন্তর্নিহিত ছন্দের আবেদন এতই আন্তরিক এবং অভিনব যে, প্রচলিত কথ্যভঙ্গির মধ্যেই তিনি অনায়াসে জুড়ে দিতে পারেন আবেগের সুপরিমিতি এবং সুনিয়ন্ত্রিত স্পন্দন। এ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে –

> গদ্য কবিতা মানে একটা আত্মমন্থনের বিন্যাস নয় – একটানা স্বগতোক্তির উল্লাস নয়, গদ্য কবিতার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যক্তি বিশ্বের সঙ্গে বস্তুবিশ্বের একটা মোকাবিলা তার মধ্যে হয় এবং গদ্য কবিতা এই দিক থেকে ভালো আরো হতে পারে আমার মনে হয় এই কারণে... আমি লক্ষ করেছি যে গদ্য কবিতার মধ্যে প্রাত্যহিক কথ্যবুলি অনায়াসে আনা যায়... আর আত্মঅতিক্রান্তি হয় তারি মধ্যে একটা ছন্দ আছে... যেটা আমরা এখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কোনো কোনো কবিতায় পাই, যদিও তিনি কখনো কাব্যছন্দ থেকে বেড়িয়ে আসেন নি (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৯৯১ : ১৬৫)।

সুভাষের গদ্যছন্দে আমাদের আটপৌরে জীবনের নানা অনুষঙ্গ চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর *ধর্মের কল*

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যগ্রন্থের গদ্য কবিতার গতিশীলতা সম্পর্কে সমালোচক সব্যসাচী সরকার বলেছেন, 'আবেগের বাহুল্য না থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য, সজীবতা, গদ্যের টানটান গতিশীলতা সত্ত্বেও কবিতার রহস্যময়তা তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে ফুটে ওঠে'।[৫] গদ্যছন্দে রচিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে কোন কবিতা সম্পর্কেই এই মন্তব্য যথার্থ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক –

ক. গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তার বলিষ্ঠ হাত দুটো আমি দেখতে পাচ্ছি –
আমি শেষ বারের মতো
মাটিতে পড়ে যাবার আগে
আমার ভালোবাসাগুলোকে
নিরাপদে
তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই ॥ (এখন ভাবনা/*ফুল ফুটুক*, ১/১৬৫)

খ. কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার –
বউয়ের গলা, মা কান খাড়া করলেন।
বলছে : 'দেখো, ঠিক আমার মতো কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস ক'রে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে :
'কী নাম দেবো, জানো ?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে ॥' (মেজাজ/*যত দূরেই যাই*, ২/১০০)

গ. আসমুদ্রহিমাচল
আমার বিশ্বাসের জমি।
আমাকে কথায় ভুলিয়ে
সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ॥ (এই জমি/*কাল মধুমাস*, ২/১৪২)

ঘ. ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে
আমরা বুকের রক্ত দিয়ে
কিনে নিয়েছি। (আমাদের হাতে/*এই ভাই*, ১/১৯৮)

ঙ. যখন
একসঙ্গে হাত মুঠো ক'রে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সব কিছু পাই –
তখন
বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে তুলে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে ॥ (অদ্ভুত সময়/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২২০)

Dhaka University Institutional Repository

চ. ময়দানের এ-কোণ থেকে ও-কোণ
কচি কচি গলায়
ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ছিল গান : (এক মাঘে শীত যায় না/*ধর্মের কল*, ৫/২২০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবন করা যায়। সরল, স্বতঃস্ফূর্ত বাক্যকে তিনি নিয়ন্ত্রিত আবেগ ও অনুভবের স্পর্শে শিল্পসমৃদ্ধি দিয়েছেন। তিনি কখনো কখনো সংলাপ ও নাট্যভঙ্গি বজায় রেখে গদ্যকবিতায় প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেন। কথ্যভাষার স্বাভাবিক বাকভঙ্গি সুভাষের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্পন্দন অর্জন করেছে। গদ্যছন্দে তিনি দৈনন্দিন জীবনকেই যেন চিত্রিত করেছেন।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষপাত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই প্রকাশিত হয়েছে। *পদাতিক*-এর অধিকাংশ কবিতাই মাত্রাবৃত্তে রচিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কথ্যঢঙ-এর প্রয়োগ ঘটিয়ে সুভাষ কবিতায় এই ছন্দে বিশিষ্টতা আরোপের চেষ্টা করেছেন। চলতি ক্রিয়াপদের সফল ব্যবহার তাঁর কাব্যশরীরকে সচল, সমৃদ্ধ এবং স্বাবলম্বী করে তুলেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণের পরিমিত অভিঘাতে তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্ন দোলা, যা তাঁর ছন্দ-ভাবনার অন্যতম কুললক্ষণ বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে –

> তিন মাত্রার ছন্দ: আঁটোসাটো, নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা, তাকে খেলানো শক্ত, কিন্তু এ-যন্ত্রেও সুভাষ তাঁর নিজের একটি সুর লাগিয়েছেন। নিপুণ কারিগরি ধরা পড়েছে তিনমাত্রায় যুগ্মস্বরের ব্যবহারে, তাছাড়া পংক্তিপ্রান্তিক যুক্তবর্ণে, যার জোরে তিনি মিল পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন, অথচ পাঠককে তা প্রায় বুঝতেই দেন নি (বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৯ : ৮৭)।

মাত্রাবৃত্তে সুভাষের নৈপুণ্য *পদাতিক*-এ চমৎকার শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে। ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণে পাঠকের কল্পনাপ্রতিভা যেমন আন্দোলিত হয়েছে, তেমনি মুখের ভাষায় যুক্ত হয়েছে অভিনবত্ব। শব্দের শরীরে আপন অনুভবের শক্তি সঞ্চারিত করে তিনি নির্মাণ করেছেন ব্যক্তিচিহ্নিত কাব্যভুবন। কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে –

ক. আমাদের থাক | মিলিত অগ্র | গতি ৬.৬.২
একাকী চলতে | চাই না এরো | প্লেনে: ৬.৬.২
আপাতত চোখ | থাক পৃথিবীর | প্রতি, ৬.৬.২
শেষে নেওয়া যাবে | শেষকার পথ | জেনে ॥ ৬.৬.২
(সকলের গান/*পদাতিক*, ১/২১)

খ. প্রিয়, ফুল | খেলবার | দিন নয় | অদ্য ৪.৪.৪.৩
ধ্বংসের | মুখোমুখি | আমরা, ৪.৪.৩
চোখে আর | স্বপ্নের | নেই নীল | মদ্য ৪.৪.৪.৩
কাঠফাটা | রোদ সেঁকে | চামড়া। ৪.৪.৩
(মে-দিনের কবিতা/*পদাতিক*, ১/২২)

Dhaka University Institutional Repository

গ. ঈশ্বর, এই | শরীর-মনের | দ্বন্দ্বে ৬.৬.৩
এ কি নিষ্ঠুর | নীরব গ্রহণ | করেছ ? ৬.৬.৩
যেখানে ভাবনা | তোমাকে সৃষ্টি | করেছ ? ৬.৬.৩
দৃষ্টি সেখানে | দাঁড়ালো প্রতি | দ্বন্দ্বী ? ৬.৬.৩
(বিরোধ/*পদাতিক*, ১/২৭)

ঘ. রোখে বিপ্লব, | লাল-ঝাণ্ডার | করো নিপাত: ৬.৬.৫
হে দীনবন্ধু, | নইলে সমূহ | কড়ি বেহাত ৬.৬.৫
(শ্রেষ্ঠীবিলাপ/*পদাতিক*, ১/৩৬)

ঙ. খাড়া করে কান | কাস্তের শাণ ৬.৬.
শুনছে নাকি ৫.
কামারশালে ? ৫
(এখানে/*পদাতিক*, ১/৩৮)

চ. সহসা মাভৈ | শোনা গেল চড়া | সাইরেনে ৬.৬.৪
স্বদেশে দিয়েছে | চম্পট ভীরু | বর্গীরা। ৬.৬.৪
(ঘরে বাইরে/*পদাতিক*, ১/৪২)

উদ্ধৃতিসমূহে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অধিকাংশ মাত্রাবৃত্তের কবিতায় ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব থাকলেও অপূর্ণ পর্বে মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি করে চমৎকারিত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি অবলীলায় অযুগ্ম ধ্বনির স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন উচ্চারণকে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়েছেন। একটি উদাহরণ দেয়া যাক –

ক. যেখানে আকাশ | চিকন শাখায় | চেরা ৬.৬.২
চলো না উধাও | কালেরে সেখানে | ডাকি, ৬.৬.২
হা! হতোস্মি! | সড়কে বেঁধেছি | ডেরা, ৬.৬.২
মরীচিকা চায় | বালুচারী আ | ত্মা কি ? ৬.৬.২
(পদাতিক/*পদাতিক*, ১/৩২)

উদ্ধৃতিটি সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, "এখানে 'হা' এই অযুগ্ম ধ্বনিটির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। তাই ওই স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাতে দ্বিগুণ মাত্রামূল্য দেওয়া হয়েছে। এস্থলে সুভাষ যে সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।"[৬] মাত্রাবৃত্তে সাধারণত প্রত্যেক চরণেই একাধিক সমমাত্রিক পর্ব থাকে। ফলে এর একটা নিয়মিত দোলা অনুভূত হয়। তাছাড়া এ ছন্দে বদ্ধাক্ষর মাত্রই দুই মাত্রার মর্যাদা লাভ করায় তাল গতিও বেশ ধীর লয়ের। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতার লয় একটু দ্রুত করলেও কবিতার রসাস্বাদন ব্যাহত হয় না। কারণ তিনি অবাধে চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন, কথ্যঢঙের কাছাকাছি পৌঁছানোর এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে মাত্রাবৃত্তের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। মাত্রাবৃত্তের পূর্ণ পর্ব কখনো চার মাত্রা, কখনো পাঁচ মাত্রা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছয় মাত্রার নিয়মিত দোলায় বেঁধে পঙ্‌ক্তিশেষে অপূর্ণ পর্বের আঘাত কবি অব্যাহত রেখেছেন। সুভাষের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে মাত্রাবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দে রচিত আরো কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি –

ক. বাতি যে ধরব, | সেটুকু পুঁজি	৬.৫
আলেয়ার নেই। | আমার মতে,	৬.৫
এসো আজ এই | জটিল পথে	৬.৫
ঠিকানা বদ্‌লে | প্রণয় খুঁজি।	৬.৫
	(কাব্যজিজ্ঞাসা/*চিরকুট*, ১/৪৭)
খ. ঝড় আসছে, | উঠে দাঁড়ায়	৫.৫
যে যেখানে | আছে।	৫.২
ডাঙায় বাঘ, | জলে কুমীর	৫.৫
যে মারে সেই | বাঁচে ॥	৫.২
	(ঝড় আসছে/*অগ্নিকোণ*, ১/৮৯)
গ. দিনে দূরে ঠেলে | দিনান্তে নিলে | কাছে।	৬.৬.২
ঠাঁ-ঠাঁ রোদ্দুরে | পাইনি কোথাও | ছায়া,	৬.৬.২
নীল সমুদ্র | পুড়ে গেছে সেই | আঁচে	৬.৬.২
চোখ মুছি –	৪
তুমি স্বপ্ন ?	৫
না তুমি মায়া ?	৬
	(লাল টুকটুকে দিন/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪২)
ঘ. জীবনের হ্রদে | স্মৃতি	৬.২
চোখ বুঁজে দিল | ঝাঁপ;	৬.২
ভিজিয়ে সে-জল | ছবি	৬.২
তুলে নিল সেই | ছাপ ॥	৬.২
	(ছাপ/*যত দূরেই যাই*, ২/৯৩)
ঙ. দরজায় কে | পর্দা ঠেলছে ?	৬.৬
বাইরে যাই। | ফিরি।	৫.২
পায়ের শব্দে | নেমে যাচ্ছে	৬.৬
অন্ধকার | সিঁড়ি ॥	৫.২
	(জলছবি/*কাল মধুমাস*, ২/১১৭)
চ. ফুলকি ছেড়ে | ফুল ধরেছেন	৫.৬
মিছিল ছেড়ে | মেলা	৫.২
দিন থাকতে | মানে মানে	৫.৪
কাটুন এই | বেলা।	৫.২
	(ল্যাং/*এই ভাই*, ২/১৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

ছ.	বুকে বাঁধছে | ঢাল যতই | ছেড়ে যাচ্ছে | নাড়ি	৫.৫.৫.২
	ভয় পেয়ে দে | খাচ্ছে ভয়	৫.৫
	পথে বসছে | ফাঁড়ি	৫.২
		(সামনেওয়ালা ভাগো/*ছেলে গেছে বনে*, ২/২১৯)
জ.	এখান থেকে | একটা নেয়	৫.৫
	ওখান থেকে | দুটো	৫.২
	এমনি করে | বাসা বানায়	৫.৫
	কুড়িয়ে খড় | কুটো	৫.২
		(যেখানে ব্যাধ/*একটু পা চালিয়ে, ভাই*, ৩/২২২)
ঝ.	দুনিয়া ডাকছে	৬
	তার দিকে হাত | বাড়িয়ে	৬.৩
	যেখানে শেকড়	৬
	সেখানে সে থাকে | দাঁড়িয়ে।	৬.৩
		(সাত রাজার ধন/*ধর্মের কল*, ৫/২২৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের কোনটিতে বিচ্ছিন্ন বা আলগাভাবে উচ্চারিত অযুগ্ম ধ্বনি দুই মাত্রার মর্যাদা লাভ করেছে, আবার কোনটিতে শব্দের মধ্যখণ্ডনের মাধ্যমে মূল পর্বের মাত্রাসমতা রক্ষা করা হয়েছে। উদ্ধৃতি খ-এর দ্বিতীয় পঙক্তির প্রথম বা মূল পর্বের 'যে' কে দ্বিগুণ মাত্রামূল্য দেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ঘ-এর 'জলছবি', উদ্ধৃতি ছ-এর 'দেখাচ্ছে' এবং উদ্ধৃতি ঙ-এর 'খড়কুটো' মধ্যখণ্ডনের মাধ্যমে মূল পর্বের মাত্রায় সমতা এনেছে। উদ্ধৃতি গ-এ ছয় মাত্রার মূল পর্বের সঙ্গে একাধিক ভিন্ন মাত্রার অপূর্ণ পর্ব সংযুক্ত হওয়ায় তা প্রবহমাণ মাত্রাবৃত্তের আবহ এনেছে। উদ্ধৃতি ঙ-এর মূল পর্ব পাঁচ ও ছয় মাত্রায় নির্মিত বলে তা ভিন্নতর অভিঘাত এনেছে। এভাবে মাত্রাবৃত্তে নানা মাপের পর্ব-সমন্বয়ে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন। প্রথম দিকে এই ছন্দের প্রতি কোন আগ্রহই দেখান নি তিনি। বিশেষ করে পদাতিক-এ স্বরবৃত্ত ছন্দের কোন কবিতা না থাকায় এই ধারণা হয় যে, এই ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে কবি তখনও আশাবাদী ছিলেন না। এ সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন –

> বইখানি (*পদাতিক*) আগাগোড়া চল্‌তি বাংলায় লিখিত, কোথাও সাধু বাংলার প্রয়োগ নেই। বাংলা ছন্দের সঙ্গে ভাষারীতির একটা সম্পর্ক প্রথা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বভাবিক বাহন হচ্ছে চল্‌তি বাংলা। ও-ছন্দে এখানে সেখানে কদাচিৎ এক আধটা সাধু ক্রিয়াপদ দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম। সাধারণ রীতি হিসাবে ও-ছন্দে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় না, বোধ করি তা সম্ভবও নয়। কারণ চল্‌তি বাংলার বাক্‌ভঙ্গি বা উচ্চারণরীতি থেকেই ও-ছন্দের উদ্ভব হয়েছে। 'পদাতিক' বইখানি সর্ব্বতোভাবে চল্‌তি বাংলায় রচিত, অথচ চল্‌তি বাংলার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক যে স্বরবৃত্ত ছন্দ, এ-পুস্তকে সেই ছন্দেরই ব্যবহার নেই।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

তবে সুভাষের ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রবণতা থেকে অনুমান করা যায়, স্বরবৃত্ত ছন্দের শক্তিকে রপ্ত করেই তিনি অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে যাত্রা শুরু করেছেন। কিংবা এও সম্ভব, এই ছন্দ-নিরীক্ষায় আরো কিছু সময় ব্যয় করতে চেয়েছেন তিনি। *পদাতিক*, *অগ্নিকোণ* ও *চিরকুট* অতিক্রম করে *ফুল ফুটুক*-এ এসে তিনি স্বরবৃত্তের সম্মোহন ছড়ালেন। লোকসংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডারকে তিনি আধুনিক জীবনদৃষ্টির আলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> লোকছড়ার (Folk rhymes) অপরিসীম ঐশ্বর্যকে আধুনিক ছড়ায় রূপ দিয়ে, বা পুনর্নির্মাণ বা নবনির্মাণের মাধ্যমে স্বরবৃত্ত ছন্দকে সমৃদ্ধ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জীবনানন্দ দাশ স্বরবৃত্ত ছন্দে যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন, সে সম্ভাবনাকে বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো, আর কোন আধুনিক কবি কাজে লাগান নি (সৈকত আসগর ১৯৯৩ : ১৪৯)।

লোকসাহিত্যের নানা কাহিনীকে তিনি সমসাময়িক কোন অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত করে ছড়ার ছন্দে কবিতা লিখেছেন। লোকজীবনের স্পন্দনে সমৃদ্ধ এই সব কবিতায় কবির সমাজভাবনার পরিচয় যেমন বিধৃত হয়েছে, তেমনি শিল্পী হিসেবে ঐতিহ্যের দায়বদ্ধতাকেও তিনি স্বীকার ও স্বীকরণ করেছেন। কখনো-বা সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দে গ্রথিত করেছেন। স্বরবৃত্তের সুর লঘু হলেও সুভাষের স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে ধারণ করেছে। তাঁর স্বরবৃত্তে আড়ষ্ঠতা নেই বলেই সকল বিষয়কেই তা গতি দিতে পেরেছে। চলতি ভাষার স্বভাবের অনুগামী এই ছন্দ একদা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তা আধুনিক বাংলা কবিতায় বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলা প্রাকৃত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ চাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা মুখের ভাষায় গতিসঞ্চার করে ভাবের আদানপ্রদানে অভিনবত্ব এনেছে।[৮] প্রসঙ্গত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক –

ক. সাপে কাটুক, | খোপে কাটুক	৪.৪
আছে আমার	৪
মন্ত্র-পড়া | ফুঁ–	৪.১
	(দিয়েন বিয়েন ফুঃ/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৮)
খ. আমরা যেন | বাংলা দেশের	৪.৪
চোখের দুটি | তারা।	৪.২
মাঝখানে নাক | উঁচিয়ে আছে –	৪.৪
থাকুক গে পা | হারা।	৪.২
	(পারাপার/*ফুল ফুটুক*, ১/১৪৮)
গ. এক যে ছিল | রাজা –	৪.২
রাজত্বটা | মস্ত	৪.২
উঠতে বললে | উঠত লোকে	৪.৪
বসতে বললে | বসত।	৪.২
	(এক যে ছিল/*ফুল ফুটুক*, ১/১৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. লাগ লাগ লাগ | ভেলকি।	৩.২
চাল-চিনি-মাছ | তেল-ঘি ॥	৩.২
	(ছি-মন্তর/*কাল মধুমাস*, ২/১২৩)
ঙ. নিচের লোক | থাক নিচে।	৩.৩
পিছের লোক | থাক পিছে ॥	৩.৩
	(রক্ষাকবচ/*জল সইতে*, ৩/৩৪৫)
চ. ডান হাত | থামায়।	২.২
বাম হাত | কামায় ॥	২.২
	(দেয়ালে লেখার জন্যে/*চইচই-চইচই*, ৩/৩৭৩)
ছ. মৌমাছিতে | পৌঁছিয়ে দেয়	৪.৪
আমার কথা | প্রিয়ার কাছে।	৪.৪
লোকমারফত | পাঠাই না তা	৪.৪
অপবাদের | ভয় যে আছে ॥	৪.৪
	(লাতভিয়ার লোকমুখে/*চইচই-চইচই*, ৩/৪০০)
জ. খাচ্ছি গাছের | খাচ্ছি তলার	৪.৪
সংসদে জোর | দেখাই গলার ॥	৪.৪
	(কিংবদন্তী/*ধর্মের কল*, ৫/২৩৪)
ঝ. আমড়া তেঁতুল | জলপাই	৪.২
গরম দুধে | বল পাই	৪.২
	(৩০/*মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো*, ৫/২৯২)

উদ্ধৃতিসমূহে কবির জীবনভাবনারই নানা প্রান্ত ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। মিল বিন্যাসে বা মিল বর্জনে, মূল পর্ব এবং অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করে তিনি এই ছন্দে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। স্বরবৃত্তের নিরূপিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তিনি কাব্যপঙ্‌ক্তিকে গভীর ব্যঞ্জনায় আন্দোলিত করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মিশ্র ছন্দেও কবিতা লিখেছেন। একটি কবিতায় নানা ছন্দের প্রয়োগে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন তিনি। এ সম্পর্কে *চিরকুট*-এর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১/৪৭-৫০) কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত কবিতাটিতে তিনি ছন্দ নিয়ে খেলায় সফল হয়েছেন –

সেদিনকার | শাণিত ধার | হারিয়েছি	৫.৫.৪	
হৃদয়ে শুধু | স্মৃতির ভাড়, | ভিড় শুধু	৫.৫.৪	মাত্রাবৃত্ত
কেবলি নিষ্ফল বাদ্য | ছিদ্রময় ঢাকে,	৮.৬.	
পুরনো অভ্যাসবশে | চিরুনির পণ্ডশ্রম | টাকে।	৮.৮.২	
তবু ও তোমার কাছে | ঋণী	৮.২	
একদা আমার এই | একচক্ষু হৃদয় হ | রিণী,	৮.৮.২	অক্ষরবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেব | বোবাকে ধ্বনি, ৪.৫
খোড়াকে দ্রুত | ছন্দ ৫.২
লক্ষ বুকে | রয়েছে খনি, ৪.৫
কুঁড়িতে ঢাকা | গন্ধ ৫.২

আমরা নই | প্রলয়-ঝড়ে | অন্ধ ॥ ৪.৪.২ স্বরবৃত্ত

এছাড়া *পদাতিক*-এর 'পদাতিক' (১/৩২-৩৫) এবং *ছেলে গেছে বনে*-এর 'নিশির ডাক নাটকের গান' (২/২৩৮) কবিতায়ও তিনি মিশ্র ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে মিশ্র ছন্দের আরো কবিতার সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছন্দ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সুর ও ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রধান ছন্দ মাত্রাবৃত্ত হলেও তিনি ধীরে ধীরে অক্ষরবৃত্তের দিকে ঝুঁকেছেন এবং নিরূপিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তিনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। স্বরবৃত্তের আড়ষ্টতা অতিক্রম করে তাকে তিনি অনায়াসে গভীর ও নিগূঢ় ভাবের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গদ্যছন্দেই তিনি সমর্পিত হয়েছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের মৌলিক কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রধান বাহন গদ্যছন্দ। হয়তো তিনি আরো স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে সামাজিক অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আর তা প্রকাশের জন্য তাঁর কাছে সবচেয়ে উপযোগী বিবেচিত হয়েছে গদ্যছন্দ। 'স-মিল স-ছন্দ কবিতায় যে-বাচনিক দ্বন্দ্বের আশঙ্কা, তা এড়ানোর জন্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, একটু একটু করে বরঞ্চ সমর সেনের উল্টোমুখে হাঁটলেন, প্রায় পুরোপুরি গদ্যকবিতার অলিন্দে সেঁধিয়ে গেলেন'[৯]– সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ-ভাবনা ও পরিণতি সম্পর্কে সমালোচক অশোক মিত্রের এ মন্তব্য যথার্থ বলেই আমরা মনে করি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. গদ্য-পদ্যের সেতুবন্ধ নির্মাণ করা বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন–

> গদ্যকে দিয়ে এখন যেসব মামুলি কাজ করানো হয়ে থাকে, সে কাজও আগে পদ্যের ঘাড়ে ফেলা হতো। তেমনি কবিতার যে কাজ আগে শুধুই পদ্যের এক্তিয়ারে ছিল, গদ্যও আজ তার শরিক। সত্যি বলতে কি, গদ্য পদ্যের মাঝখানে এখন আর জেলখানার উঁচু পাঁচিল তোলা সাজে না। কবিতায় তাই আজ গদ্যের অবাধ গতিবিধি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, পদ্যকে নাকচ করে কবিতায় গদ্যই হবে সর্বেসর্বা। সুতরাং গদ্য থেকে পদ্যে কিংবা পদ্য থেকে গদ্যে আনাগোনা তেমন আটকায় নি।

'কবিতা কেন লিখেও লিখি না', *দেশ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮। উদ্ধৃত : 'পরিশিষ্ট', কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৪, সম্পাদক– সৌরীণ ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ৩৩২।

২. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা', *পরিচয়*, সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল, ফাল্গুন ১৩৪৮ (১১শ বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা)। উদ্ধৃত : 'পরিশিষ্ট', কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ২০০৩, সম্পাদক– সুবীর রায়চৌধুরী, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ১৮৪।

৩. শঙ্খ ঘোষ, 'সুভাষদা', *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, ২০০২, দ্বিতীয় প্রকাশ, সম্পাদক– সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা', *পরিচয়*, ফাল্গুন ১৩৪৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

৫. সব্যসাচী সরকার, *দেশ*, ২০ জুলাই, ১৯৯১। উদ্ধৃত : 'পরিশিষ্ট', কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯৫, সম্পাদক– সৌরীণ ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ৩৩৪।

৬. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা', *পরিচয়*, ফাল্গুন ১৩৪৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৭. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা', *পরিচয়*, ফাল্গুন ১৩৪৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

৮. রবীন্দ্রনাথ ছন্দ (১৯৭৬ : ১৮৩) গ্রন্থে স্বরবৃত্ত ছন্দের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের প্রথম পর্বে খেয়ালের বশে নয়, প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে ছন্দ যা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ হিসেবে স্বীকৃত। সভ্যতার বিকাশে চাকার গুরুত্বের সঙ্গে ভাষার বিকাশে ছন্দের গুরুত্ব তুলনা করে তিনি বলেছেন –

> মানুষের উদ্ভাবনী-প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা-বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে। ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোটবাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে ভাষার দেনা পাওনা।

৯. অশোক মিত্র, 'কবিতার ভাষা আর জীবনের ছন্দ', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১০ জুলাই, ১৯৯৪। উদ্ধৃত : 'পরিশিষ্ট', কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৯৪, সম্পাদক– সৌরীণ ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৩১

সহায়ক গ্রন্থ

১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, *ঘূর্ণিস্রোতে, সৃজনীরাগে*, ১৯৯১,প্রতিভাস, কলকাতা।

২. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৫৯, *কালের পুতুল*, নিউ এজ সংস্করণ, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৩. মাহবুব সাদিক, ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০৬, *পুনশ্চ*, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬, *ছন্দ*, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক–প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

৭. সন্দীপ দত্ত (সম্পাদক), *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, ২০০২, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

৮. শঙ্খ ঘোষ, ১৩৭৮, *নিঃশব্দের তর্জনী*, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা।

৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৪, *অক্ষরে অক্ষরে*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

১০. সৈকত আসগর, ১৯৯৩, *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

যুগধর্মের নানা চিহ্নকে ধারণ করেই মহৎ শিল্প যুগোত্তীর্ণ এবং রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। স্বকালবিচ্যুত শিল্পসাহিত্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে স্পর্শ করতে পারে না বলেই তা অন্যের মনে সঞ্চারিত হয় না এবং তা শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িতও হতে পারে না। চিন্তাজগতের যে কোন অভিজ্ঞতা-অর্জন-অনুশীলন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংশোধনেই সময়ের হাত থাকে। বর্তমানকে উপলব্ধির মাধ্যমেই অতীতের সঙ্গে তাকে জুড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের দিনগুলোকে নিজের অভিজ্ঞতার নির্যাসে নির্মাণ করা যায়। এই নির্মাণের প্রশ্নেই প্রাকরণিক-প্রকৌশল বিবেচনা করতে হয়। নির্মাণশৈলী বিষয়ানুগ না হলে কোন মহৎ সৃজন সম্ভব নয়। ফলে শিল্পসাহিত্যের বিষয় নির্ধারণে শিল্পী যেমন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাঁর কালের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, তেমনি শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও সময়ের প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রথম মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বিশ্বব্যবস্থায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা সুভাষ মুখোপাধ্যায় কালের কণ্ঠে মনষ্যত্বহীনতার জয়ধ্বনি শুনলেও তিনি সময়ের স্রোতে ভেসে না গিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই ভাবলেন, বিড়ম্বিত এবং উৎকেন্দ্রিক মানুষকে বিপ্লবের পথে আহ্বান করলেন। তিনি আপন যৌবনকে ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত রেখে সংঘবদ্ধ জীবনের পথে ডাক দিলেন সবাইকে। ফুলের গন্ধে ঘুমিয়ে পড়া মানুষকে তিনি হাতুড়ি ও কাস্তের গান শুনিয়ে জাগ্রত করলেন। শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের আহাজারি বন্ধ করার উপায় একটাই – মৃত্যুর ভয়ে বসে না থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মধ্যে নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরলেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দিনবদলের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি শোষিত ও বঞ্চিত জনতার একজন হিসেবে সকলের মুক্তি ও কল্যাণের কথা ভাবলেন, ঘোষণা করলেন : 'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি'।

প্রথম মহাযুদ্ধের মর্মঘাতী পরিণাম প্রত্যক্ষ করেও যখন এড়ানো গেল না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বৈনাশিক বিপর্যয়, তখন বিশ্বব্যাপী বি-মানবিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। শিল্পসাহিত্যেও এই বিপন্ন-বিসঙ্গত-বিযুক্ত মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যারা ভয়াবহ বর্তমানে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে নিমজ্জিত। এই মজ্জমান মানুষকে টেনে তুলে তাদের হাতে আলোকিত আগামীর নিশান ধরিয়ে দিলেন আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যিকগোষ্ঠী। তাঁদের অনেককেই হয়তো একটি বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ চালিত করেছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের মুক্তি ও কল্যাণের যে সর্বজনীন আবেদন, তাই তাঁদের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের শক্তি জুগিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রকরণ মূল্যায়নে তাঁর ভাবাদর্শের বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

চল্লিশের কবিরা দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের প্রত্যক্ষদর্শী। এইসব সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতেই নির্মিত হয়েছে তাঁদের শিল্পদৃষ্টি। বক্তব্যধর্মী কবিতা সৃজনে তাঁদের আগ্রহ যেমন বেড়েছে, তেমনি রাজনৈতিক নানা অনুষঙ্গে কাব্যদেহ বলিষ্ঠ হয়েছে, কবিতা বস্তুগত জীবনের নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরকে তাঁরা সমষ্টির উচ্চারণে পরিণত করতে চেয়েছেন। কবিতায় সাধারণ মানুষের ভীড় যেমন বেড়েছে, তেমনি পূর্বসূরি কবিদের দুর্বোধ্যতার বিপরীতে তাঁরা সহজ-সরল-স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে অগ্রসর হলেন। বিবিক্ত শিল্পভুবনে সাধারণ মানুষের কোলাহল শোনা

Dhaka University Institutional Repository

গেল। উপেক্ষিত জনতার নানা গল্প-কাহিনী-উপকথায় এই সময়ের কবিতা হয়ে উঠল জনমুখী। চল্লিশের দশকের কবিতার এই ভাবগত স্বাতন্ত্র্য তার প্রকরণকেও প্রভাবিত করেছে বলেই বর্তমান গবেষণায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শৈলী-স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণে চল্লিশের কবিতার মৌল প্রবণতাও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট চিন্তা যুগধর্মকে স্বীকরণ করেই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছে। সমকালীন শিল্পসাহিত্যের সম্ভাবনাগুলোকে তিনি যেমন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে অবাধে আত্তীকরণ করেছেন, তেমনি সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করে তা উত্তরণের নানা কৌশল আয়ত্ত করেছেন। কেবল শিল্পসাহিত্যই নয়, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করেছে, যার প্রোজ্জ্বল প্রভাব তাঁর কাব্যশরীরে যোগ করেছে ভিন্নমাত্রা। তিনি ক্রমাগত নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, নির্মাণ করেছেন যুগোপযোগী ও যুগোত্তীর্ণ শিল্পসম্ভার। কবির সৃজনভাবনায় সমকালীন শিল্প-সাহিত্যের আলোক-প্রক্ষেপণ যেমন পরিষ্কার, তেমনি তাঁর নিজস্ব শ্রম ও মনীষায় তা অর্জন করে নিয়েছে প্রাতিস্বিক শিল্পঋদ্ধি।

কবির সৃজনভুবনকে মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর শিল্পচিন্তার মৌল প্রবণতাকে বিবেচনায় রেখেই। শিল্পসত্তার আলোকেই নির্মিত হয় একজন স্রষ্টার সমগ্র কাব্যপ্রয়াস। উদ্দেশ্যহীন শিল্পীর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। লক্ষ্য স্থির হলেই তা অর্জনের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো শনাক্ত করা যায়। সুভাষের শিল্পবোধের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে মানুষ। মানুষের মুক্তির জন্যই তাঁর যাবতীয় আয়োজন। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তি, সর্বোপরি মানসিক দাসত্বের অবসান ঘটানোই তাঁর শিল্পদৃষ্টির মৌল নিয়ামক। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের পথে প্রধান শত্রুদেরকে তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এই শত্রুনিধনের একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধন। সুভাষের শিল্পচেতনার মুখ্য সঞ্চালক এই জনজাগরণের মন্ত্র, যা তাঁর কবিতায় অপ্রতিরোধ্য বেগ এবং অভিনব লাবণ্য সঞ্চার করেছে।

কবির আবেগ-অভিযোগ-অভিজ্ঞতা-অনুপ্রেরণার যাবতীয় শক্তি ও সম্ভাবনাকে ধারণ করে শব্দ। শব্দশরীরেই তাঁর শিল্পবিশ্বাস প্রতিবিম্বিত হয়। শব্দের প্রচলিত অর্থের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তিনি তাতে সঞ্চার করেন অভিনব প্রাণশক্তি। সাহিত্য-বিবেচনায় শিল্পসচেতনতার অন্যতম শর্ত তাই শব্দসচেতনতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দের সজাগ, সতর্ক এবং অনুভূতিপ্রবণ অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই অর্জিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে নির্মাণ করেছেন তাঁর নিজস্ব শিল্পভুবন, যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার অবাধ ও আনন্দময়। শব্দ-সম্ভার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে কবির কথন-কৌশল বা ভাষাভঙ্গিকে। সুভাষ শ্রমজীবী জনতার সংঘবদ্ধ জাগরণ-প্রত্যাশী। সমাজমনস্ক এবং রাজনীতিসচেতন কবি সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি চিত্রিত করেছেন। তাই তাঁর কবিভাষা প্রচলিত প্রাত্যহিক কথনবৈশিষ্টের আলোকেই নির্মিত হয়েছে। তাঁর প্রগতিশীল শিল্পদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার অনুকূল এই কবিভাষা তাঁকে অসাধারণ শিল্পঋদ্ধি দিয়েছে।

কবিতার ভাষায় যতই মুখের ভাষার অনুকৃতি থাকুক না কেন, তা সর্বাংশে দৈনন্দিন কথোপকথনের ভঙ্গিটিকে রপ্ত করতে পারে না। কবিতার ভাষায় অলঙ্করণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। আর অলঙ্কার যেহেতু মানুষের সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসারই স্মারক, তাই কবিতায় অলঙ্কার-প্রয়োগ সার্থক হলে তা স্বতন্ত্রভাবে নিজের অস্তিত্বকে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করে না, বরং কবিতার বিষয় ও প্রকরণের সঙ্গে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে কবিভাষায় অভিনবত্ব সঞ্চার করে। সঙ্গত কারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যদেহও অলঙ্কৃত। তিনি সাধারণ জনজীবনের নানা প্রান্ত পরিভ্রমণ করে অলঙ্কার অন্বেষণ করেছেন। তাঁর অলঙ্কার প্রয়োগ পাঠকের রসানুভূতি জাগানোর যান্ত্রিক কৌশলমাত্র নয়, কবির আত্মিক অনুরণনে তা কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যা কাব্যপাঠকের চিন্তা-কল্পনা-রসবোধ জাগ্রত করে কবিতাকে শিল্পোত্তীর্ণ মহিমা দান করতে সক্ষম হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অলঙ্কার ব্যবহারে কোন রকম অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় দেন নি। কবিতার ভাষায় অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি পরিচিত শব্দেই দান করেছেন অনাস্বাদিত দীপ্তি, যা অনায়াসে আমাদের আলোড়িত করে, পরিতৃপ্ত করে। তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ অন্তর্ভূমির প্রগাঢ় চেতনার স্পর্শে ঋদ্ধ হয়ে কাব্যভাষাকে প্রাতিস্বিকতা দিয়েছে। সুভাষের অলঙ্কার কবিতায় অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিতের উদ্ভাসন ঘটিয়েছে।

কবিকল্পনা শব্দমাধ্যমে চিত্রিত হয়। শব্দের সন্নিবেশে অভিনবত্ব এনে তিনি পাঠকের চিন্তাকে উদ্দীপিত করেন। কবি-প্রাণের উষ্ণতায় তাঁর শব্দপ্রতিমা সজীবতা লাভ করে। আপন উপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে কবিতার হৃদ্‌স্পন্দনে পাঠককে জাগ্রত করেন তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দের সঙ্গে আপন অনুভবের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন, যা পাঠকের সামনে ছবি হয়ে উঠতে পারে। সংহত অভিজ্ঞতার শিল্পসম্মত প্রকাশেই তাঁর চিত্রকল্প প্রগাঢ় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পবিশ্বাস ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে সন্নিহিত করে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিচিত্র বাক্-প্রতিমা, যেখানে কবিচৈতন্যের নানা স্তরের অভিনব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন স্পষ্ট। সমাজ-সম্পৃক্ত যে সাহিত্যভাবনাকে তিনি ধারণ করেছেন, তাঁর চিত্রকল্প সেই ভাবনাকেই মূর্ত করে তুলেছে। আমরা লক্ষ করেছি, সুভাষের বাক্‌প্রতিমা তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের নির্যাসে লাভ করেছে অভিনব ব্যঞ্জনা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার স্বরূপ যেমন উন্মোচিত, তেমনি প্রতীকের দূরসঞ্চারী আলোক প্রক্ষেপে তাঁর সৃজনভুবনও হয়েছে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তিনি প্রতীকের ভেতর ঢেলে দিয়েছেন তাঁর বর্ণিল অভিজ্ঞতাকে, যা গভীরতর রহস্যের ধারক হিসেবে পাঠকের চিন্তাশক্তিকে নানা দিকে নিক্ষেপ করে। কবির প্রতীক তাঁর প্রগাঢ় জীবনবোধ ও সুগভীর উপলব্ধির বর্ণিল প্রান্তরকে চিহ্নিত করেছে। তাঁর প্রতীক সৃজন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থেকেছে সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি সচেতনতার প্রভাব। তিনি তাঁর শিল্পভাবনাকে ঋদ্ধ করেছেন মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে এবং তাঁর প্রতীক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জীবন-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে, যা সমষ্টিগত চেতনার উদ্বোধক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুরাণ-ভাবনা মহাভারত ও রামায়ণের চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই উজ্জ্বল প্রয়োগসাফল্য অর্জন করেছে। লোকপুরাণ প্রয়োগেও তাঁর জীবনবীক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয়– উভয় পুরাণের মিথস্ক্রিয়ার দৃষ্টান্তও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়। পাশ্চাত্য পুরাণ তাঁর সৃজনভুবনে প্রবেশাধিকার পায় নি বলা যায়। পুরাণকে অবিকৃত কাহিনীরূপে নয়, পৌরাণিক সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের ভেতরে আধুনিক জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির শেকড় বিস্তৃত করেছেন তিনি, আর সেই নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মাণ করেছেন ব্যক্তিগত শিল্পভুবন যা আত্মকেন্দ্রিক নয়, সামাজিক ও সমষ্টিগত। পুরাণের আধুনিক রূপায়ণ ঘটিয়ে সমকালীন জীবনবেদ প্রকাশই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। পুরাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্য স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

Dhaka University Institutional Repository

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দবিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হয় নি। সুর ও ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রধান ছন্দ মাত্রাবৃত্ত হলেও তিনি ধীরে ধীরে অক্ষরবৃত্তের দিকে ঝুঁকেছেন এবং এই ছন্দের নিরূপিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তিনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। স্বরবৃত্তের আড়ষ্টতা অতিক্রম করে তাকে তিনি অনায়াসে গভীর ও নিগূঢ় ভাবের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গদ্যছন্দেই তিনি সমর্পিত হয়েছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের মৌলিক কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রধান বাহন গদ্যছন্দ। তিনি আরো স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে সামাজিক অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আর এ কাজে গদ্যছন্দকেই অধিকতর উপযোগী মনে করেছেন তিনি।

শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তি, সমাজ ও সমকাল নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ জীবনের সার্থকতাকেই অস্বীকার করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা তাঁকে সংগ্রামের পথে ডাক দিয়েছে, আর তিনি তাঁর আত্মার স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়েছেন কাব্য-শরীরে। এই কাব্যবোধের কারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় ভিন্ন স্বরের স্রষ্টা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনবোধ ও সাহিত্যদৃষ্টি পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ শিল্পভুবন। জীবনকে নিবিড়ভাবে অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন তিনি, আর সেই জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে তাঁর কবিতার পুষ্টি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও জীবনাচরণের সঙ্গে তাঁর সৃজনকর্মের কোনো ব্যবধান নেই। বাংলা প্রগতি-কবিতার ধারায় সুভাষ বিপ্লবী জীবনেরই নিপুণ ভাষ্যকার। বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে তিনি নির্মাণ করেছেন সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতিকৃতি, যা মানুষকে সম্ভাবনার পথে, সমৃদ্ধির পথে আহ্বান করে। এই আহ্বানকে কাব্যদেহে সঞ্চারিত করার যে প্রকরণ-প্রকৌশল আয়ত্ত করেছেন তিনি, তা বিষয়ানুগ বলেই 'মিলিত অগ্রগতি'র এই মহৎ প্রয়াস কার্যকর হতে পেরেছে। ক্রমাগত কঠিনের সঙ্গে লড়াই করে যে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর কবিতা সেই ব্যক্তিত্বেরই উজ্জ্বল স্মারক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ

পদাতিক : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩), পৃ. ১৯–৪৪

চিরকুট : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫–৭৯

অগ্নিকোণ : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১–৯১

ফুল ফুটুক : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯–১৬৫

যত দূরেই যাই : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩), পৃ. ৬৫–১১০

কাল মধুমাস : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১–১৬৬

এই ভাই : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭–২১৬

ছেলে গেছে বনে : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭–২৫৭

একটু পা চালিয়ে, ভাই : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), পৃ. ১৯১–২৫৯

জল সইতে : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭–৩৬৫

চইচই-চইচই : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭–৪০৩

বাঘ ডেকেছিল : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৫–১৯৭

যা রে কাগজের নৌকো : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ পঞ্চম খণ্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫), পৃ. ১–৫২

ধর্মের কল : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫–২৭২

মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ* ॥ পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩–৩১২

খ. প্রকাশক্রম-অনুসারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক কাব্যগ্রন্থ

পদাতিক (১৯৪০), *চিরকুট* (১৩৫৭), *অগ্নিকোণ* (১৯৪৮), *ফুল ফুটুক* (১৯৫৭, *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা* সংকলন-এ আলাদা গুচ্ছাকারে), *যত দূরেই যাই* (১৯৬২), *কাল মধুমাস* (১৯৬৬), *এই ভাই* (১৯৭১), *ছেলে গেছে বনে* (১৯৭২), *একটু পা চালিয়ে, ভাই* (১৯৭৯), *মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো* (১৯৮০), *জল সইতে* (১৯৮২), *চইচই-চইচই* (১৯৮৩), *বাঘ ডেকেছিল* (১৯৮৫), *যা রে কাগজের নৌকো* (১৯৮৯), *ধর্মের কল* (১৯৯১), *একবার বিদায় দে মা* (১৯৯৫), *ছড়ানো ঘুঁটি* (২০০১)।

গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থ

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ : *নাজিম হিকমতের কবিতা* (১৯৫২), *দিন আসবে* (১৯৬৯), *পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ* (১৯৭৩), *রোগা ঈগল* (১৯৭৪), *নাজিম হিতমতের আরো কবিতা* (১৯৭৯); *গাথা সপ্তশতী* (১৯৮৯), *হাফিজের কবিতা* (১৯৮৪), *চর্যাপদ* (১৯৮৬), *অমরু-শতক* (১৯৮৮)।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যগ্রন্থ : *আমার বাংলা* (১৯৫১), *অক্ষরে অক্ষরে* (১৯৫৪), *কথার কথা* (১৯৫৫), *দেশ-বিদেশের রূপকথা* (১৯৫৭), *নারদের ডায়রী* (১৯৬৯), *যেতে যেতে দেখা* (১৯৬৯), *ক্ষমা নেই* (১৯৭২), *ভিয়েতনামে কিছুদিন* (১৯৭৪), *আবার বাঘ বাংলার ডাকে* (১৯৮৪), *টোটো কোম্পানি* (১৯৮৪), *এখন এখানে* (১৯৮৬), *খোলা হাতে খোলা মনে* (১৯৮৭); *গদ্য সংগ্রহ* (১৯৯৪)।

অনুবাদ গদ্য : *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব, ১৯৫২, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থের কিশোর সংস্করণ), *কত ক্ষুধা* (১৯৫৩, ভবানী ভট্টাচার্যের *So Many Hungers*-এর অনুবাদ), *রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ* (১৯৫৪), *ভূতের বেগার* (১৯৫৫, কার্ল মার্কস-এর *ওয়েজ লেবার এন্ড ক্যাপিটাল* অনুসরণে), *ব্যাঘ্রকেতন* (১৯৬০), *রুশ গল্প সঞ্চয়ন* (১৯৬৩), *ইভান দোনিসোভিচের জীবনের একদিন* (১৯৬৮), *ডোরা কাটার অভিসারে* (১৯৬৯), *চে গেভারার ডায়রি* (১৯৭৭)।

আত্মজীবনী : *আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন* (১৯৮৭), *ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই* (১৯৯৪)।

উপন্যাস : *হাংরাস* (১৯৭২), *কে কোথায় যায়* (১৯৭৬), *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* (১৯৮৩), *কাঁচা-পাকা* (১৯৮৯), *কমরেড, কথা কও* (১৯৯০)।

ঘ. সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*, সপ্তম মুদ্রণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৯৫

অনীক মাহমুদ : *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

অঞ্জন সেন (সম্পাদিত) : *কবিতার ভাষা*, গাঙ্গেয় পত্র, কলকাতা, ১৯৮৬

অরুণকুমার সরকার : *তিরিশের কবিতা ও পরবর্তী*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮১

অরুণ ভট্টাচার্য : *কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৬৫

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : *ঘূর্ণিস্রোতে, সৃজনীরাগে*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.): *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৫

অশোক কুমার মিশ্র : *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা [১৯০১–২০০০]*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

অশোক মিত্র : *কবিতা থেকে মিছিলে ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৯

অশ্রুকুমার শিকদার : *আধুনিক কবিতার দিগবলয়*, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯২

আজহার ইসলাম : *সাহিত্যে বাস্তবতা*, পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ দাশ*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৮

: *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

আহমদ কবির : *রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক*, তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৫

আহমেদ মাওলা : *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম দাশ ও

মৃত্যুঞ্জয় সেন (সম্পাদিত) : *আধুনিক প্রজন্মের কবিতা*, মহাদিগন্ত, ২৪ পরগণা, ১৯৯১

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ : *স্বপ্ন-প্রতীক*, অনুবাদ– অরূপরতন বসু, দীপায়ন, কলকাতা, ১৪০৬

জমিল শরাফী : *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন* , প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫

জহর সেনমজুমদার : *বাংলা কবিতা : মন ও মেজাজ*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা ১৯৯৮

জীবনানন্দ দাশ : *কবিতার কথা*, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০২

জীবেন্দ্র সিংহরায় : *কল্লোলের কাল*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮৭

তারাপদ মুখোপাধ্যায় : *আধুনিক বাংলা কাব্য* (প্রথম পর্ব), সপ্তম মুদ্রণ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮০

দিলীপ মজুমদার (সম্পাদিত) : *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৬

দীপ্তি ত্রিপাঠী : *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২

ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) : *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১

নরেন বিশ্বাস : *অলঙ্কার-অন্বেষা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কালিকলম, ঢাকা, ১৯৮৮

প্রবোধচন্দ্র সেন : *ছন্দ পরিক্রমা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭

প্রমথ চৌধুরী : *প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৮

বলরাম মণ্ডল : *পুরাণ বিচিত্রা*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩

বারীন্দ্র বসু : *বোদলেয়ার থেকে এলিয়ট ও বাঙলা কবিতা*, কার্ষ্ণি-রাধেয়, কলকাতা, ১৯৯২

বার্ণিক রায় : *প্রতীক অরণ্য*, প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা, ১৯৭৬

: *কবিতা : চিত্রিত ছায়া*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৮

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় : *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮১

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : *কবিতায় বাকপ্রতিমা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

: *আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

: *বাংলাদেশের সাহিত্য*, পুনর্মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৯

: *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

: *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসু : *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০

: *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* (অনুবাদ গ্রন্থ), প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

: *আধুনিক বাংলা কবিতা*, পুনর্মুদ্রণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৩

: *প্রবন্ধ সংকলন*, পঞ্চম সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১

: *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সম্পাদনা : বিশ্বজিৎ ঘোষ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

: *কালিদাসের মেঘদূত*, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

: *কালের পুতুল*, নিউ এজ সংস্করণ, নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯

বেগম আকতার কামাল : *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

: *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

ভ. ই. লেনিন : *রচনা সংকলন*, প্রথম ভাগ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, তা. বি.

মঞ্জুভাষ মিত্র : *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব*, নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৬,

মাসুদুজ্জামান : *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মাহবুব সাদিক : *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১,

: *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মাহবুবা সিদ্দিকী : *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজচেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

মাহবুবুল হক : *তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৫

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *বাংলা কবিতার ছন্দ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৯

রফিকুল ইসলাম : *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪

: *সাহিত্যের পথে*, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৩৮৮

: *বিচিত্র প্রবন্ধ*, তৃতীয় সংস্করণ,পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৯

: ছন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক–প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬

: *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০২

: *পুনশ্চ*, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্খ ঘোষ : *শব্দ আর সত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২

: *ছন্দের বারান্দা*, তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭

: *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, (সম্পাদিত, যৌথ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

: *নিঃশব্দের তর্জনী*, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৭৮

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : *উপমা কালিদাসস্য*, নব সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৩

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : *আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি*, মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা, ১৩৮০

শিখা দত্ত : *আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০২

শ্যামলকুমার ঘোষ : *কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, বইঘর, কলকাতা, ১৩৯৪

শ্রীশচন্দ্র দাশ : *সাহিত্য-সন্দর্শন*, চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৯২

সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত) : *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০২

সরকার আমিন : *বাংলাদেশের কবিতায় চিত্রকল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬*

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪

: *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬

সাইদ-উর রহমান : *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) : *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১২

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *নারদের ডায়রি*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৭৬

: *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন*, সম্পাদক : জমিল শরাফী (রণেশ দাশগুপ্ত), লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫

: *অক্ষরে অক্ষরে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪

: *আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন*, অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা, ১৯৮৭

: *কবিতার বোঝাপড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

: *কেন লিখি*, (সম্পাদিত, প্রণব বিশ্বাস সহযোগে), প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০

সুমিতা চক্রবর্তী : *আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৬

: *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়*, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

সুশীল কুমার রুদ্র : *বাংলা ছন্দের রূপ ও তত্ত্ব*, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, ২০০২

সুস্নাত দাশ : *ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা*, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৮৯

সৈকত আসগর : *বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ আলী আহসান : *কবিতার রূপকল্প*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

: *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*, বইঘর চট্টগ্রাম, ১৩৭৫

: *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭০

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : *কতিপয় প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

হায়াৎ মামুদ : *সোমেন চন্দ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : *আধুনিক বাংলা কবিতা*, কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪০

হুমায়ুন আজাদ : *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

হায়দার আকবর খান রনো : *মার্কসবাদের প্রথম পাঠ*, বর্তমান সময়, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৩

ঙ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

C. D. Lewis : *The Poetic Image*, Jonathan Cape, London, 1968

C. M. Bowra : *The Haritage of Symbolism*, Macmilan & Co. London, 1977

Herbert Read : *Collected Essays in Literary Criticism*, 2nd edition, Reprinted, MCMLiv, Faber & Faber Ltd. London, 1950

I. A. Richards : *Practical Criticism*, Pelican Books, London, 1960

Lillian Feder : *Ancient Myth in Modern Poetry*, Princeton University Press, Princeton, 1971

M. H. Abrams : *A Glossary of Literary Terms, Reprinted, Macmilan Indian Limited*, New Delhi,. *1997*

Stephen J. Brown : *The Word of Imagery*, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd, London. 1927

Stephen Spender : *The Struggle of the Modern*, University Paperbacks, London, 1965

William J. Handy & Max Westbrook [ed.] : *Twentieth Century Criticism: The Major Statements*, Indian Edition, Light & Life Publishers, New Delhi, 1976

Dhaka University Institutional Repository

চ. পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সহায়ক-প্রবন্ধ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : আমার সমকালের কবিরা, *ঐকতান*, সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মে-অক্টোবর, ১৯৮৯, কলকাতা

গোপাল পাল : 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : চিত্রকল্পের টানে উচ্চকণ্ঠের নম্রতা', *সীমান্ত*, ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮২ কলকাতা

জীবেন্দু রায় : আধুনিক কবিতার নানা প্রসঙ্গ, *আলোক আসর*, ৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯০, কলকাতা

তারেক রেজা : 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : প্রদৃপ্ত যৌবনের কবি', *ষড়ঋতু*, শরৎ সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০০৩, ঢাকা

: 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : মিছিলের মুখ এবং মুখের মিছিল', *উলুখাগড়া*, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০৫, ঢাকা

পবিত্র মুখোপাধ্যায় : 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা', *রক্তকরবী*, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯১, কলকাতা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় প্রগতি লক্ষণ', *ঐকতান*, সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস, ২ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯, কলকাতা

শঙ্খ ঘোষ : *'কবিতা বিচার'*, ঐকতান, সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯, কলকাতা

সত্যজিৎ চৌধুরী : 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা', *নতুন সাহিত্য*, ফাল্গুন, ১৩৫৯, কলকাতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'কবিতা কেন লিখেও লিখি না', দেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, কলকাতা

সুরজিৎ ঘোষ : 'সময়ের জাল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা', *প্রমা*, ৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর, কলকাতা, ১৯৮৩, কলকাতা